# শিশু-পরিবেশ

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

# শিশু-পরিবেশ

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৬
সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৩

প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস, ১৫এ ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা-৬

মূল্য : সাত টাকা

## নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন। যেখানে যেখানে ভাষার ও শব্দের ত্রুটি ছিল, সেখানে তিনি নিজে হাতে পরিবর্তন করিয়াছেন। কোনো বিষয় সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়তো ছিল না, তিনি লেখকের সহিত মৌখিক আলোচনা করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও বিশদ করিয়া লিখিবার পরামর্শ দিয়াছেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সর্বদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যে তিনি এই সামান্য বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছিলেন, তাহার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যথাসাধ্য বর্জন করা হইয়াছে। হয়তো দুই একটি জায়গায় পরিভাষা থাকিয়া গিয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য গ্রন্থটিকে সাধারণ-পাঠ্য করা; কেবল শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকিলে উদ্দেশ্যের অনেকাংশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে শিশুদের বয়সের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এখনো কত বৎসর যে বয়সের হিসাবে অনিশ্চয়তা থাকিবে বলা যায় না। সেইজন্য শিশুর মানসিক বা দৈহিক বিকাশের দিক্ প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিবার সময় ৬+, ১১+ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন নির্দিষ্ট বয়স অনুসারে ভাগ করিয়া আলোচনা করার আশা এখনো অতি অল্প। মোটামুটি ধারণা করিবার পক্ষে ৬+, ১১+ প্রভৃতি অপরিহার্যও নহে। মনোবিজ্ঞানের 'তত্ত্ব'-মূলক 'পাঠ্য'-পুস্তক হইলে অবশ্য অন্য কথা।

পুস্তকের আলোচনা ও মতামত শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন গ্রন্থ হইতে মূলতঃ গৃহীত হইলেও অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রভাব দেখা যাইতে পারে। মূল সূত্রের অনুসিদ্ধান্তরূপে অনেক স্থলেই মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আলোচনার সুবিধার্থে, কোনো কোনো দিকে জোর দিবার জন্য, মাতৃপর্ব, স্তন্যপর্ব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে. ইহা মনোবিজ্ঞানের মনোনীত ভাষা বা প্রচলিত রীতি নহে।

পুস্তকখানি যদি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য এবং সহজবোধ্য হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

মার্চ, ১৯৫৬ গ্রন্থকার

বর্তমান সংস্করণে বিশেষ কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন জরুরী মনে হয় নাই। কিছু কিছু পরিবর্তন, অবশ্য, কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজন হইয়াছে।

পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে লাগিবে, এমন ভাবে গ্রন্থটি রচিত নয়। শিশুর প্রতি যথোচিত দায়িত্ব-পালনে যাঁহারা আগ্রহী, মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই জন্য ইহা লিখিত। এই গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের অনেকে কিছু উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রকাশক ও গ্রন্থকার উভয়েই সুখী। যাঁহাদের জন্য ইহার বর্তমান সংস্করণ আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহাদেরই করে এই সংস্করণটি অর্পিত হইল।

মে, ১৯৬৩

গ্রন্থকার

## সূচীপত্র

# পূর্বাভাস

মানুষ সামাজিক জীব মাত্র। সমাজ-সম্বন্ধ ত্যাগ করলে মানুষ পশু-স্তরে অবনত হয়। উন্নত ধরনের পশুগোষ্ঠীতেও সমাজবন্ধনের প্রথম লক্ষণ গোষ্ঠীবন্ধনের ইঙ্গিত দেখা যায়। পশুগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য কেবল-মাত্র বংশরক্ষা বা আত্মরক্ষা, কিন্তু ইহা মানুষ-সমাজের একমাত্র লক্ষ্য নয় —উন্নতির পথে চাই মানুষের মধ্যে সামাজিকতার বোধ ও সমাজের সাহায্য। এই সামাজিকতার চেতনা বীজ-আকারে মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। সমাজের পরিবেশে তার প্রকাশ্য উদ্ভব হয় ও পরে ছড়িয়ে পড়ে নানা ভাবে নানা বিষয়ের মধ্যে।

শিশু জন্ম গ্রহণ করে কোথায়? যে-দেশেই হোক সে জন্ম গ্রহণ করে তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই। শিশুকাল থেকেই সে বেড়ে ওঠে আশপাশের ঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়েই। ধরিত্রী তার মাতা, ধরিত্রীর লোকসমাজই তার প্রকৃত ধাত্রী। তার মানসিক জীবন পুষ্ট হয় তার পারিপার্শ্বিক লোকজনের সংযোগে। পারিপার্শ্বিকের বাঁধনেই তার জীবন রূপায়িত হয়। পরিবেশের পার্থক্যেই তার জীবন রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিশুজীবনের প্রচ্ছন্ন অঙ্কুরকে প্রস্ফুটিত করে তোলা—তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করা। তার জন্মগত ব্যক্তিত্ব-স্ফূর্তিতে যদি বাধা পায় বা তার স্বতঃস্ফূর্তিকরণে যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে তার জীবনে বৈষম্য দেখা দেয়। সে তখন তার জীবনে সম্পূর্ণতা পায় না—মনোবিকলনের লক্ষণ প্রকাশ করে। সমাজে তখন তার স্থান ক্রমাগতই ওঠা-পড়া করে—স্থৈর্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা—তার নিজের জীবনে ও তার পরিবেশের মধ্যেও। ক্রমশ এই ভাবে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে সমাজ জাতি ও দেশের মধ্যে। ফলে হয় পৃথিবীতে নানা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি, যা-দ্বারা—যুদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা—পৃথিবী ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলে।

আমার মনে হয় গ্রন্থকার শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়টি চিন্তা করেই সাধারণ শিশু-জীবনের কোন কোন অবস্থায় কী কী অভাব পেয়ে থাকে এবং কী কী উপায়ে তার সংশোধন সম্ভব তার একটি সাবলীল চিত্র এঁকেছেন সাধারণের বোধগম্যভাবে। আশা করা যায় এতে সমাজে শিক্ষায় ও বিশেষ

করে মাতা-পিতার দৈনিক জীবনযাপনে শিশুকে কী ভাবে প্রতিপালন করা কর্তব্য তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। শিশুই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিক। পৃথিবীর শান্তির ভার থাকবে তাঁদেরই উপর যাঁরা এই শিশুপরিচর্যা করবেন। এই পুস্তিকার বিষয় উপলব্ধির দ্বারা আশা করা যায় এই সুকঠিন কার্যে অনেকেই অন্তত আংশিকভাবে তাঁদের কর্তব্যপালন করতে পারবেন।

সুহৃদচন্দ্র সিংহ
অধ্যাপক : মনস্তত্ত্ববিভাগ
কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা
৬ই মার্চ ১৯৫৪

# পরিবেশ

১। 'পরিবেশ' বলিতে কি বুঝায়, ইহার অর্থ ও ভাবটুকু কি তাহা মোটামুটিভাবে অনেকেরই জানা আছে। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করা কঠিন এবং ইহার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা আরও কঠিন, কারণ ইহার যে-কোনো সংজ্ঞার্থ লইয়া নানারূপ তর্ক তোলা যাইতে পারে। অথচ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ বা গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বর্জন করিয়া 'পরিবেশ'এর মোট বক্তব্যটুকু বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব। ইহার সহজ অর্থটি গ্রহণ করিলে শিশুর জীবনে এবং যে-কোনো বয়সে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার বাধা হয় না। সহজভাবে কোনো বিষয়ের অর্থ গ্রহণ করিলে যে ভুল বোঝা হয় এবং গভীর যুক্তির দ্বারা বিচার করিলেই যে সকল সময় খাঁটি ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম হয় এ কথা বলা চলে না। অতএব 'পরিবেশ'এর সহজ অর্থটুকু অবলম্বন করিলে অন্যায় হইবে না। তথাপি ইহার কয়েকটি দিক একটু ভাবিয়া দেখা দরকার।

২। "সে" আছে এবং "তাহার" সকল দিকে তাহাকে বেষ্টন করিয়া বিশ্বজগৎ রহিয়াছে; তাহার চতুর্দিকে আলো অন্ধকার আকাশ বাতাস জল মাটি ফুল ফল মানুষ ও অসংখ্য প্রকার জীব রহিয়াছে, দিকে দিকে অসংখ্য ঘটনা, মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ রস গন্ধ শব্দের বর্ণনাতীত পরিবর্তন চলিতেছে। "সে" ও তাহার বেষ্টনী লইয়া বিশ্বজগৎ। তাহার এই বেষ্টনী তাহার "বাহির"। এইরূপে আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে আমার "বাহির"; রামকে বেষ্টন করিয়া আছে রামের "বাহির"; শ্যাম যদু মধু সকলকে, সকল-কিছুকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ "বাহির"। সে ও তাহার বাহির, রাম ও তাহার বাহির, শ্যাম ও তাহার বাহির—এইভাবে বিশ্বজগৎকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগে ভাগ করা যায় কিনা তাহা দর্শনের বিচার্য। তবু সহজ কথায় সহজ ভাবে রাম ও তাহার বাহির বলিলে যে অর্থবোধ হয় তাহা ভুল নহে। সহজ ও সরল অর্থটুকু ত্যাগ করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যায় উপস্থিত হইলে "রাম" টিকিতে পারে না, তাহার "বাহির"ও দর্শন-যুক্তি-প্রভাবে শূন্যে মিলাইয়া যায়। কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে রাম শ্যাম যদু মধুর সহিত আমরা পরিচিত, রাম শ্যাম যদু মধুর অর্থ বেশ বুঝিতে পারি, তাহাদের "বাহির" বলিতে যাহা বুঝান হয় তাহাও বেশ স্পষ্ট ও বাস্তব।

৩। এইস্থানে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রামের বাহির বলিলে আমরা ঠিক বুঝি, কিন্তু রামের পরিবেশ বলিলে হয়তো ভুল বুঝি। রামের বাহির ও রামের পরিবেশ এক কথা নহে। কারণ, বাহির ও পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাহির ও বেষ্টনী এক হইতে পারে এবং বাস্তব জীবনে ইহাদের অর্থ একই। বাহির বা বেষ্টনী হইতে পরিবেশ এক দিক দিয়া পৃথক। বেষ্টনীর সীমা পরিসীমা দেখা যায় না, হয়তো ভাবাও যায় না—ক্ষুদ্রতম তৃণপুষ্প হইতে চন্দ্র-সূর্য-তারা-খচিত অনন্ত শূন্যে ইহা পরিব্যাপ্ত। পরিবেশ অনন্ত নহে, সকল জীবের ক্ষেত্রেই ইহা সীমাবদ্ধ এবং সমগ্র বেষ্টনীর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র। ইহা বেষ্টনীর অংশ মাত্র। বেষ্টনীর যে অংশের সহিত প্রাণীর যোগ ঘটে তাহাই সেই প্রাণীর পরিবেশ। বেষ্টনীর অনেকাংশের সহিত প্রাণীর দেহ-মনের সর্বসময়ে যোগ ঘটিবার সুযোগ থাকে না, উপায় থাকে না। সেই জন্য বেষ্টনীর অধিকাংশই পরিবেশের বহির্ভূত। বাহিরের সহিত জীবের যোগ যতটুকু, তাহার পরিবেশও ততটুকু; যোগ যখন যেখানে সংঘটিত হয় পরিবেশও তখন সেইখানে রচিত হয়। প্রাণীর যোগের বাহিরে যাহা কিছু আছে তাহা নিতান্ত বাহির, নিতান্ত বেষ্টনী।

৪। দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিলে বেষ্টনী ও পরিবেশের পার্থক্যটুকু সহজবোধ্য হইতে পারে। প্রভাতের আলো, ফুলের সৌরভ, রাস্তার ধূলা, লোকজন, দোকানপাট, বেচাকেনা, লাভক্ষতি, হিসাব, ব্যাঙ্কের কারবার প্রভৃতির স্রোত বহিতেছে। বস্তু অবস্তু প্রাণী ঘটনা ইত্যাদির প্রবাহ এবং ইহাদের লইয়া চিন্তা কল্পনা অনুভূতি প্রভৃতি সমস্ত একত্র করিয়া বেষ্টনী রহিয়াছে। এই বেষ্টনী কবিকে যেমন ঘিরিয়া আছে, অর্থলোলুপ ব্যক্তিকেও তেমনি বেষ্টন করিয়া আছে। কবির যোগ প্রভাতের আলোর সহিত, ফুলের সৌরভের সহিত, লোকজন বেচাকেনার রসসৃষ্ট একটি ছবির সহিত; বেষ্টনীর আর-সকলই তাঁহার দেহ-মনের বাহিরে পড়িয়া থাকে, তাঁহাকে টানিতে পারে না—ব্যাঙ্ক, লাভক্ষতির হিসাব, ব্যবসার মতলব, তাঁহার কবিজীবনে ছায়াপাত করে না। কবির নিকট ঐ প্রভাতের আলো, ফুলের গন্ধ, দৈনন্দিন জীবনের রসচ্ছবি পরিবেশ সৃষ্টি করে; বাকি যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা কবির পক্ষে যোগহীন বেষ্টনী মাত্র। অপর ক্ষেত্রে অর্থলোলুপ ব্যক্তির পক্ষে মাটি জল আকাশের সৌন্দর্য আছে কি নাই বোঝা যায় না; তাহার চিত্তে ও দেহে এগুলি স্পর্শ জাগাইতে পারে না; এইগুলি তাহার

নিকট বেষ্টনীর অংশ, পরিবেশ নহে। তাহার পরিবেশ ব্যাঙ্ক, হিসাব, টানাটানি, দর-কষাকষি প্রভৃতি।

৫। পরিবেশের সহিত প্রাণীর মনের যোগ ঘটিলে প্রাণীর পরিবর্তন ঘটে। সে পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, আবার অত্যন্ত স্পষ্ট হইতেও পারে। বাহির হইতে সকল সময় বুঝিতে পারা না গেলেও পরিবেশের দ্বারা সকল ক্ষেত্রেই প্রাণীর নূতনত্ব সাধিত হয়, ইহার ব্যতিক্রম নাই। যদি পরিবেশের যোগে কোনো নূতনত্ব না ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বেষ্টনীর সেই ক্ষেত্রে প্রাণীর সত্য সত্য যোগ ঘটে নাই। বেষ্টনীর কোনো অংশের সহিত যোগ-স্থাপন হইলেই পরিবেশ রচিত হয় এবং পরিবেশ রচিত হইলেই প্রাণীর কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে। মনে করা যাক কোনো সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক ব্যক্তি চলিয়া যাইতেছে। পথিক যদি অল্পক্ষণের জন্য সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া দেখে এবং অল্প পরিমাণেও মনোযোগ করে তাহা হইলে অন্তত সেই অল্পক্ষণের জন্যও সন্ন্যাসীটি তাহার পরিবেশ হইয়া দাঁড়ান। সন্ন্যাসীর সহিত এই অল্পক্ষণের সংযোগ বা যোগ পথিকের মনে কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করে—সন্ন্যাসীর প্রতি হয়তো আকর্ষণ ঘটে, নয় কৌতুক জন্মায় অথবা পূর্বের অভিজ্ঞতা অনুসারে সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ চিন্তা কল্পনা অনুভূতি চলিতে থাকে। ইহা পথিকের প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন। যদি সে পথিক সন্ন্যাসীর দিকে না চাহিয়া, তিনি আছেন কি নাই কোনো কিছু বোধ না করিয়া, সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সন্ন্যাসী সেই পথিকের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন না। তিনি তাহার বেষ্টনীর অংশমাত্র হইয়া থাকেন।

৬। সাধারণ সূত্রটি এখন দাঁড়াইল, যাহার যোগে জীবের কিছু না কিছু নূতনত্ব ঘটে তাহাই পরিবেশ। এই সূত্র অনুসারে নক্ষত্রবিজ্ঞানীর নিকট নক্ষত্র এক পরিবেশ; যে দূরবীন যন্ত্র লইয়া তিনি নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করেন তাহা আর-এক পরিবেশ; যে-গণিত অনুসারে নক্ষত্র সম্পর্কে নূতন নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে গণিতও তাঁহার পরিবেশ। কারণ, নক্ষত্রের দ্বারা, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা, গণিতের দ্বারা, তাঁহার শ্রম নিয়ত হয়; তাঁহার নৈপুণ্য জ্ঞান বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে। এইরূপে হিমালয়ের অত্যুচ্চ চূড়া তেন্‌সিঙের পরিবেশ রচনা করিয়াছিল, এ কথা বলা চলে। হিমালয়-আরোহণের কল্পনা চিন্তা চেষ্টা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার

জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিল, প্রতিদিন তাঁহার নৈপুণ্য জ্ঞান প্রভৃতি একটু একটু করিয়া নূতন হইতেছিল। সুতরাং হিমালয়-আরোহণ তেনসিং-জীবনের এক সময়ে পরিবেশ-স্বরূপ ছিল। গৃহে শিশুর মাতাপিতা শিশুর নিকটতম পরিবেশ, কারণ মাতাপিতার যোগে শিশুর দেহ-মন গড়িয়া উঠিতে থাকে, মাতাপিতার যোগে শিশু প্রতিদিন নবরূপ পাইয়া থাকে, নূতন হইতে থাকে। ভ্রাতা ভগিনী, পিতামহ পিতামহী, শিক্ষক শিক্ষিকা, সঙ্গী সাথী, সকলেই শিশুর পরিবেশ। আমরা বলিয়া থাকি, শিশু মাতা পিতা শিক্ষক সঙ্গী প্রভৃতির নিকট হইতে ভালমন্দ নানারূপ শিক্ষালাভ করে। শিক্ষালাভ করার অর্থ আর কিছু নহে, ইহাদের যোগে শিশু এখন যাহা আছে পরক্ষণে তাহা থাকে না ; দিনে দিনে সে একটু একটু করিয়া নূতন হইয়া উঠিতে থাকে। প্রধানতঃ যাঁহাদের যোগে শিশু নবরূপে বিকাশ লাভ করে, নবরূপে "হইয়া উঠে", তাঁহারা তাহার প্রধান পরিবেশ। যাহার সহিত যোগাযোগ যত বেশী, সেই পরিবেশের প্রভাব তত বেশী।

৭। এই স্থানে একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় আছে। পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তন ঘটে, এই কথাটি একটু বুঝিয়া দেখা দরকার। বাতাসের যোগে ছেলেদের ঘুড়ি নানাভাবে দুলিতে থাকে, ঘুড়ির অবস্থানের পরিবর্তন হয়, ইহার বিভিন্ন অংশ ফাঁপিয়া বাড়িয়া নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকে। বাতাসে ছেলেদের ঘুড়ির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন এবং পরিবেশের যোগে জীবের পরিবর্তন পৃথক ব্যাপার। বাতাস ও ঘুড়ি জড় জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত মাত্র। সকল পরিবর্তনের মধ্যে ঘুড়ি ঘুড়িই থাকিয়া যায়, একটা নূতন-কিছু হইয়া উঠে না। জীবের ক্ষেত্রে ফল অন্যরূপ হয়। পরিবেশের যোগে প্রাণীর স্ব স্ব ভাবের পরিবর্তন হয়, জীব একটা নবরূপ পায়, একটু-কিছু হইয়া উঠে। এই হইয়া-উঠাটাই ( রূপান্তর হওয়াটাই ) জীবের বৈশিষ্ট্য। জড়-জগতে হইয়া-উঠা বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

৮। আর একটি ধারণা সম্পর্কে সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বোধ হয় অনেকের ধারণা আছে যে, কোনো পরিবেশের সহিত সংযোগ ঘটিলে সেই পরিবেশের প্রতি জীবের এক আকর্ষণ থাকে ; যেখানে যোগ সেখানে আকর্ষণ, আকর্ষণ না থাকিলে যোগ ঘটে না এবং যেখানে বিকর্ষণ সেখানে যোগ ঘটা সম্ভব নয়। এই ধারণাটি ঠিক নহে। পরিবেশের সংযোগে আকর্ষণ প্রীতি সুখ আনন্দ যেমন থাকিতে পারে, তেমনি বিকর্ষণ বিরক্তি

ঘৃণা ক্রোধ বেদনাও থাকা সম্ভব, বেদনা ইত্যাদির উদ্ভবও হইতে পারে। বিকর্ষণ বিরক্তি প্রভৃতির প্রাধান্য দেখিলে মনে করা উচিত নহে যে, সেই পরিবেশের সহিত কোনরূপ যোগ নাই। যেখানে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ সেখানে তীব্র আকর্ষণ যেমন সম্ভব, তীব্র বিকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব। যাহার সহিত রামের কোনো যোগ নাই, যাহার চিন্তাও রাম করে না, তাহার প্রতি ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতি জন্মাইবার কারণ নাই। ক্রোধের পাত্রকে আমরা কাছে রাখিতে চাহি না; কিন্তু যতক্ষণ তাহার প্রতি ক্রোধ পোষণ করি ততক্ষণ তাহাকে মনের কাছেই রাখি এবং সে মনের কাছে থাকে বলিয়াই আমাদের মন নানাপ্রকার সক্রোধ চিন্তা করে; ভালই হউক আর খারাপই হউক আমার মনের পরিবর্তন ঘটে। আমি ক্রোধপরবশ হইয়া বা বিরক্তিবশে যে-সকল আচরণ করি, ক্রোধ না হইলে আমি সেইরূপ আচরণ করিতাম না। অতএব যাহার চিন্তা যাহার কথা আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়া আমার আচরণকে পরিবর্তিত করিতেছে সে নিশ্চয়ই আমার পরিবেশ, তাহার সহিত নিশ্চয়ই আমার কোনো-না-কোনো প্রকারের যোগ আছে। যে ব্যক্তি পীড়া দেন তাঁহার সহিত অপরের যোগ থাকে বলিয়াই তিনি অপরকে পীড়া দিতে পারেন। বিকর্ষণ বিরক্তি প্রভৃতি যোগহীনতার পরিচয় নহে।

৯। মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে পরিবেশের যোগে আকর্ষণ-জনিত সুখ ও বিকর্ষণ-জনিত পীড়া যুগপৎ সৃষ্ট হয়। বাস্তবজীবনে এইরূপ বিপরীত সৃষ্টি প্রায়ই দেখা যায়। শিশুর নিকট মাতাপিতা সাধারণতঃ নিকটতম পরিবেশ। মাতাপিতার প্রতি শিশুর যোগ এতই স্বাভাবিক ও নিবিড় যে, শিশুকে মাতাপিতা হইতে দূরে রাখা কঠিন। সাধারণভাবে আশা করা যায় যে মাতাপিতার প্রতি শিশুর আকর্ষণটুকু বিশুদ্ধ আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু নহে, সেখানে অপ্রীতির কোনো ছায়া নাই। কিন্তু মনোবিশ্লেষণে জানা যায় যে, শিশুর মনে গভীরভাবে মাতাপিতার প্রতি বৈরভাব থাকিতে পারে, সাধারণতঃ থাকে। বৈরিতা থাকে বলিয়া মাতাপিতার সহিত শিশুর যোগ নাই এ কথা বলা চলে না।

১০। উচ্চস্তরের বুদ্ধিমান প্রাণী পরিবেশের যোগে যেরূপ হইয়া উঠে, বাহিরের আচরণে সকল সময় তদনুরূপ ভাব প্রকাশ করে না। অনেক সময় পরিবেশের দ্বারা মন যে রূপ নেয়, যেরূপ হইয়া উঠে, বাহিরের আচরণে তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। সংসারে অন্তর ও বহিরাচরণে প্রায়ই

ভেদ ঘটে—যাহার প্রতি অন্তরে অন্তরে ভালবাসা গড়িয়া উঠিয়াছে, অপরকে খুশি করিবার জন্য প্রায়ই তাহার প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করিতে হয়। বাহিরে বিরক্তি, অন্তরে প্রেম, এই দুইটি বিপরীত দিকে আত্মপ্রকাশ করা, অভ্যাস গঠন করা বিরল নহে। এইজন্য বাহিরের আচরণ লক্ষ্য করিয়া সমগ্র জীবটি পরিবেশের যোগে কিরূপ হইয়া উঠিয়াছে সকল সময় ঠিক অনুমান করা যায় না।

১১। বুদ্ধিমান প্রাণী বহু দিকে বহু ভাবে পরিবেশের সহিত যুক্ত হয়, বহু দিকের যোগে বিচিত্রভাবে তাহাকে আত্মগঠন করিতে হয়। বিচিত্র দিকে গঠনের মধ্যে, এই হইয়া-উঠার মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন, এমন-কি বিপরীত প্রভাবকেও গ্রহণ করিতে হয়। পরিবেশের বিপরীত প্রভাবের ফলে আত্মগঠনে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, জীব যেন একাধিক স্তরে আত্মবিকাশ করিতে থাকে। বুদ্ধিমান প্রাণীর ক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্য স্পষ্টই দেখা যায়। দুইটি স্তরেই প্রধানতঃ জীবের আত্মগঠন ও আত্মবিকাশ সম্পন্ন হইতে থাকে মনে হয়। একটি স্তর গভীর, তাহাকে 'মনের স্তর' বলা চলে; অপরটিকে 'বাহ্য অভ্যাসের' স্তর বলিয়া পৃথক্ করা যায়। পরিবেশের যোগে প্রাণী যে গঠন প্রাপ্ত হয়, যে 'হইয়া-ওঠে', তাহা এই দুই স্তরে—মনে হইয়া ওঠে এবং বাহ্য অভ্যাসে হইয়া ওঠে। মনের 'হইয়া ওঠা'টাই আসল হইয়া ওঠা; ইহা গভীর ও স্থায়ী; ইহা স্বভাবের সহিত, প্রাণীর সত্তার সহিত মিশিয়া যায়। বাহ্য অভ্যাসের 'হইয়া ওঠা' অনেকটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ, জড়জগতের কাছাকাছি ব্যাপার। জড়জগতে ক্রিয়া যেরূপ প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ, একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান; জীবজগতে বাহ্য অভ্যাসের ক্ষেত্রে 'যেমন অবস্থা তেমনি অভ্যাস', সেখানেও অনেকটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। যে অবস্থায় একটি অভ্যাস গঠিত হইতেছে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অভ্যাসটি শিথিল হইয়া যাইতে পারে, অভ্যাস ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইতে পারে। পরিবেশের যোগে বাহিরের অভ্যাসের দিক দিয়া প্রাণী যখন 'হইয়া উঠিতে থাকে' তখন সেই পরিবেশ অপসারিত হইলে বাহিরের গঠনকার্য বা হইয়া-ওঠাটুকু থামিয়া যায়, ইহার আর লক্ষণ থাকে না। তবে, বাহ্য অভ্যাসও এমন পাকা হইতে পারে যে, তাহাকে একেবারে প্রাণীর অন্তরের অভ্যাস বলিয়া কখনো কখনো মনে হয়। যে জীব বুদ্ধির দিক দিয়া যত নিম্ন-স্তরের, তাহার 'হইয়া-ওঠা'ও তত বাহ্য অভ্যাসে সম্পন্ন হয়। উন্নত জীবের

ক্ষেত্রে বাহ্য অভ্যাসের সহিত আন্তরিক সংগঠনের দিকে অর্থাৎ অন্তরের হইয়া-ওঠার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; কারণ অন্তরের হইয়া-ওঠাই উন্নত জীবের বড় কথা। অন্তরের পরিবর্তন ও পরিবৃদ্ধি বড় কথা হইলেও জীবের আত্মগঠন যে অন্তরের স্তরেই বেশী হয়, সে কথা জোর করিয়া বলা যায় না; উন্নত জীবকে পরিবেশের দৈন্য-হেতু নিম্ন শ্রেণীর ন্যায় বাহ্য অভ্যাসেই আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। উচ্চ জীব অনেক সময় ব্যবহারের চাপে, অর্থাৎ অনুপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে, বাহিরের অভ্যাসে একরূপ হয়, আবার অন্তরের দিক দিয়া আর-একরূপ হয়। পরিবেশ যদি এমন হয় যে অন্তরের বিকাশ ও বাহ্য অভ্যাস প্রায় এক হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্তরের সহিত বাহিরের আচরণে অসামঞ্জস্য প্রায় দেখা যায় না। তখন এই প্রকার পরিবেশকে বাস্তব জীবনের সত্য আদর্শ বলা যায়। আদর্শ পরিবেশের যোগে অন্তরের রূপের প্রকাশ হয় বাহ্য আচরণ এবং বাহ্য অভ্যাসে; তখন বাহিরের আচরণ ও বাহিরের অভ্যাস হইতেই অন্তরে অন্তরে প্রাণী কতদূর গঠিত হইয়াছে, কতদূর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। একেবারে "আদর্শ" পরিবেশ বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় না, আদর্শ কখনো পঁহুছিবার মতো নিকট হইতে পারে না। একেবারে আদর্শ পরিবেশ না থাকিলেও বাস্তব জীবনের আদর্শ পরিবেশ অসম্ভব নহে, অন্তত তাহা সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, কেবল সাধনার প্রয়োজন। অন্তর ও বাহ্য অভ্যাসে আচরণে অনৈক্য স্বল্প হইয়া আসিলেই বাস্তব জীবনের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

১২। বাহ্য অভ্যাস ও অন্তরের পরিণতি—ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকেই সাধারণতঃ শিক্ষা বলা হয়। বাহ্য অভ্যাস বেশ ভাল লাগিলে বলা হয় সুশিক্ষা হইয়াছে; বাহ্য অভ্যাসের অন্তরালে অন্তরে যদি বিপরীত ভাব থাকে, তাহা হইলেও সাধারণ ধারণায় কিছু আসে যায় না, বাহ্য অভ্যাস ভাল হইলেই সুশিক্ষা হইল। বাহ্য অভ্যাস বেশ ভাল এবং তাহার সহিত অন্তরটিও ভাল বোধ হইলে তো কথাই নাই, খুব ভাল শিক্ষা হইয়াছে বলা হয়। তবে অন্তরের কতখানি কী হইল সে-সকল খোঁজ সাধারণতঃ লওয়া হয় না, লওয়ার আবশ্যকতাও কেহ বড়-একটা বোধ করে না। বাহিরের অভ্যাসটুকু আশানুরূপ হইলেই সকলে খুব খুশী, মনে করে খুব শিক্ষা হইয়াছে। যদি দেখা যায়, কোনো বালক পাঠ্যপুস্তক বেশ গড়-গড় করিয়া দ্রুত পড়িয়া যাইতে পারে

তাহা হইলে তাহার পড়া-শুনা খুব ভাল হইয়াছে ধারণা হয়; সে যাহা পড়িতেছে তাহার অর্থবোধ হইয়াছে কিনা, পঠিত অংশের উপলব্ধি হইয়াছে কিনা, সে-বিষয়ে সাধারণত লক্ষ্য থাকে না। শিশুকে ভদ্র সভ্য করিয়া তুলিবার জন্য মাতা-পিতার কত ভাবনা, কত যত্ন! একেবারে জীবনের আরম্ভেই শিশু বেশ ভদ্র সলজ্জ সভ্য হইয়া উঠিলে যেন ভাল হয়। সামান্য শিশু যখন ভদ্রতা-সভ্যতায় কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করে না তখন মাতা-পিতার দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। ক্রমে তাঁহাদের চেষ্টায় শিশু বাহিরের অভ্যাসে বেশ ভদ্র হইতে শিক্ষা করে, তাহার শিশু-মন ভদ্র-অভদ্র কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু শিশুর অন্তর যাহাই হউক, সে বাহ্য অভ্যাসে ভদ্র হইয়াছে তাহাতেই সকলে সুখী এবং মাতা-পিতা গর্বিত।

১৩। ঠিক-ঠিক বর্ণনা দিতে গেলে বাহিরের অভ্যাসকে বাহ্য অভ্যাস বলা ছাড়া আর-কিছু সম্মান দেওয়া যায় না। পরিবেশ-যোগে অন্তরের পরিণতিকেই শিক্ষা-প্রাণ বলা উচিত, কারণ অন্তরের পরিণতিই আসল পরিণতি। অন্তর ও বাহ্য অভ্যাসে মিল ঘটিলে তাহাই সম্পূর্ণ শিক্ষা। বাহ্য অভ্যাস, অন্তরের পরিণতি এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা, ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য রচিত হয় তাহা পরিবেশের কারণেই সৃষ্ট। ঠিক ভাবে পরিবেশ রচনা করিতে পারিলে অন্তরের পরিণতি আশানুরূপ হইতে পারে, বাহিরের অভ্যাস অন্তরের পরিচয় হইয়া উঠিতে পায় এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হয়।

১৪। এইখানে পরিবেশ রচনা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি একেবারে মূলের সহিত জড়িত। পরিবেশ কি ইচ্ছা করিলে রচনা করা যায়, পরিবেশের পরিবর্তন-সাধন কি সম্ভব? ইহার উত্তর চতুর্দিকে, বর্তমানে ও অতীতে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়। পরিবেশ আপনা-আপনি পরিবর্তিত হয়, ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক, যে-কোনো ব্যক্তির নিকট বা প্রাণীর নিকট ইহা সত্য। আবার ইহাও সকল প্রাণীর পক্ষে স্বীকার্য যে তাহাদের চেষ্টায় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশ বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়, পরিবর্তিত হয়; প্রাণীদের চেষ্টাতেও পরিবেশ সৃষ্ট হয়, পরিবর্তিত হয়। প্রাণীরা কখনো ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করে, কখনো সমষ্টিগত ভাবে পরিবর্তন সাধন করে। ব্যক্তিগত চেষ্টাই হউক, আর সমবেতভাবেই হউক, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানো জীবের ধর্ম। উন্নত জীবের পক্ষে পরিবেশ-রচনা

অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক, নিম্ন পর্যায়ের জীবের ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাবনা সঙ্কীর্ণ। অনেক সময় পরিবেশ-রচনার দ্বারাই জীবের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়; যত ভাবে এবং যে পরিমাণে কোনো প্রাণী পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে তত উন্নত সেই প্রাণী। পরিবেশ-রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কোনো জীব শ্রেষ্ঠ, অথবা শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই পরিবেশ-রচনায় শ্রেষ্ঠ, বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা অনাবশ্যক তর্ক। বাস্তব জীবনে ইহা স্বীকার্য যে জীবের চেষ্টার দ্বারা জীব পরিবর্তন আনয়ন করে; ইহাও স্বীকার্য যে জীবের চেষ্টা না থাকিলেও পরিবেশ নূতন নূতন অবস্থায় পরিণত হইতে পারে।

১৫। 'পরিবেশ-রচনা' কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেখানে কিছুই নাই, যেখানে সম্পূর্ণ শূন্যতা, সেখানে প্রাণী কিছুই রচনা করিতে পারে না। কিন্তু বেষ্টনী শূন্য নহে, সুতরাং সেখানে পরিবেশ রচনা করার ক্ষমতা অল্পাধিক সকল প্রাণীরই আছে। বেষ্টনীর সহিত যুক্ত হওয়া জীবের ধর্ম। পরিবেশের সহিত যুক্ত হওয়ার কারণ জীবের মধ্যে নিহিত না পরিবেশে নিহিত—পরিবেশের গুণেই জীব পরিবেশের সহিত যুক্ত হয় না জীবের নিজ গুণে ইহা সম্পন্ন হয়—এ প্রশ্ন এখানে অনাবশ্যক। আমরা ধরিয়া লইতে পারি পরিবেশ ও জীব উভয়ের গুণেই উভয়ের মধ্যে যোগ ঘটে, উপযুক্ত পরিবেশ না থাকিলে, জীব নিজেকে যুক্ত করিবার প্রেরণা পায় না এবং জীবের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপযুক্ত না হইলে পরিবেশও উপযুক্ত হয় না। মনোবিজ্ঞানের প্রধান কার্য পরিবেশের উপযুক্ততা আবিষ্কার করা, পরিবেশের সহিত জীবের যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলি বাহির করা। ইহা ব্যতীত পরিবেশ-রচনা সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করা জীবের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, বিশেষ করিয়া উন্নত শ্রেণীর জীবদের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিক্ষণের ঘটনা। দৈনন্দিন জীবনের এই অল্প অল্প পরিবর্তনেও পরিবেশে এতদূর পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতে পারে যে, পরিবেশ যেন এক নূতন পরিবেশ হইয়া যায়। অল্প অল্প পরিবর্তনের দ্বারা বা বিপ্লবের ন্যায় একেবারে এক আঘাতে, পরিবেশের নূতন রূপ সৃষ্ট হইলে তাহাকে পরিবেশ-রচনা বা পরিবেশ-সৃষ্টি বলা চলে। অতি দ্রুত বা ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে নূতন রূপে পরিবেশের প্রকাশ যখন ঘটে এবং যখন এই সকল দ্রুত বা ক্রমিক পরিবর্তনের মূলে জীবের নিজের চেষ্টা থাকে, তখন সেই পরিবেশের রূপকে জীব তাহার নিজের রচনা নিজের সৃষ্টি বলিয়া মনে করে। মনে করা যাক্

গৃহের চতুষ্পার্শ্বে নোংরা আবর্জনা রহিয়াছে। গৃহস্বামী প্রতিদিনই কিছু কিছু করিয়া তাহা অপসৃত করেন, প্রতিদিনই তাঁহার চেষ্টায় গৃহ-পরিবেশ একটু একটু পরিবর্তিত হইতে থাকে। এইরূপ দীর্ঘকালীন চেষ্টার পর একদিন সমস্ত আবর্জনা দূর হইল, এমন-কি আরো চেষ্টার ফলে সেই স্থানে ফুল ফুটিয়া উঠিল। নোংরা আবর্জনার স্থানে ফুলের শোভা! পরিবেশে কত পার্থক্য! একবার সেই আবর্জনার সহিত ফুলের শোভার তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় গৃহ-পরিবেশ একেবারে নূতন হইয়া গিয়াছে। ইহাই পরিবেশ-রচনার দৃষ্টান্ত। কখন পরিবেশ-"পরিবর্তন" বলিতে হইবে, আর কখন পরিবেশ-"সৃষ্টি" বলিতে হইবে, তাহার কোনো নিয়ম নাই। যে মুহূর্তে পরিবেশকে নিজের কাছে একেবারে নূতন মনে হয়, তখনই পরিবেশ রচিত হইয়াছে ধরা যায়।

১৬। উপযুক্ত পরিবেশের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া অপেক্ষা করে না, সে নিজেই পরিবেশকে তাহার জ্ঞান-মত সাধ্য-মত পরিবর্তিত করিতে থাকে, রচনা করিতে থাকে। পরিবেশের যোগে প্রাণীর পরিবর্তন হয়, ইহাই পরিবেশের পরিচয়। পরিবেশ-রচনায় জীবের চেষ্টা যেরূপ স্পষ্ট ও প্রধান তাহার পরিবর্তনও তেমন গভীর, তেমনি আন্তরিক হয়। যেখানে পরিবেশের নিকট জীবের চেষ্টা ক্ষীণ ও তুচ্ছ সেখানে জীবের পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ বাহিরের দিকে, প্রকাশ পায় বাহ্য অভ্যাসে। জীব যখন পরিবেশ রচনা করিতে পায় তখন তাহার পরিবেশই কেবলমাত্র রচিত হয় তাহা নহে, সে নিজেও সেই পরিবেশানুযায়ী রচিত হয়। পরিবেশ যেমন নূতন হইয়া উঠিতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও নূতন হইতে থাকে এবং জীবের এই আত্মরচনার মূল অন্তরে গিয়া পৌঁছায়। এই কারণে যে কোনো সুযোগে পরিবেশকে নানাভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা ও শক্তি সকল মানুষের প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া শৈশবে। শৈশবে সকল শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিশুর চেষ্টার প্রাধান্য থাকা একান্ত কাম্য।

## পরিবেশের মধ্যস্থতা

১৭। পরিবেশের মধ্যস্থতা ব্যতীত জীবন রচনা করা যায় না, নিজের জীবনও না, পরের জীবনও না। পরিবেশের মধ্যস্থতাকে, ইহার সহিত জীবের যোগকে, সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন।

(১) জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই জগতে বহু শ্রেণীর জীব আছে; তাহারা শ্রেণীগত-ভাবে পরস্পর পৃথক্। এক শ্রেণীর উপযুক্ত পরিবেশ সকল শ্রেণীতে বা একাধিক শ্রেণীতে সার্থক না হইতে পারে—মৃতদেহ শকুন-পক্ষীদের আকর্ষণ করিতে পারে, মানুষের ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটে। মানুষকে আকর্ষণ করিতে হইলে সুমিষ্ট সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা যায়। একই শ্রেণীর মধ্যে জীবের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে; কাহারো প্রেম-সঙ্গীতে মন প্রফুল্ল, কাহারো নিকট পূজা-সঙ্গীত মর্মস্পর্শী। পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধা-ধরা কোনো নিয়ম খুঁজিতে গেলে জীবের যোগ, বিশেষ করিয়া মানুষের যোগ, সর্বোচ্চ সার্থকতা লাভ করে না।

(২) উপযুক্ত সময়। জীবের দেহ-মনের অবস্থা অনুসারে পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এখন যে পদ্ধতি খুব ভাল ফল দিল, অপর যে-কোনো মুহূর্তে ঠিক সেই ফল পাওয়া না যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ প্রাণীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ের ব্যাপারটি অধিক প্রয়োজন; কারণ উন্নত জীবের ক্ষেত্রে অন্তরের যোগ ও অন্তরের হইয়া-ওঠা বড় কথা। শৈশবে যে পরিবেশ অত্যন্ত আবশ্যক, বয়স্ক জীবনে সেই পরিবেশ হাস্যজনক ও নিরর্থক হইতে পারে; আবার বয়স্ক জীবনের কোনো সার্থক পরিবেশ শৈশবে ব্যর্থ হইবে না, এমন কোনো কথা নাই।

(৩) পরিবেশের সহিত যোগ গভীর করিতে হইলে পরিবেশের সংস্পর্শ পুনঃ পুনঃ হওয়া চাই—শিশুর অন্তরে চিত্র-প্রীতি গড়িয়া তুলিতে গেলে চিত্র-দর্শন চিত্র-আলোচনা চিত্র-অঙ্কন প্রভৃতি এক দিনের শিক্ষাসূচী হইলে লাভ নাই, বহু দিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়া দরকার।

(৪) পরিবেশের সহিত যোগ স্থাপন করিবার সময় জীবের সর্বোচ্চ শক্তিনিয়োগে সর্বোচ্চ ফললাভ হয়। প্রাণমন দিয়া যে কাজ করা যায়, যে শিক্ষা লওয়া যায়, তাহা অতি সহজ ও গভীর হয়। এই সর্বোচ্চ শক্তিপ্রয়োগের প্রধান আনুকূল্য হইল প্রীতি বা সুখবোধ। পরিবেশের যোগটুকু যদি সুখ প্রীতি আনন্দের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে জীব কেবল যে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে চাহে তাহা নহে, সে পুনঃ পুনঃ সেইরূপ সংস্পর্শ কামনা করে। এই কারণে অন্তরের পরিণতিই হউক, আর বাহ্য অভ্যাসই হউক, সুখ-আনন্দের মাধ্যমে পরিবেশ-রচনা করিতে হয়।

১৮। এই স্থানে দুই-একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকা ভাল, কারণ এগুলি

অনেকটা ব্যতিক্রমের মতো দেখাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ সংস্পর্শ না ঘটিলে পরিবেশের যোগ তেমন গভীর হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হইয়া উঠিয়াছিলেন ; পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের স্পর্শ আবশ্যক হয় নাই। শোনা যায় এবং সাহিত্যে পড়া যায় যে প্রথম দর্শনে বা প্রথম আলাপনে প্রেম জন্মলাভ করিতে পারে এবং সেই প্রেমের স্পর্শে নারী-পুরুষের জীবন বহু দিক দিয়া নূতন হইয়া ওঠে। ইহা যেন ব্যতিক্রম। তথাপি ইহাকে ব্যতিক্রম না ভাবিয়া ঠিক উপযুক্ত ক্ষণে উপযুক্ত পরিবেশের যোগ ঘটিয়াছিল বলা চলে। নরেন্দ্রনাথ উপযুক্ত মানসিক স্তরে ইতিমধ্যেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, অপেক্ষা ছিল মাত্র ঠাকুরের স্পর্শের। আরো আগে ঠাকুরের স্পর্শ হয়তো নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে লইয়া যাইতে পারিত না। প্রথম-দর্শন-প্রেম সম্পর্কেও ঐরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অতএব শুভক্ষণে শুভযোগ ঘটানো অন্তর স্পর্শ করিবার একটি গোপন মন্ত্র।

১৯। পরিবেশের মধ্যস্থতায় জীবন-বিকাশের দুইটি স্তর আছে দেখা গেল—(ক) অন্তরের পরিণতি, (খ) বাহ্য অভ্যাস। আবার ইহার তিনটি রূপ আছে বলা চলে, অর্থাৎ পরিবেশের যোগে হইয়া-ওঠার তিনটি প্রকাশ আছে দেখা যায়—(১) অভ্যস্ত আচরণ, ( ২ ) অভ্যস্ত আচরণ বর্জন, (৩) অনভ্যস্ত ক্ষণিক আচরণ। শিশু বস্তুর সাহায্যে গণনা করিতে শিক্ষা করে, ইহাতেই সে প্রথম প্রথম অভ্যস্ত হয়। কিন্তু এই অভ্যাস যদি বর্জন করিবার সামর্থ্য তাহার না থাকে, তাহা হইলে সে কোনোদিন গণিতের মধ্যে আত্মবিকাশ করিতে পারিবে না। আজ যাহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে কাল তাহা বর্জন করা আবশ্যক হইতে পারে, একটি অভ্যাসের স্থানে আর একটি অভ্যাস-গঠন প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অভ্যাস-বর্জন এবং নব নব অভ্যাস-গঠনের দ্বারা মানুষকে ( এমন-কি সাধারণ স্তরের জীবকেও ) বিকশিত হইতে হয়, ইহা বিকাশের একটি রূপ। অনভ্যস্ত আচরণ প্রতিদিনকার জীবনে বিরল হওয়া উচিত নহে ; কারণ, অভ্যস্ত আচরণের মধ্যে একটা আবদ্ধ-ভাব আছে, একটা বন্ধন আছে—ইহা অভ্যাসের অধীনতা। অনভ্যস্ত আচরণে অন্তরের পরিণতিটা যেন সহজে ধরা পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে অনভ্যস্ত আচরণের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইলে, জীব পরিণতির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া ধরা যায়, অন্তত ইহাই সাধারণত ঘটে। অভ্যাসের দ্বারা অনভ্যস্ত আচরণের সাহায্য

না হইলে অভ্যাস অনাবশ্যক বন্ধন মাত্র—চিত্রশিল্পী তাঁহার অঙ্কন-অভ্যাসের সহায়তায় নূতন নূতন চিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলে অঙ্কন-অভ্যাসটি ব্যর্থ শ্রম মাত্র।

## শ্রেণী-বিভাগ

২০। পরিবেশকে একটু শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দেখিলে পরিবেশের মূল্য-বোধ হয়তো সহজ হইবে। একাধিক উপায়ে এই শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। প্রথম বিভাগ জড়-প্রকৃতি। জীবের চতুর্দিকে নিকটে ও দূরে জড়-প্রকৃতি তাহার সকল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির উদ্দীপক সাজাইয়া রাখিয়াছে; ইহাদের নানা অংশে নানা সময়ে বিচিত্রভাবে সাড়া দিবার জন্য জীবও প্রস্তুত। যোগ না ঘটিয়া থাকিবার উপায় কোথায়? ইহারা যে ইন্দ্রিয়ের এবং মনের দ্বারে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে; ইন্দ্রিয়ের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে জড়-প্রকৃতি তাহার রূপ রস গন্ধের মন্ত্র লইয়া অন্তরে প্রবেশ করে এবং অন্তরকে রঙে রসে জাগাইয়া তোলে। দ্বিতীয় পরিবেশ জীব-জগৎ। তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ হইতে সুন্দরতম পক্ষী পর্যন্ত সমস্তই যেন জড় প্রকৃতিকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া দেয়। ইহারা জড়-প্রকৃতি অপেক্ষা মনের আরো কাছাকাছি। মানব-পরিবেশ বা ব্যক্তি-পরিবেশ মানুষের পক্ষে তৃতীয় বিভাগ। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, প্রতিবেশী, শিক্ষক, বন্ধু, সঙ্গী, বৃহত্তর সমাজ, শাসক ও শাসিত প্রভৃতি ব্যক্তি-পরিবেশের দৃষ্টান্ত। চতুর্থ পরিবেশ গতি বা ক্রিয়া। সকল জীবেরই গতি বা ক্রিয়া আছে, জড়-জগতের মধ্যে গতি আছে। স্থির অবস্থা অপেক্ষা গতির প্রভাব জীবের দেহে ও মনে অধিক হইতে দেখা যায়; স্থির পর্বত অপেক্ষা গতি-চঞ্চল মেঘ বা তরঙ্গমুখর সমুদ্র জীবকে, বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবী মানুষকে, অনেক সহজে দোলা দেয়; নিশ্চেষ্ট মানুষ অপেক্ষা কর্মচঞ্চল ক্ষিপ্রগতি ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় প্রভাবান্বিত করে।

২১। পরিবেশকে আবার অন্যভাবে ভাগ করা যায়। সর্বপ্রথমে গৃহ-পরিবেশ। ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ভাগ গৃহের বাহিরে বৃহত্তর সমাজ, ইহারও অধিক উল্লেখ বাহুল্য। তৃতীয় পরিবেশ অল্প বয়সের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়-পরিবেশ একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশ। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনা করিয়া থাকে মানুষ, সেই কারণে মানুষের পক্ষে ইহা বিশেষ

পরিবেশ। অপরের জীবনকে আশানুরূপ স্তরে বিকশিত করিবার ইহা শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। বিদ্যালয়ের বিষয়টি সামান্যভাবেও চিন্তা করিয়া দেখা ভাল।

## বিদ্যালয়-পরিবেশ

২২। বিদ্যালয়-পরিবেশের প্রধান দায়িত্ব চারিটি। একটির সহিত সকলেই পরিচিত। শিশুকে পঠন-লিখন-গণিত প্রভৃতিতে অভ্যস্ত করা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। পঠন-লিখন প্রভৃতির অভ্যাস উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। শিশু যদি পঠন-লিখনের অভ্যাস পাইয়াই ক্ষান্ত হয়, সুবিধা পাইলেও তাহার ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সে ব্যর্থ শ্রম করিয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে, বিদ্যালয়-পরিবেশের যোগে তাহার কতকগুলি বাহ্য অভ্যাস গঠিত হইয়াছে মাত্র, তাহার অন্তর এই দিকে পরিণতি লাভ করে নাই। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পঠন-লিখন প্রভৃতির অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়া এবং তাহার সহিত শিশুর অন্তরকে যুক্ত করা। তাহা করিতে না পারিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং শিক্ষার প্রধান অংশ, অন্তরের 'হইয়া-ওঠা', বাদ পড়িয়া যায়। যুগ-যুগান্তরের বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চিত আছে পুস্তকে, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান চিহ্নিত থাকে পুস্তকে, সুদূর অতীতের রসভাণ্ডার পূর্ণ আছে পুস্তকে। পুস্তকে প্রবেশাধিকার না থাকিলে আত্ম-বিকাশের একটি অমূল্য পরিবেশ অ-যুক্ত রহিয়া যায়। পুস্তকের অতুলনীয় পরিবেশের সহিত শিশুর অন্তরকে যুক্ত করিয়া দেওয়ার এবং সেই যোগকে সার্থক করিবার জন্য পঠন-লিখন প্রভৃতির অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব বিদ্যালয়ের।

২৩। মানবজাতির শৈশবে বা বর্বর অবস্থায় জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ছিল। কতকগুলি মোটা ধরনের নিয়মকানুনের মধ্যেই প্রায় সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ ছিল। তখন শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষের সভ্যতার পরিচয় হইল জটিলতা। এখন মানুষের দিকে চাহিলে তাহার সভ্যতার নাগপাশের দিকটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই অতিজটিল সভ্যতার মধ্যে আপনা-আপনি উপযোজন করিবার ভার ছাড়িয়া দিলে ফল ভাল হইতে পারে না। শিশুর চতুর্দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণ, কঠোরতা উচ্ছৃঙ্খলতা, টানাটানি ঠেলাঠেলি; চতুষ্পার্শ্বে রাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতি প্রভৃতির হৈ চৈ। অবিরত অসংখ্য প্রকার মতামত উপদেশ শিশুচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিতেছে। শিশুর পক্ষে

অসংখ্য প্রভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নহে। হয় সে বিপর্যস্ত-চরিত্র হইয়া যাইবে, নয় সে যে-কোনো একদিকে অনাবশ্যক ঝোঁক প্রদর্শন করিবে। ইহার ফলে সুস্থ সামাজিক জীবন হইতে সে বঞ্চিত হইবে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিশুকে বিপর্যস্ত হইতে না দেওয়া, তাহাকে সামঞ্জস্যে পূর্ণ করিয়া তোলা, তাহার চিত্তে স্থৈর্য দান করা। বিদ্যালয়ের বাহিরে যে-সকল শক্তি ও প্রভাব কাজ করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইগুলিকে শিশুর উপযুক্তভাবে দাঁড় করানো তাহার একটি বিশেষ দায়িত্ব। বাহিরের প্রভাবকে সরল করিয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, শিশুর সামর্থ্য অনুসারে সাজাইয়া, শিশুর দেহ-মনের নিকট উপস্থিত করিলে তবে তাহার সমাজ-জীবনে সংযম ও সাম্য গড়িয়া উঠে। ইহাই বিদ্যালয়ের কঠিনতম দায়িত্ব। অতএব বিদ্যালয়ের বাহিরের ও ভিতরের জীবন ঠিক একরূপ করিয়া রাখা অনভিপ্রেত। অনেকে মনে করেন বিদ্যালয়ের পরিবেশ বাহিরের অবস্থার সহিত ঠিক ঠিক মিলাইয়া না রাখিলে শিশুদিগকে সমাজের ও বাস্তব জীবনের অনুপযুক্ত করিয়া তোলা হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে; ইহাতে আশঙ্কা প্রকাশ পায় বটে, তথাপি সত্য প্রকাশ হয় না। বিদ্যালয়ের পরিবেশ বাহির হইতে পৃথক এবং এই দিক দিয়া ইহাকে 'কৃত্রিম' পরিবেশও বলা চলিতে পারে।

২৪। সমাজের ধারা, সমাজের ধারণা ও বিচার, সমাজগত প্রয়োজন, কোনো কিছুই চিরকাল এক থাকে না। আজ সমাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা যেরূপ রহিয়াছে অতীতে সেরূপ ছিল না, ভবিষ্যতেও সেরূপ থাকিবে না। অতীতের যে-সকল ব্যবস্থা বর্তমানে অনাবশ্যক ও অচল সেইগুলি বর্জন করিয়া সমাজকে হালকা করা প্রয়োজন। বর্তমানের অনেক ব্যাপার ভবিষ্যতে নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে, তখন সেই নিষ্প্রয়োজন ব্যবস্থাগুলিকে ভবিষ্যতে ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু মানুষের মন এমনই যে, একবার যে ধারা ও ধারণায় সে অভ্যস্ত হইয়াছে, যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং যে অবস্থার সহিত সে নিজেকে একবার খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, তাহার কোনো অংশই সে ত্যাগ করিতে চাহে না। যখন মানুষের মন সমাজের কোনো-কিছু অনাবশ্যক ও অনভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতেও পারে তখনো তাহা বর্জন করা মানুষের পক্ষে সহজ হয় না। এই কারণে রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতি সমাজের সকল দিকে আমরা দেখিতে পাই যে অনাবশ্যক ও অচল

কিছু না কিছু মানুষের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের ভিতরে যে পরিবেশ রচিত হয় তাহাতে এই অনাবশ্যক ও অচল-ধারণা প্রথা প্রভৃতি বর্জন করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয় শিশুর পরিবেশকে যথাসাধ্য সরল ও উপযোগী করিয়া রাখে। এই বিশোধিত পরিবেশের যোগে শিশুরা আত্মগঠন করিতে পারে বলিয়া তাহারা সহজেই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হয় এবং একটি সুস্থ সময়োপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিতে পারে। এই দিক দিয়াও বিদ্যালয়ের পরিবেশ বৃহত্তর সমাজ হইতে পৃথক, আসলে ইহা কৃত্রিম নয়, বিশোধিত পরিবেশ। এই পরিবেশ-সৃষ্টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় দায়িত্ব।

২৫। বিদ্যালয়ে একাধিক স্তরের ও বহু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা একত্রে থাকে। তাহারা বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সকলে বসবাস করে সে কথা নহে, তাহারা বিদ্যালয়ের এক বিশেষ পরিবেশের মধ্যে "মানুষ" হইতে থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক-বালিকারা আসে; তাহাদের মাতাপিতা অভি-ভাবকদের মত প্রথা রীতি সামর্থ্য প্রভৃতি পৃথক; তাহাদের হয়তো পৃথক পৃথক দল আছে, সংঘ আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডী আছে। এই বিভিন্ন গৃহ হইতে, সংঘ হইতে, সমাজ হইতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে সমবেত হয়। শৈশবে একত্রে তাহারা আত্মগঠন করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশে সকল স্তরে, সকল শ্রেণীর পার্থক্যের মধ্যেও, একটি ঐক্য স্থাপিত হয়। শিশুরা সেই ঐক্যটুকু অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে, বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রভাবে সেই ঐক্যের ভিতরেই বড় হইতে থাকে; তাহাদের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে এবং অনেকগুলি সাধারণ অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। মানুষকে মানুষের সহিত মিলাইয়া দিবার এই দায়িত্বটি চতুর্থ হইলেও সহজ নহে।

২৬। আমাদের দেশের প্রাচীন বিদ্যালয়ের কথা কল্পনার বিষয়। বর্তমান শিক্ষায়তনে এই বিশেষ দায়িত্বগুলি পালিত হয় কিনা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে।

## বংশগতি ও পরিবেশ

২৭। পরিশেষে বংশগতির সহিত পরিবেশের সম্পর্কটুকুর উল্লেখ থাকা বোধ হয় ভাল। তবে দুই এক পংক্তির বেশি বক্তব্য থাকা উচিত নহে। পরিবেশ ও বংশগতি লইয়া নানারূপ তর্ক আছে, অনেকপ্রকার পরীক্ষাও করা হইয়াছে। কিন্তু দুইটির মধ্যে বিরোধের কারণ কোথায় আছে বুঝিতে

পারা যায় না। বংশগতি বড় না পরিবেশ বড়, ইহা ভাবিবার বিষয় নহে। প্রাণী যে-সকল দোষগুণের সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাই প্রাণীর বংশগতি। উপযুক্ত পরিবেশের যোগে জন্মগত সম্ভাবনার বিকাশ সাধিত হয়। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে প্রাণীর যে-কোনো সম্ভাবনা বা সামর্থ্য অবিকশিত থাকিয়া যায়, অজ্ঞাত রহিয়া যায়। আবার জন্মগত সামর্থ্যের অভাবে পরিবেশ ব্যর্থ হয়। জন্ম হইতে কোনো সামর্থ্যে প্রাণী বঞ্চিত হইলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও এমন কোনো পরিবেশ রচনা করা সম্ভব হয় না যাহার দ্বারা সেই সামর্থ্যটির কিছু কিছু প্রমাণ ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। পরিবেশ বংশগতিকে ফুটাইয়া তোলে, বংশগতি পরিবেশের সৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে। কোনরূপেই পরিবেশ ও বংশগতির মধ্যে ছোট-বড় তুলনা আনা যায় না।

## আলোচনা-সূত্র

১। পরিবেশের সহজ অর্থ কি ?

২। "সে" ও তাহার "বাহির", "রাম" ও তাহার "বাহির"—এইভাবে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগে জগৎকে ভাগ করিয়া দেখা দর্শনশাস্ত্র-সম্মত না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ জীবনে এইরূপ বিভাগ সুবিধাজনক। আলোচনা করুন।

৩। "পরিবেশ" ও "বাহির" একই অর্থে ব্যবহার করা উচিত নহে। কেন তাহা আলোচনা করুন।

৪। পরিবেশ, বাহির ও বেষ্টনী—ইহাদের অর্থের তুলনা করুন।

৫। 'পরিবেশের সহিত প্রাণীর যোগ' ইহার মধ্যে কোন্ বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৬। বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-যোগে কাজ করিতেছেন। অপর একজন ছাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া কাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন একাগ্র নহে, কোনো রকমে দায়-সারা করিতেছেন। অনুবীক্ষণ কি পরিবেশ, কোন ছাত্রের নিকট ইহা সার্থক এবং কেন ?

৭ পরিবেশ-যোগে প্রাণীর পরিবর্তন সাধিত হয়। আলোচনা করুন।

৮। রামের সহিত শ্যামের তীব্র শত্রুতা আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের অমঙ্গল চিন্তা করে। তাহারা কি পরস্পর পরস্পরের পরিবেশ?

৯। বেলিয়াঘাটায় মহাত্মা গান্ধীর সাময়িক আবাস একবার ক্ষিপ্ত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা সাধারণ ব্যক্তির জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, কিন্তু মহাত্মার জীবনে ইহা সাময়িক পরিবেশ মাত্র। আলোচনা করুন।

১০। গাঢ় প্রীতি এবং তীব্র বিরোধ উভয় পরিবেশই কি সমভাবে কার্যকর হইতে পারে?

১১। পরিবেশের যোগে অনেক সময় বাহিরের পরিবর্তন ও অন্তরের পরিবর্তন একই ভাবে ঘটে না। আলোচনা করুন।

১২। বুদ্ধিমান জীবের প্রধান লক্ষ্য কোনটি হওয়া উচিত—বাহিরের পরিবর্তন, না, অন্তরের পরিবর্তন?

১৩। অন্তরের পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলে বাহিরের পরিবর্তনও কিছু না কিছু ঘটে। আলোচনা করুন।

১৪। বাহিরকে বাদ দিয়া কেবল অন্তরের পরিবর্তন বেশীদূর অগ্রসর হয় না। কেন?

১৫। বাহিরের পরিবর্তন নিতান্ত বাহ্য, তাহাতে অন্তরের কোনো বিকাশ ঘটে না—ইহা কি সত্য?

১৬। 'পরিবেশ-রচনা"—ইহা কি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে? ব্যবহৃত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ কিছু আছে কি?

১৭। পরিবেশের মধ্যস্থতা সার্থক করিতে গেলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন; সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৮। মানুষের জীবনে কখনো কখনো আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। এই আকস্মিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশের বিশেষত্ব কিছু থাকে কি? আলোচনা করুন।

১৯। বিদ্যালয়কে বিশেষ পরিবেশ বলা চলে। কেন?

২০। বিদ্যালয়ের দায়িত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২১। আদর্শ বিদ্যালয়-পরিবেশ এবং আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়—এ দুইটির মধ্যে তুলনা করুন।

২২। সমাজের বিরোধে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, ধর্মের দ্বন্দ্বে, শিশুদের যোগদান করা বাঞ্ছনীয় কি? আলোচনা করুন।

২৩। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবাস্তব হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে এবং কৃত্রিম হওয়া উচিত নহে। এই মতের সমর্থন কতদূর পর্যন্ত করা যায়?

২৪। অতি সরল সমাজব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের দায়িত্বও অত্যন্ত সহজ। আলোচনা করুন।

২৫। বংশগতি ও পরিবেশ—এ দুইটির কোনোটিই ছোট নহে, বড় নহে। আলোচনা করুন।

২৬। "পরিবেশ" সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

# মাতৃ-পরিবেশ

## আনন্দ-যোগ

১। ভাবদৃষ্টিতে মা ও শিশুর সম্বন্ধটি অনুপম মাধুর্যে পূর্ণ। মায়ের নিকট শিশুর মাধুর্যের শেষ নাই, মাতৃক্রোড়ে শিশুর আরামের ও ভরসার তুলনা নাই। শিশু ও মা—শুধু আনন্দ; স্বার্থ নাই, কর্তব্যবুদ্ধির কৌশল নাই। ভাবের দিক দিয়া শিশু-ক্রোড়ে মায়ের ছবিটি জগতে যেন অতুলনীয়।

২। কিন্তু ভাবের বিচারে বিজ্ঞানীর মন সন্তুষ্ট হয় না। বিজ্ঞানে ভাবেরও বিশ্লেষণ দরকার, ভাষাও একটু বিজ্ঞানোচিত হওয়া চাই, একটু যুক্তির অবতারণা করা বিধেয়। বিজ্ঞানের এই ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে শিশু ও মায়ের বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

৩। শিশু ও মায়ের সম্বন্ধটি আনন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শিশুকে পাইয়া মায়ের আনন্দ, মাকে পাইয়া শিশুর আনন্দ, ইহা একটি সার্বজনীন ব্যাপার। মা যখন ঠিক মা, তিনি যখন মাতৃধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তখন শিশুই তাঁহার আনন্দের প্রধানতম কেন্দ্র ও উপলক্ষ্য। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জীবজগতে সকল প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে সন্তান ও মায়ের সম্বন্ধটিই সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য। মানুষের সমাজে দেখি প্রেমের উপলক্ষ্য প্রায়ই অস্থায়ী; আজ যে প্রেমের প্রেরণা জাগায়, কাল সে ঔদাসীন্য এমন-কি বিরক্তি উদ্দীপিত করে। যে এখন শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ভবিষ্যতে সে প্রধান শত্রুদের মধ্যে একজন হইতে পারে। অতীতের শত্রু আজ বন্ধু, কাল আবার শত্রু। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, বৃহত্তর সমাজে ও রাষ্ট্রেও তেমনি; প্রীতি অপ্রীতি সবই যেন দু'দিনের খেলা। প্রীতি অপ্রীতি সহযোগিতা শত্রুতা প্রভৃতির "আজ-আছে কাল-নাই" ভাব যে কেবল মনুষ্যজীবনে বর্তমান তাহা নহে। সমগ্র জীবজগতেই ইহা রহিয়াছে। কিন্তু মায়ের স্নেহ, মায়ের আনন্দ শৈশবে, বিশেষ করিয়া অতি-শৈশবে, একান্ত সত্য, ব্যতিক্রম-হীন। মা মাতৃধর্ম হইতে বঞ্চিত, এরূপ হয় না। যে জীবের প্রকৃতি এমনই যে মা ও সন্তান বলিয়া কোনো সম্বন্ধই তাহার মধ্যে নাই, যেমন সাপ, কেঁচো, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানেই মা ও সন্তানের সম্বন্ধ একবারও দেখা দিয়াছে সেখানে ব্যতিক্রম ঘটে না। সন্তানের

মা হইয়া মাতৃধর্ম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বা মাতৃধর্ম ত্যাগ করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত মনুষ্যসমাজে দুই-একটি পাওয়া যায় বটে, তথাপি ইহা এতই বিরল যে ইহাকে প্রকৃতির অ-সাধারণ ব্যতিক্রম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদিবা বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনে মাতৃধর্ম-বিকৃতি এক-আধ বার দেখা যায়, মনুষ্যেতর জীবজগতে তাহার একান্ত অসদ্ভাব। এই কারণে শিশু ও মায়ের সম্বন্ধটি জীবজগতে অলঙ্ঘ্য সূত্ররূপে গৃহীত হয়, ইহা জীব-জগতের সকল সন্তান ও মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪। সন্তান এবং মায়ের মধ্যে আনন্দের যোগটুকু কেবল যে সর্বজন-সত্য তাহা নহে; ইহা সর্বকালেও সত্য; ইহা চিরন্তন। মায়ের নিকট সন্তানের আনন্দ ও সন্তান লইয়া মায়ের আনন্দ অতি প্রাচীন কালেও যেমন ছিল এখনো সেইরূপ আছে এবং ভবিষ্যতে ইহার পরিবর্তনের কোনো কারণ বা লক্ষণ আজ পর্যন্ত অনুমান করা যায় না। ইহা চিরদিনের সত্যের ন্যায় স্থির, ইহা একেবারে জীবের প্রকৃতি। জীবের প্রকৃতি যতদিন মূলতঃ একই থাকিবে শিশু ও মায়ের আনন্দও ততদিন সমভাবে থাকিবে। জীবপ্রকৃতি, জীবের দেহধর্ম প্রভৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো অনুমান এখন করা সম্ভব নহে। পূর্বে যেমন ছিল, এখন যেমন আছে, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে— এমন ধরিয়া লওয়া যায়। এইভাবে দেখিলে শিশু ও মায়ের আনন্দ-যোগটি সর্বজন-সত্য এবং সর্বকালের সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৫। সর্বজনীন ও সর্বকালিক সত্যের মধ্যে প্রকৃতির কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে মনে হয়। এই উদ্দেশ্য যে অত্যন্ত গূঢ়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি, প্রকৃতির অলক্ষ্য প্রভাব যতই গূঢ় হউক না কেন, একটি অনুমান গঠন করা অসম্ভব নহে।

৬। জীবজগতে প্রকৃতির অলক্ষ্য ক্রিয়ার দুইটি মূল ধারা রহিয়াছে। একটি ধারা নিজের বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা, অপরটি বংশরক্ষার প্রেরণা। কেবল ব্যক্তিগতভাবে বাঁচিয়া থাকাটাই জীবের একমাত্র স্বাভাবিক প্রেরণা নহে, সন্তান-সন্ততির দ্বারা নিজের শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখাও সমভাবে স্বাভাবিক। নিজের সন্তান-সৃষ্টির দ্বারা বংশরক্ষার প্রেরণাকে প্রকারান্তরে নিজেকেই বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা বলা চলে, কারণ সন্তান-সন্ততির মধ্যে জীবের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনই সঞ্চালিত হয়, বাহির হইতে কোনো জীবন আসিয়া সন্তানসন্ততির দেহে আবির্ভূত হয় না; মাতা-পিতার নিকট হইতেই

সন্তান-সন্ততিরা প্রাণকণা লাভ করে। সেই অতি ক্ষুদ্র প্রাণকণা প্রকৃতির কৌশলে বড় হইতে থাকে, ক্রমশ প্রকৃতিরই ব্যবস্থায় এক-একটি স্বতন্ত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ জীবে পরিণতি লাভ করিতে থাকে। নিজে বাঁচা ও প্রকারান্তরে সন্তান-সন্ততির দ্বারা নিজেকে এবং নিজের শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখার এই দুইটি ধারা প্রকৃতির সৃষ্টি; ইহা যে সকল সময় জীব অনুভব করে বা বুদ্ধিতে ধরিতে পারে, তাহা নহে। অনেক সময় জীব কিছু না জানিয়া, না বুঝিয়াই প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করে। চোখের অতি নিকটে কোনো বস্তু হঠাৎ উপস্থিত হইলে বা কোনো আঘাতের সম্ভাবনা ঘটিলে চোখের পাতা আপনা-আপনি বুজিয়া যায়, ইহাতে জীবের কোনো চেষ্টা পরিকল্পনা সতর্কতা কিছুই প্রয়োজন হয় না। চোখের এই আত্মরক্ষা প্রকৃতির শিক্ষা, চক্ষু-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা চলিতে থাকে এবং চক্ষু সম্পূর্ণ হইলেই এই শিক্ষাটুকুও সম্পূর্ণ হইয়া যায়। অতর্কিত অবস্থায় কোনো ভীতি-উৎপাদক শব্দ শুনিলে জীব চমকিয়া উঠে, হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ ঘটিলে জীব মুহূর্তের জন্য চিন্তা না করিয়াই পলায়নের চেষ্টা করে। এগুলি প্রকৃতির কৌশল, জীব যাহাতে নিজে বাঁচে তাহারই ব্যবস্থা। এইরূপ কাম ও প্রেম সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিজের ও শ্রেণীর প্রাণধারা রক্ষা করিবার প্রাকৃতিক কৌশল। মা যখন আপনার দেহ-মনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয় শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তাহার মঙ্গলের জন্য ঢালিয়া দেন, তখন তাঁহার সেই অনুপম সন্তান-স্নেহে প্রকৃতিরই অলক্ষ্য হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু লইয়া মায়ের আনন্দ, ইহা এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

৭। শিশু ও মায়ের মধ্যে প্রকৃতিগত আনন্দের এই যোগটির দুইটি দিক আছে—একটি মায়ের দিক, অপরটি শিশুর দিক। শিশুকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য মায়ের পরিশ্রমের ও ধৈর্যের সীমা থাকে না, তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তেই শিশুর সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। অক্লান্ত পরিশ্রমের অফুরন্ত শক্তি মায়েরা কোথা হইতে পান, অসীম ধৈর্য কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সকল পরিশ্রম ও ধৈর্যের উৎস মানুষের আনন্দ; মায়ের অনন্ত উৎসাহের প্রেরণা আসে তাঁহার অন্তরের আনন্দ হইতে। মা যদি বুদ্ধির দ্বারা শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করিয়া শিশুপালনে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রমশক্তি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিত এবং ধৈর্য উৎসাহ আগ্রহ ক্ষীণ হইয়া পড়িত। মানুষ বুদ্ধির প্রেরণায় কর্তব্যবুদ্ধির তাগিদে বেশী দূর অগ্রসর

হইতে পারে না। তাহার বুদ্ধি ও সকল শ্রম আনন্দ-প্রেরিত হইলে তবেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুপালনে মায়ের কর্তব্য-বুদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা, আনন্দই প্রধান ব্যাপার। আনন্দ যে পরিমাণ, শিশুপালনই সেই পরিমাণেই সহজ হয়। যেখানে আনন্দ কম, শিশুপালন সেখানে অত্যন্ত কঠিন। শিশুপালনের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন কাজকে অত্যন্ত সহজ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির আনন্দ-ব্যবস্থা।

৮। মায়ের দিকে যেমন, শিশুর দিকেও তেমনি—আনন্দের বাস্তব প্রয়োজন আছে। শিশু তাহার শৈশবে যতখানি শিক্ষালাভ করে এবং ঠিকমতো ব্যবস্থা হইলে যত সহজে করিতে পারে, বড় হইলে ততখানি অর্জন করা তেমন সহজে সম্ভব হয় না। বড় বয়সে কোনো ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বেশ চেষ্টা করিতে হয়, আত্মসংযমের ও মনের জোরের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়; কত বুদ্ধির চালনা, কত কৌশল, কত পদ্ধতির ব্যবহার। কিন্তু শৈশবের মাতৃভাষা-শিক্ষা অতি সহজে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। শিশুকে ঠিক কেহ মাতৃভাষা শিক্ষা দেয় না, সে নিজেও শিখিতেছে কিনা ভাবিয়া দেখে না, অথচ দুই তিন বৎসর বয়সেই সে রীতিমতো বাক্য-বিশারদ হইয়া উঠে। ইহা কেবল ভাষার দিকেই নহে, সকল দিকেই শিশুর দ্রুত বিকাশ দেখা যায়। দুই তিন বৎসরের শিশু তাহার জীবনের দুই তিন বৎসর সময়ের মধ্যে বসা দাঁড়ান হাঁটা দৌড়ান প্রভৃতি কত প্রকারের দেহসঞ্চালন শিখিয়া লয়, তাহার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রাথমিক অধিকার বেশ ভাল ভাবেই স্থাপন করে। কিন্তু বড় বয়সে নৃত্যশিক্ষা করা বহু বৎসরের চেষ্টায় সম্ভব হয়; অনেক শিক্ষক ও যথেষ্ট সাহায্য আবশ্যক হয়। শৈশবে এইরূপ দ্রুত বিকাশের কারণ আর কিছুই নহে, শিশুর স্বতঃস্ফূর্তিই ইহার কারণ। শিশু আপনা হইতেই স্ফূর্তি পাইতে থাকে, আনন্দ তাহার প্রতি মুহূর্তের প্রেরণা জোগায়, কোনো আবশ্যক-বোধ বা কোনো চাপ তাহার প্রতি বাহির হইতে কাজ করে না। মাতৃক্রোড়ে শিশুর আনন্দ-যোগটুকু সকল সময়েই চোখে পড়ে। কিন্তু শিশু একটু বড় হইলেই মাতৃক্রোড় হইতে নামিয়া আসে, 'স্বতন্ত্র' স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, এমন-কি মাকে যেন তাহার আর প্রয়োজনই হয় না। এই সময়ে মনে হয় শিশুর সহিত মায়ের আনন্দ-যোগ বুঝি আর নাই। কিন্তু শিশুর সহিত মায়ের আনন্দ-যোগ ছিন্ন হইয়া গেলে শৈশবের বিকাশে ভাঁটা পড়িবে, শৈশবের শিক্ষা অত্যন্ত শ্লথ

হইয়া আসিবে। যেখানে শিশুর বিকাশ বেশ দ্রুত ও স্পষ্ট, সেখানে মায়ের সহিত তাহার আনন্দের যোগ কমে নাই, হয়তো তাহা বাহিরের আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। বাহিরের চোখে শিশু ও মায়ের আনন্দ-প্রবাহ সকল সময়ে ধরা না পড়িলেও ইহা অন্তঃসলিলার ন্যায় রস যোগাইয়া চলে। আনন্দ না থাকিলে স্বতঃস্ফূর্তি দেখা যাইত না, স্বতঃস্ফূর্তি না থাকিলে শিশুর আত্মগঠন দ্রুত হইতে পারিত না।

৯। জীবজগতে যে শ্রেণী যত উন্নত তাহার জীবনযাপন-প্রণালী তত জটিল। অধিক জটিলতার সহিত উপযোজন সাধন করিতে শিশুকে অনেকখানি শিখিয়া লইতে হয়, বহু দিকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ইহার অন্য অনেকটুকু সময় আবশ্যক। মানবজীবন বড় জটিল, সেই কারণে মানবশিশুকে শৈশব পার হইবার পূর্বেই অনেক দিকে প্রস্তুত হইয়া লইতে হয়। প্রকৃতি মানবশিশুকে দুই দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছে। মানবশিশুর শৈশবকে দীর্ঘ করিয়া দিয়াছে, অন্যান্য জীবের তুলনায় মানবের শৈশব দীর্ঘতম। দ্বিতীয়তঃ, শৈশবের শিক্ষাকে অতি দ্রুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। শৈশবের দ্রুত শিক্ষা বা প্রস্তুতি এবং মানবের ক্ষেত্রে দীর্ঘ শৈশব, এই দুই প্রকার ব্যবস্থায় প্রকৃতি তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতেছে এবং তাহারই জন্য শিশু ও মাতৃ-হৃদয়ে আনন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্তি জাগাইয়া রাখিতেছে। শিশু ও মায়ের আনন্দ কেবল ভাবচক্ষুর বিচার নহে, ইহা একেবারে বাস্তবের বাঁচা ও বাঁচানোর উপায়। আনন্দ শ্রমকে সহজ করে, প্রেমকে স্বাভাবিক করে; আনন্দ জীবনকে স্বতঃস্ফূর্ত করে, স্বাধীনতার সার্থকতা আনে। আনন্দ হইতেই মাধুর্যের জন্ম। যে মা শিশুকে কর্তব্যজ্ঞান হইতে পালন করেন, আনন্দ হইতে নহে, তাঁহার শিশু-সেবা ব্যর্থ। শিশুতে যে মাতা আনন্দ পান না তিনি অসুস্থ এবং সেই কারণে মাতৃধর্ম হইতে চ্যুত।

## মাতৃস্তন-পরিবেশ

১০। শিশু জন্ম হইতেই আরাম ও পীড়া অনুভব করিতে পারে। শিশুর এই অনুভূতি প্রথম প্রথম বড় স্থূল অবস্থায় থাকে এবং সবটুকুই দৈহিক স্তরে থাকে বলা যায়; দেহের আরাম ও দেহের পীড়া বা ক্লেশ ব্যতীত মনের আরাম ও মনের বেদনা তাহার কিছু থাকে না। নবজাত শিশুর মনের দিকটা যেন প্রায় সুপ্ত, যেন তখন মাত্র জাগিতেছে। দেহের

দিকে স্নায়ু প্রভৃতি মোটামুটি প্রস্তুত হইয়া আছে, স্পষ্টভাবে উদ্দীপিত করা না গেলেও তাহার দেহ একটু-আধটু সাড়া দিতে পারে, দেহে আরামের ও ক্লেশের বোধটুকু থাকে। প্রথম অবস্থায় আরাম ও পীড়ার বিপরীত অনুভূতির সহজ লক্ষণ শিশু প্রকাশ করে। ক্রমশ শিশু যত বড় হয়, তাহার অনুভূতি ততই সূক্ষ্ম হয়, ততই বিচিত্র হয়। নবজাত শিশুকে চিমটি কাটিলে ঠিক যেন ব্যথা বোধ করে না, অথচ কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে একটু চিমটির ব্যথায় শিশু চেঁচাইয়া কাঁদিয়া দস্তুরমত 'প্রতিবাদ' করে। আরো যখন বড় হয় সামান্য ভর্ৎসনাতেও সে কাঁদিতে থাকে, তাহার মনে ব্যথা লাগে। অতি শিশুর আরাম ও পীড়া বোধ অত্যন্ত অস্পষ্ট স্থূল এবং বৈচিত্র্যহীন হইলেও সেগুলি তুচ্ছ করার বিষয় নহে। তাহার অনুভূতি প্রাথমিক পর্বে নিতান্ত মোটা, সাধারণ, অ-বিশেষিত থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই কাঁদিয়া ওঠে। আলো-বাতাসের জগতে প্রথম উপলব্ধি ও উপযোজন করিবার সময় শিশুর এক প্রকার ক্লেশ হয়। ইহা কিসের ক্লেশ তাহা বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু তাহার এক পীড়া-বোধ যে জাগে ইহা অস্বীকার করা যায় না—শিশু কাঁদিয়া ওঠে। তাহার জীবনের প্রথম ক্রন্দনের কারণ ক্ষুধা হইতে পারে, ফুসফুসের অস্বস্তি হইতে পারে। শিশুর প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের পৃথক পৃথক বোধ থাকে না। শিশু ক্ষুধা কাহাকে বলে জানে না, তৃষ্ণার সহিত ক্ষুধার পার্থক্য তাহার অনভিজ্ঞাত ফুসফুসের অস্বস্তিও যাহা, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তাহা। মাতৃজঠর হইতে মুক্ত হইয়া নূতন বেষ্টনীর সহিত প্রথম যোগ-স্থাপনে শিশুর যে পীড়া বোধ হয় তাহাই তাহার জীবনের প্রথম পীড়া-বোধ। এই প্রথম পীড়ার পর প্রথম আরাম বোধ ঘটে অপরের স্পর্শে, বিশেষ করিয়া মাতৃস্পর্শে। পীড়া যেমন অ-বিশেষ (ক্ষুধা নহে, তৃষ্ণা নহে, কোনো বিশেষ পীড়া নহে) তেমনি আরামও অ-বিশেষ। মাতৃস্পর্শে শিশু যখন প্রথম আরাম বোধ করিতে পায় তখন সেই আরাম ক্ষুধার নিবৃত্তি নহে, তৃষ্ণার বা অপর কোনো পীড়ার শান্তি নহে। মাতৃস্পর্শের আরাম, শিশুর অবিশেষিত আরাম।

১১। একটু সময় যাইতে না যাইতেই আলো-বাতাসের সঙ্গে শিশুর এক রকম সহজ সম্বন্ধ বা উপযোজন হইয়া যায়। তাহার পর ক্ষুধার তৃষ্ণার বা অপর কোনো অবস্থার পীড়া সৃষ্টি হইতে থাকে। তখনো শিশু ক্ষুধা তৃষ্ণা

প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিতে পারে না। তাহার বোধে পীড়া ও আরাম ছাড়া আর কিছু আসে না। ইহার ফলে সকল পীড়ার মাতৃস্তন্য-পানই একমাত্র ঔষধ হইয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দনের একমাত্র শান্তি মাতৃস্তন্য-পানে, অন্তত সাময়িক ভাবে মাতৃস্তন্যপান শিশুর যে-কোনো পীড়ায় শান্তি দান করে। এই কারণে জীবজগতে শিশুর যখনই আবির্ভাব ঘটে, তখন হইতেই মাতৃস্তন তাহার শ্রেষ্ঠ পরিবেশ। মাতৃস্তনের পরম প্রভাব শৈশব-জীবনে নেহাত অল্প কয়েক দিনের ব্যাপার নহে, শৈশবের বেশ একটি অংশ এই মাতৃস্তন-প্রভাবের অধীন থাকে।

১২। শিশুর জীবন-যাত্রার আরম্ভ হইতে অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত মাতৃস্তনই শিশুর শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বলার কারণ আছে। মা তাহার পরিবেশ নহেন, মাতৃস্তনই তাহার পরিবেশ। ইহা একটু অদ্ভুত শোনায়। তথাপি ইহা মনোবিশ্লেষণ-সম্মত বিশ্বাস। শিশুর ধারণা তখন একেবারে প্রথম অবস্থায়; যৎসামান্য বলা চলে, নীহারিকার ন্যায় অস্পষ্ট, এবং মনঃসৃষ্টির সূচনামাত্র হইয়াছে। শিশুর মানসিকতার সেই আদি পর্বে মায়ের ধারণা সম্ভব হয় না। মায়ের স্তনই তাহার ধারণার প্রথম বস্তু, এই ধারণার বশেই তাহার মনের প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাতা স্বয়ং প্রথম প্রথম শিশুর ধারণার বাহিরে থাকেন, সমগ্র মায়ের ধারণা গঠিত হইতে সময় লাগে। শিশুর আরামের প্রথম ও প্রধান উদ্দীপক মাতৃস্তন; মাতৃস্তনই তাহাকে আরাম দান করে, মাতৃস্তনকেই শিশু বোঝে, স্তন্যপানকেই সে খোঁজে। সুখের ও আরামের উপলক্ষ্য মাতৃস্তন, পীড়া-উপশমের উপায় মাতৃস্তন, ক্লেশ ও বেদনার কারণও মাতৃস্তন। সমগ্র মাতৃরূপ শিশুর কারণ-অকারণের, সুখের, বেদনার, সব-কিছুর বাহিরে থাকে। ক্ষুধা পাইয়াছে, ক্লেশ হইতেছে—কারণ মাতৃস্তন পাওয়া যায় নাই। উদরাময়ের পীড়া দেখা দিয়াছে—দায়ী মাতৃস্তন। দুগ্ধপানে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে—হেতু মাতৃস্তন। ঔষধসেবনে উদরের পীড়ার উপশম ঘটিয়াছে—শিশুর নিকট ইহারও মূলীভূত মাতৃস্তনই। সমগ্র মা শিশুর নিকট "নাই"। অতি শৈশবের ইহা একটি স্তর, এই স্তরটিকে শিশুর মাতৃস্তন-পর্ব বলিলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না।

১৩। মাতৃস্তন ও শিশুর মধ্যে যে সম্পর্কটুকু গঠিত হয় তাহাতে শিশুর ভাবনা-চিন্তার কোন প্রভাব নাই, কারণ অতি শৈশবে ভাবনা-চিন্তার বালাই বড় একটা থাকে না। মাতৃস্তনকে শিশু যে একান্তভাবে

ও একমাত্র করিয়া গ্রহণ করে তাহার কারণ শিশুর আপন স্বভাব, প্রকৃতির অলক্ষ্য ব্যবস্থা।

১৪। একমাত্র মাতৃস্তনের সহিত অতিশিশুর সম্বন্ধ গঠিত হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। মাতৃস্তনই শিশুর প্রথম ও প্রধান আরামের উৎস, এই আরামের কয়েকটি ধারা আছে। সুখের ও আরামের সেই সকল ধারা একত্রিত হইয়া মাতৃস্তনকে শিশুর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশ করিয়া তোলে। প্রকৃতির ব্যবস্থায় মাতৃস্তন ব্যতীত অন্য কিছুই আরামের এতগুলি দিক সৃষ্টি করিতে পারে না।

১৫। অতি শৈশবে আরামের প্রথম ধারা স্পর্শসুখ। মাতৃস্পর্শে শিশু এক অবর্ণনীয় আরাম পায়। এই আরামটুকু নিতান্ত দৈহিক স্তরের বলিয়া বিবেচনা করা যায়, ইহাতে কোনো ভাবের প্রভাব নাই। শিশুর মন তখনও ফুটিয়া উঠিবার সময় পায় নাই; সুতরাং ভাবের কথা উঠিতে পারে না। কৈশোরে যৌবনে বা পরবর্তী জীবনে প্রিয়জনের স্পর্শ হইতে সুখলাভ হয় ইহা অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। সকল বয়সেই মানুষ প্রিয়জনের দেহস্পর্শে নিজের দেহে মনে অল্পাধিক সুখ অনুভব করে। নারী পুরুষের মধ্যে এই স্পর্শসুখ অতি সাধারণ ব্যাপার। আমাদের একরূপ ধারণা আছে যে, নারী পুরুষকে স্পর্শ করিয়া, পুরুষ নারীকে স্পর্শ করিয়া একপ্রকার সুখ উপভোগ করে। অনেকের বিশ্বাস, অনেক ক্ষেত্রেই স্পর্শসুখ কামসুখের অন্তর্গত। দেহস্পর্শের সুখ কখনো কখনো অতি স্পষ্ট ভাবেই কামগত বলিয়া বোঝা যায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে নানাভাবে পরিমার্জিত হইয়া অতি পবিত্র স্পর্শসুখ-রূপে প্রকাশ পায়। শিশুর স্পর্শসুখকে কামের অন্তর্ভুক্ত করিতে আমাদের মন চাহে না; তথাপি মনোবিশ্লেষণের ইঙ্গিত এই দিকেই। মনোবিশ্লেষণের নানা প্রকার আলোচনা হইতে মনে হয় যেন অতি শৈশবে শিশুর মাতৃস্পর্শে কামের এক অস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান; শিশু মাতৃস্তন্য পান করিবার সময় যে স্পর্শসুখ লাভ করে তাহা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও পবিত্র হইলেও কামের আভাস তাহাতে থাকে।

১৬। মনোবিশ্লেষণের এই ইঙ্গিত ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা প্রভাব বিস্তার করিবে না; মাতৃদেহ স্পর্শ করিয়া শিশুর যেটুকু আরামভোগ হয় তাহাতে কামের পূর্বাভাস থাকুক বা নাই থাকুক এ আলোচনায় কিছু আসে যায় না। শিশুর সর্বপ্রধান, এবং বোধ

হয় সর্বশ্রেষ্ঠ, আরাম মাতৃদেহ-স্পর্শে, মাতৃস্তনস্পর্শে ঘটে—ইহাই জানিবার ও বুঝিবার আসল বিষয়। শিশু তাহার ওষ্ঠ দ্বারা স্তনপান করিয়া আরাম পায়, মাতৃস্তন লইয়া খেলা করিয়া আনন্দ পায়, মাতৃক্রোড়ে আসিয়া মাতৃদেহ হইতে অতুলনীয় সুখ পান করিতে থাকে। যিনি শিশু পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনি জানেন মাতৃস্তন ও মাতৃক্রোড়ের আকর্ষণ শিশুর নিকট কত তীব্র। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই যে মাতৃস্তন শিশুজীবনে এত প্রিয় তাহা নহে; ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি মাতৃস্তনের প্রতি শিশুর আকর্ষণের আংশিক কারণ মাত্র। শিশুর উপযোগী বহুপ্রকার পানীয় আছে, কিন্তু তাহাতে শিশুর স্তনপানের তৃপ্তিলাভ কিছুই হয় না, শিশু সম্পর্কে যাঁহারই অভিজ্ঞতা আছে তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন। মাতৃক্রোড় অপেক্ষা অনেক বেশী কোমল ও সুখকর শয্যা বাজারে পাওয়া যায়; তথাপি শিশু সকল শয্যা ফেলিয়া মাতৃক্রোড়ে উঠিবার জন্য হাত বাড়ায়। কোনো পানীয় মাতৃস্তন্যের সমকক্ষ নহে, কোন শয্যা মাতৃক্রোড়ের সহিত তুলনীয় নহে। যে-সকল কারণে মাতৃস্তন ও মাতৃক্রোড় শিশুর পক্ষে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে, স্পর্শসুখ তাহাদের মধ্যে প্রধান। মাতৃস্পর্শের আকর্ষণ সুস্পষ্ট এবং মনোবিশ্লেষণবিদের অভিমতে ইহার প্রভাবও সুদূরপ্রসারী।

১৭। আরামের দ্বিতীয় ধারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি। ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়া শিশু অনুভব করে, কিন্তু সে জানে না কি কারণে তাহার পীড়া ঘটিতেছে। কি করিলে পীড়ার উপশম হয় তাহাও শিশুর অজ্ঞাত। স্তন্যপানের অভ্যাসটি একটু পাকা হইয়া গেলে শিশুর যে-কোনো পীড়ায় স্তনপ্রাপ্তির অস্পষ্ট এক আশা শিশুর মনে জাগে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্ষেত্রে যেমন অন্য সকল ক্ষেত্রেও তেমন—যে-কোনো অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকিলে তাহার সামান্য মনটিতে মাতৃস্তনের এক আশা-ছবি জাগিয়া উঠে। ক্ষুধাকে শান্ত করিতে হইলে উদরে কোনোরূপ আহার বা পানীয় প্রেরণ করাই একমাত্র উপায়, এ জ্ঞান শিশুর নাই। তাহার উপযোগী পানীয় মাতৃস্তনে সঞ্চিত আছে, এ যুক্তিও শিশুর নহে। সে কোনো যুক্তির বশে স্তন আশা করে না। সে নিতান্ত স্বভাববশেই মাতৃস্তন খোঁজে। তাহার পর ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ হইলে বা যে কোনো কারণে ক্লেশ হইলে সে কাঁদে, অমনি কোথা হইতে মাতৃস্তন আসিয়া শিশুর ওষ্ঠাধারে পৌছায়; তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণের আরাম বোধ হইতে থাকে এবং তাহাতে মাতৃস্পর্শের সুখধারাও আসিয়া যোগ দেয়। পুনঃ

পুনঃ পীড়া, মাতৃস্তন-স্পর্শ ও সুখের পরিবেশ একত্র হইয়া শিশুর একরূপ অভ্যাস সৃষ্টি করে; তখন শিশু অভ্যাসবশে মাতৃস্তন খুঁজিতে থাকে।

১৮। ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি-কালে আর-এক শ্রেণীর দৈহিক আরাম শিশুর লাভ হয় বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। কণ্ঠনালী দিয়া স্তনধারা শিশুর উদরে অবতরণকালে এক সংবেদনের ( অনুভূতির ) সৃষ্টি করে। ইহাও এক আরামের সংবেদন, ইহা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণের তৃপ্তিকে আরও তৃপ্তিদায়ক করিয়া তোলে।

১৯। স্তনপানকালে শিশু একটি ছন্দ অনুসরণ করে, ইহা তাহারই ছন্দ। আমরা যখন শিশুকে অতিশয় তৃপ্তিপূর্বক স্তনপান করিতে বা কোনো-কিছু করিতে দেখি, তখন আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি শিশুটি 'স্বচ্ছন্দে' আছে। শিশু আপন-মনে সুখে যখন খেলা করে তখন আমাদের মনে হয় সে 'স্বচ্ছন্দে' খেলা করিতেছে। কেবল শিশুর ক্ষেত্রে কেন, যে-কোনো বয়সে কাহাকেও বেশ তৃপ্তির সহিত স্ফূর্তির সহিত কিছু করিতে দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্তিটি বেশ 'স্বচ্ছন্দে' আছে। 'স্বচ্ছন্দে' কথাটির মধ্যে সুখের আরামের ভাব রহিয়াছে—কোনো পীড়া-ক্লেশ নাই, আছে কেবল তৃপ্তি। অপর দিকে 'স্বচ্ছন্দ' শব্দের অর্থ নিজের ছন্দ। প্রাণী যখন নিজের দেহের ও মনের ছন্দ-বশে চলে, কাজ করে, তখন তাহার স্বচ্ছন্দ-ভাবটুকু ফুটিয়া ওঠে, অর্থাৎ তাহার তৃপ্তি আরাম সুখ স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। নিজের ছন্দ যখন বাধা পায় তখনই পীড়ার সূচনা দেখা দেয়। এই কারণে যে-কোনো প্রাণীকে তাহার নিজের ছন্দে পঁহুছাইয়া দিলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করা হয়। আবার, কাহাকেও তাহার জীবনের ছন্দ হইতে বিচ্যুত করিলে তাহাকে ক্লেশ দেওয়া হয়।

২০। ছন্দের বশে আরাম, ছন্দের বিচ্যুতিতে পীড়া—ইহা সকল স্তরের আচরণেই সত্য। দেহ-স্তরের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—মানুষ ( বা যে-কোনো উচ্চ শ্রেণীর জীব ) যখন চলে, তখন তাহার চলায় একটি 'তাল', একটি নিয়ম, একটি ছন্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহার চলার ঐ তাল বা ছন্দটিতে ব্যাঘাত ঘটিতে থাকিলে, যেমন তেমন ভাবে বেতালে বেছন্দে চলিতে বলিলে চলা আর হইয়া ওঠে না, পা ফেলিয়া হাঁটার ন্যায় অতি সহজ কাজটুকুও দুঃসাধ্য এবং পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। উচ্চতর মানসিক স্তরে দেখা যায়, যে ব্যক্তির জীবন-সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দোবদ্ধ, যে সঙ্গীতের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, তাহাকে সঙ্গীত হইতে বঞ্চিত করিলে পীড়া সৃষ্টি করা হয়। উন্নত জীবের

যে-কোনো আচরণেই ছন্দ রহিয়াছে, জীবকে সেই ছন্দ অনুসরণ করিতে দিলে তাহার দেহে ও মনে এক সুখের উদয় হয়, ছন্দের প্রকাশ ও অনুশীলন ব্যতীত সেই সুখ-বোধ সম্ভব হয় না।

২১। মানবশিশুর বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম নাই। শিশুর ছন্দ প্রধানতঃ দৈহিক স্তরের, মন তাহার ফুটিতেছে মাত্র। এই সময়ে তাহার কোনো পীড়া-বোধ হইলে দেহের কোনো ছন্দ উদ্দীপিত করা লাভজনক, কারণ শিশুর দেহে ছন্দ সৃষ্টি করিলে তাহার একরূপ আরাম বোধ হইতে থাকে এবং তাহাতে পীড়ার কিছু উপশম ঘটিতে পারে। শিশু কাঁদিয়া উঠিলে দোলনায় দোল দেওয়া, পিট চাপড়ানো প্রভৃতি 'সেকেলে' ব্যবস্থার মধ্যেও শিশুর দেহছন্দের উদ্দীপনে তাহাকে আরাম-দানের চেষ্টাই রহিয়াছে।

২২। শিশু যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তাহার ওষ্ঠ এবং মুখের অন্যান্য অংশ একটি ছন্দ অনুসারে চালিত হয়। স্তনপান-কালে শিশু যে তাহার মতো করিয়া ছন্দ অনুসরণ করিতেছে একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়। নিজেই নিজের ছন্দ অনুসরণ করার প্রথম ক্ষেত্র মাতৃস্তন-পান; শিশুর নিকট অপর কোনো ক্রিয়ার দ্বারা ছন্দসুখ ভোগ করা সম্ভব নহে। বাহির হইতে দোলা দিয়া, চাপড়াইয়া, শিশুকে ছন্দ-সুখ দেওয়া যায়, কিন্তু শিশু নিজেই নিজের দেহাংশ ব্যবহার করিয়া ছন্দ-সুখ সৃষ্টি করিতে গেলে মাতৃস্তন-পান ছাড়া তাহার উপায় নাই। মাতৃস্তনই শিশুর দেহ-ছন্দের প্রথম এবং প্রধান উদ্দীপক বলা যাইতে পারে। স্তন-পান-কালে শিশুর ওষ্ঠ প্রভৃতি অংশ যে ছন্দ সৃষ্টি করে মাতৃস্তন-পানের তাহা চতুর্থ আরাম। মনোবিজ্ঞানে এই ছন্দ-সুখটিকে তুচ্ছ মনে করে না, ইহার প্রভাব উপেক্ষার মতো নহে।

২৩। মাতৃস্তন-পানে শিশুর আরাম অতুলনীয়; তাহার কারণ এখন স্পষ্ট বোঝা যায়। মাতৃস্তন-পান ছাড়া অপর কোনো উপায়ে শিশুকে একসঙ্গে এতভাবে আরাম দেওয়া যায় না। শিশুর উপযুক্ত পানীয় দেওয়া সহজ, শিশুকে দোল দেওয়াও কঠিন নহে, তাহার ওষ্ঠ-ছন্দ সৃষ্টি করিবার কৌশল নূতন বলিলে ভুল হয়, মাতৃস্পর্শও শিশুর নাগালের বাহিরে নাই; অথচ মাতৃস্তন ব্যতীত এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা একই কালে সবগুলি আরাম তাহাকে দেওয়া যাইবে। মাতৃস্তনপানে মাতৃস্পর্শ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, কণ্ঠনালী-সংবেদন ও ওষ্ঠছন্দ একত্র মিলিয়া মিশিয়া এক অননুকরণীয় আরাম সৃষ্টি করে। নানাপ্রকার উদ্ভট যন্ত্র-আবিষ্কারের কথা শোনা যায় বটে, মাতৃস্তনের পরি-

বর্তনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কোনো যন্ত্রের বিষয় এখনো জানা যায় নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, শিশুকে স্তনপান না করাইয়া রবারের-বোঁট-ওআলা বোতল ব্যবহার করিলে শিশুর একই প্রকার তৃপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের ধারণা সেরূপ নহে—স্তনস্পর্শের সুখ রবারের বোঁট হইতে পাওয়া অতি-শিশুর পক্ষেও সম্ভব নহে; একবার মাতৃস্তনের স্পর্শ ও তজ্জনিত সুখ শিশু জানিতে পারিলে অন্য কোনো-কিছু দিয়া সহজে তাহাকে ভোলানো যায় না, অতি-শিশু অত্যন্ত নিরীহ হইলেও অতখানি নিরীহ ভালো-মানুষ নহে।

২৪। শিশু-জীবনে সুখ ও আরামের উৎস হিসাবে মাতৃস্তন অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, মনোবিশ্লেষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অতুলনীয়তার বিশেষত্ব দুই দিকে। 'ভালো' ও 'প্রীতি' (প্রেম) একটি দিক, 'মন্দ' ও 'বৈরিতা'র ধারণা অপর দিক। শিশু জন্ম হইতে ভালো-মন্দের কোনো ধারণা লইয়া আসে না, ভালো-মন্দের ধারণা ক্রমশ সৃষ্টি হয়। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, অতি-শিশুর বা শিশুর ভালো-মন্দ-অনুভূতি নাই, যদিও বা একটু থাকে তাহা হইলে সে নিতান্ত তুচ্ছ। আমাদের সাধারণ ধারণা তেমন গভীর নহে বলিয়াই শিশুকে বা অতি-শিশুকে অতখানি তুচ্ছ করি। মনোবিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ; দেখা গিয়াছে যে, জীবনের অতি প্রত্যূষেই ভালো-মন্দের সূচনা হয় এবং শিশু তাহার মাতৃস্তন অবলম্বন করিয়াই তাহার প্রাথমিক ভালো-মন্দের ধারণা গঠিত করে।

২৫। মাতৃস্তন শিশুর আরামের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ—যখন কোনো ক্লেশ দেখা দেয় তখন স্তনপান ক্লেশ উপশান্ত করে এবং আরাম আনে; ক্লেশ না থাকিলে তো কথাই নাই, স্তনপানে এক অতিরিক্ত সুখের কারণ। ক্লেশের উপশান্তি, আরাম এবং মাতৃস্তন ইহাদের মধ্যে ক্রমশ একপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ মাতৃস্তন লাভ করিয়া এবং তাহার দ্বারা আরাম ভোগ করিয়া শিশু স্তনপান ও আরাম একত্র করিয়া ভাবে। 'ভাবে'—শিশু 'ভাবে', এ কথার ব্যাখ্যা বয়স্ক মনের 'ভাবনা' দিয়া বিচার করা যায় না। অতি-শিশুর 'ভাবা'-'ভাবনা'র অধিকাংশই তাহার মনের গোপনে চলিতে থাকে, শিশু জানেই না যে সে ভাবিতেছে বা তাহার মনে ক্রমশ কোনো 'ধারণা'র সৃষ্টি হইতেছে। শিশুর অধিকাংশ বা বৃহৎ অংশ এইরূপ অগোচর অনুভূত

ভাবনার দ্বারা সৃষ্ট ; নবজাত শিশুর সকল ভাবনাই দেহ-স্তরে এবং অগোচর। শিশুর ভাবনায় স্তনপান ও আরাম একসঙ্গে গাঁথা হইয়া যাওয়ায় যে-কোনো আরামের আভাস তাহার দেহ-মনে অনুভূত হইলে মাতৃস্তনের ও স্তনপানের স্মৃতি জাগ্রত হয় এবং যখনই মাতৃস্তনের স্মৃতি জাগ্রত হয় তখনই দেহ-মনে এক আরামের আভাস জাগিতে থাকে। শিশুর এই স্মৃতিকে আমরা প্রতিরূপ বলিতে পারি, অর্থাৎ আরামের ভোগ উপস্থিত হইলেই শিশুর চিত্তে স্তন বা স্তনপানের প্রতিরূপ জাগ্রত হয়। স্তনপানের সহিত আরামের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে—একটু বিজ্ঞান-ঘেঁষা ভাষায় স্তনপানের সহিত আরামের অনুষঙ্গ ঘটাতে—স্তনপানের প্রতিরূপকে ঘিরিয়া শিশুর এক আকর্ষণের ভাব সৃষ্ট হয়। স্তন ও স্তনপান শিশুর নিকট আরামদায়ক বলিয়া শিশু স্তনকে বা স্তনপানকে ভালো মনে করে এবং তাহাকে ভালবাসিতে থাকে, স্তন ও স্তনপানের প্রতিরূপও শিশুর নিকট ভালো এবং ভালবাসার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। শিশুর 'ভালো'-মনে-করা ও ভালবাসা বয়স্কদের 'ভালো' ও প্রেম হইতে স্বতন্ত্র। বয়স্কদের 'ভালো'য় এবং ভালবাসায় বিচার আছে ; ইহা ভালো, উহা ভালো নহে, এইরূপ বোধ গঠিত হইয়াছে। শিশুর ভালো ও ভালবাসা বিচারহীন, ইহা অস্পষ্ট, অবিশেষিত। জগতে যে ভালো আছে, ভালবাসা আছে, তাহার অতি সাধারণ অনুভূতি মাত্র শিশুর মনে জাগিতেছে। কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি ভালো নহে, ইহা শিশুর এখনো জানা নাই। এইভাবে কী ভালবাসার নহে, আর কী ভালবাসার, তাহাও শিশুর এখন পর্যন্ত অজানা। ভালো ও ভালবাসার অবিশেষিত অনুভূতি জাগ্রত হয় স্তনপানের আরামে। ইহাই শিশুর ভালোর ধারণার ও ভালবাসার প্রথম উন্মেষ।

২৬। আরামের দ্বারা ভালো-লাগা ও ভালবাসার সৃষ্টি বয়স্ক-জীবনেও সত্য। সাধারণ স্তরের যতকিছু 'ভালো'র ধারণা এবং ভালবাসা, তাহার মূল কারণ আরামে বা সুখে। যাহা সুখ দেয় তাহাই ভালো এবং ভালবাসার উপযুক্ত—ইহা সাধারণ জীবনের সত্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূল কারণটি প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, তথাপি একটু বিশ্লেষণেই ইহা ধরা পড়ে।

২৭। ভালো ও ভালবাসার উন্মেষ ঘটে মাতৃস্তন্যপানে, সেইভাবে 'মন্দ' ও 'বৈরিতা'র প্রথম আভাসও আসে স্তনপরিবেশে। শিশুর ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা কোনপ্রকার পীড়ায় শিশু অভ্যাসবশে মাতৃস্তন আশা করে। নবজাত

শিশু 'আশা' করিতে জানে না, তবে দিনকতক যাইতে না যাইতে স্তনপানের আরাম ভোগ করিবার অভ্যাস গঠন হইয়া গেলে শিশু যে-কোনো সময় মাতৃস্তন-পানের 'আশা' করিতে শিখে। বিশেষ করিয়া কোনো ক্লেশ উপস্থিত হইলে অতি-শিশু স্তনপানের আশা করিতে থাকে এবং তাহার মনে স্তনপানের প্রতিরূপ জাগ্রত হয়। যদি কোনো কারণে শিশুর আশার সময় বা ক্লেশের সময় মাতৃস্তন শিশুর ওষ্ঠে আসিয়া না পৌঁছায়, তাহা হইলে সে ক্রুদ্ধ হয়। কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে না, কেন ক্রুদ্ধ হইতেছে তাহাও জানা নাই, অথচ শিশুর দেহ-মনে ক্রোধের অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। ক্রমশ শিশু মাতৃস্তনকে ক্রোধের পাত্র মনে করিতে থাকে, অপর কোনো-কিছু তাহার ক্রোধের বিষয় বলিয়া জানা থাকে না। পীড়া হইলে মাতৃস্তনই দায়ী; তাহার নিকট মাতৃস্তনই পীড়ার কারণ, মাতৃস্তনই 'মন্দ' এবং অবশেষে মাতৃস্তনের প্রতিই তাহার অদ্ভুত এক বৈরীভাব সৃষ্ট হয়। বয়স্কমনে শিশুর এই অদ্ভুত ধারণা নিতান্তই অবিশ্বাস্য, কিন্তু শিশুর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র।

২৮। শিশুর মনে এইভাবে মাতৃস্তন একদিকে ভালো ও ভালবাসার সৃষ্টি করে, অপরদিকে মন্দ ও বৈরিতার ধারণা দান করে। এইভাবেই জীবনের ভালো-মন্দের, ভালবাসা-বৈরিতার সূচনা হয় মাতৃস্তনের পরিবেশে।

২৯। এই স্থানে একটি বিষয় প্রায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। শিশুর জীবনের প্রথম পর্বে তাহার মানসিকতার কেন্দ্র ও অবলম্বন মাতৃস্তন। তাহার চিত্তে যেটুকু স্মৃতি, প্রতিরূপ, প্রেম, বৈরিতা প্রভৃতি সম্ভব, সেটুকু তাহার মাতৃস্তনকে ঘিরিয়া, স্তনপানকে কেন্দ্র করিয়া। ভালো কে? না, মাতৃস্তন। মন্দ কে? না, মাতৃস্তন। ভালবাসা কাহার প্রতি? মাতৃস্তনের প্রতি। বৈরীভাবের উদ্দীপক কে? মাতৃস্তন। শিশু-চিত্তের প্রতিরূপ বলিতেও ঐ স্তন ও স্তনপানের প্রতিরূপ বোঝায়। অর্থাৎ শিশু-জীবনের প্রথম পর্বে মাতৃস্তনই প্রধান। মা থাকেন তাহার মনের বাহিরে, সামান্য মনটুকু মাকে চিনে না, চিনে মাতৃস্তনকে, ইহাই তাহার মাতা।

## মায়ের সামগ্রিক ধারণা

৩০। শিশু-জীবনের এই দশা শিশুর বিকাশের একটি স্তর মাত্র। শিশু এই স্তরে কিছুকাল থাকে বটে, কিন্তু আপন স্বভাববশে এবং প্রকৃতির অসংজ্ঞাত প্রভাবে সে ইহা অতিক্রম করিয়া যায়। প্রথম স্তর বা পর্বকে যদি

'স্তনপর্ব' বলা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় স্তরকে মাতৃপর্ব নাম দেওয়া চলে। শিশুর কোনো বয়সকে নির্দিষ্ট করিয়া স্তনপর্ব বা মাতৃপর্ব বলা যায় না। একটি স্তর কখন তাহার পরবর্তী স্তরে পরিণত হয় ঠিক জানা নাই। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভালো যে, শিশুর জীবনকে 'স্তনপর্ব' 'মাতৃপর্ব' প্রভৃতি নাম দিবার বা নাম দিয়া ভাগ করিবার প্রচলন বা রীতি নাই। শিশুর বিকাশকে অন্যভাবে ভাগ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে শিশু-পরিবেশের যে-প্রকার আলোচনা গ্রহণ করা হইতেছে, তাহা একটু বিশ্লেষণ করিবার জন্য স্তনপর্ব মাতৃপর্ব, নাম ব্যবহার করা হইয়াছে। মাতৃ-স্তনের গোপন প্রভাব এবং মাতৃ-পরিবেশের বিশেষত্ব জোর দিয়া ফুটাইয়া তোলার উদ্দেশ্যেই স্তনপর্ব মাতৃপর্ব, প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল। যাহা হউক পূর্বসূত্রে ফিরিয়া আসা যাউক। স্তনপর্ব হইতে মাতৃপর্বে পরিণতি লাভ করিবার ব্যবস্থা প্রকৃতিগত, অর্থাৎ শিশুর স্বভাবগত, তথাপি এই পরিণতিকে সহজ ও সার্থক করিয়া তুলিতে গেলে মায়ের সহায়তা আবশ্যক। মায়ের দ্বারা শিশুর এই পরিণতি সহজ হইয়া আসিতে পারে, আবার মায়ের ত্রুটির কারণে ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে পারে। স্তনকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দ্রিক জীবনে মাতৃ-পরিবেশই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশ, এমন-কি একমাত্র পরিবেশ বলিতে ইচ্ছা করে। (মা শিশুর একমাত্র পরিবেশ ঠিক কোনো সময়েই নহেন। তবে শৈশবের গোড়ার দিকে মাতৃপ্রভাব এত স্পষ্ট যে তাঁহাকেই একমাত্র পরিবেশ বলিলে বিশেষ অতিরঞ্জন হয় না।) স্তনপর্ব হইতে মাতৃপর্বে পরিণতি লাভের সময়টি একটু কঠিন সময়, শিশু-জীবনে ইহা একটি বিশেষ ব্যাপার বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই বিশেষ সময়টিতে বিশেষ পরিবেশ আবশ্যক এবং তাহা মাতৃ-পরিবেশ ব্যতীত কিছু নহে। কিন্তু কখন কোন বয়সে যে শিশুর স্তনকেন্দ্রিক গঠন সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং কঠিন সময়টি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার ঠিক না থাকায় মাকে সকল সময় শিশুর নিকট বিশেষ পরিবেশ-রূপেই থাকিতে হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই মাতৃ-পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন, মাতৃ-সম্পর্ক একেবারে গোড়া হইতেই কাজ করে।

৩১। শিশুকে যে-কোনো কঠিন পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতে গেলে মাকে যে ভয়ানক কঠিন কিছু করিতে হয়, তাহা নহে। মাকে কেবল একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, শিশু যেন তাঁহার সংযত স্নেহ-স্পর্শ হইতে বঞ্চিত

না হয়। মায়ের স্নেহ ও তাঁহার স্পর্শ মাতৃস্তনই হউক বা মাতৃক্রোড়ই হউক শিশুর জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। এইটুকু হইলেই যথেষ্ট হইল। শিশুর ভার মা না লইয়া অপরের উপর দিয়া রাখিলে শিশু-চিত্তের ক্ষতি হয় বলিয়াই মনো-বিশ্লেষণের বিশ্বাস। 'আয়া', বা 'দাস-দাসী'র উপর শিশুর ভার অধিকাংশ সময় ছাড়িয়া দিলে শিশু-মনে একটি গভীর বঞ্চনার বোধ ও পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে; পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশের শ্রেণীবিশেষে এরূপ 'আয়া', রাখার প্রচলন হইলেও ইহা পাশ্চাত্য, বিজ্ঞানের সমর্থন লাভ করে না। সার্থক শিশুপালনের জন্য মাকেই সকল ভার লইতে হয়।

৩২। স্তনপান হইতে মাতৃপর্ব হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় না। ইহা ক্রমশ আসে, কখনো দুইটি পর্বে মিশিয়া থাকে, কখনো একটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মাতৃপর্বে স্তনপর্বের সকল লক্ষণ সহসা অদৃশ্য হইয়া যায় না বা মাতৃপর্বের লক্ষণসমূহ অকস্মাৎ প্রকাশ পায় না।

৩৩। এইখানে মাতৃপর্বের বিশেষত্বের কথা আসিয়া পড়ে। এই স্তরে শিশু মাকে সমগ্রভাবে ধারণায় আনিতে পারে; ক্রমশ মাকেই ধারণা করে, স্তনের একাধিপত্য ক্ষীণ হইয়া আসে, মাতৃ-পরিবেশের প্রাধান্য স্পষ্ট হইতে থাকে। এই স্তরে ক্লেশের সময় মাতৃ-স্তন শিশুর প্রত্যাশায় ওঠে না, মা জাগিয়া ওঠেন; মাতৃস্তন অপেক্ষা মাকেই তাহার প্রয়োজন বেশী। ধীরে ধীরে শিশুচিত্তে মাতৃস্তনের পরিবর্তে সমগ্র মা প্রতিষ্ঠিত হন। তখন মা'ই ভালো, মন্দ হইলে মা'ই মন্দ; মাতৃস্তন তখন ভালো-মন্দের বাহিরে যেন চলিয়া যায়। মায়েরই প্রতি আকর্ষণ, মা'ই বৈরী—মাতৃস্তন নহে। শিশু-চিত্তে যখন-তখন মাতৃ-প্রতিরূপ জাগিতে থাকে, মাতৃস্তন শিশু-মনের কেন্দ্রে আর থাকে না।

৩৪। শিশু তাহার মাকে সমগ্রভাবে ধারণা করিতে পারিলে তাহার 'ব্যক্তি'-ধারণা গঠিত হয়। তাহার সমস্ত পরিবেশ একটানা একটি অবিশেষিত পরিবেশ হইয়া আর থাকে না। পরিবেশে তাহার 'ব্যক্তি'-বোধ গঠিত হয়। শিশুর ব্যক্তি-ধারণার সর্বপ্রথম অবলম্বন সমগ্র মা, মাকে ধারণায় আনিতে পারিয়াই সে 'ব্যক্তি'কে ধারণায় আনিতে শিখে। ইহাই তাহার ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবনের সূচনা এবং গোড়াপত্তন। মা'কে বা মাতৃ-অনুরূপ কাহাকেও 'ব্যক্তি' হিসাবে ধারণায় না পাইলে শিশুর পক্ষে ব্যক্তি-ধারণা গঠন করা সম্ভব হইত কিনা বলা যায় না।

৩৫। মাতৃস্তরে ব্যক্তি-ধারণার সহিত ভালো-মন্দের অনুভূতিটি স্পষ্ট হইতে থাকে। স্তনকেন্দ্রিক অবস্থায় শিশুর নিকট মাতৃস্তন কখনো ভালো হইত, কখনো মন্দ হইত; ইহা লইয়া তাহার কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না। মাতৃপর্বে এরূপ থাকিতে পারে না। প্রথম প্রথম শিশু মাকে একবার ভালো এবং একবার মন্দ বলিয়া গ্রহণ করে; একবার তাহার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, আবার বৈরভাবও দেখা দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে। কিন্তু মাতৃস্তরে কিছুকাল যাইতে না যাইতে অন্তর্দ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। শিশু-মন মীমাংসা চাহে, মা ভালো না মন্দ? যতক্ষণ না ইহার একপ্রকার মীমাংসা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শিশু পীড়িত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে শিশু তাহার মতো করিয়া যা হোক একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া যায়; কোনো বিচারের পথে শিশু তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না; তাহার আপন অনুভূতি অনুসারে, নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, মা ভালো না মন্দ একপ্রকার স্থির করিয়া লয়। তাহার জীবনে, মা সম্পূর্ণ ভালো, শতকরা একশত ভাগই ভালো এরূপ অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নহে। কারণ শিশুর ভালো লাগা অনুসারে মা সমস্ত কাজ করিবেন, ইহা সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। অতএব শিশু-জীবনে মাকে সম্পূর্ণরূপে ভালো মনে করা অসম্ভব। ইহারই জন্য শিশু-মনে সামান্য একটু দ্বিধা থাকিয়া যাইতে পারে, সামান্য মন্দ বা সামান্য ভালোর ধারণা মনের গোপন স্তরে জাগিয়া থাকা সম্ভব। তথাপি যথোচিত পরিবেশে একটি ধারণাই প্রাধান্য লাভ করে; শিশুর মনে হয় 'মা ভালো', নাহয় 'মা মন্দ'। এইরূপ একটি দিকে ধারণা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ঠিক অনুকূল পরিবেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্বিষ হইয়া আসে। পরিবেশ অনুকূল না হইলে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, তাহাতে শিশুর অনর্থক শক্তিক্ষয় হয়, আপন সম্ভাবনা অনুসারে অগ্রসর হইতে পারে না।

৩৬। শিশুর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় মায়ের স্নেহ, সেবা, নৈপুণ্য প্রভৃতি যেমন সাহায্য করে, তেমন আর কিছু নহে। মায়ের দিক হইতে আগ্রহ, শক্তি, শিক্ষা, ধৈর্য, আনন্দ, স্নেহ প্রভৃতির প্রকাশ পাইতে থাকিলে শিশু সহজেই স্তন-স্তর হইতে মাতৃ-স্তরে পরিণতি লাভ করে এবং মাতৃ-স্তরেও অন্তরের দ্বন্দ্ব হইতে যথেষ্ট শান্তি পায়। শুধু ইহাই নহে। মায়ের মাতৃ-গুণের প্রকাশ হইতে থাকিলে শিশু অতি স্বাভাবিকভাবেই মাকে ভালো বলিয়াই গ্রহণ করে এবং মায়ের প্রতি ভালবাসা বোধ করে। শিশুর চিন্তায়

কল্পনায় আচরণে এই ভালো-লাগা ও ভালবাসা প্রতিক্ষণেই প্রতিফলিত হয়। মাকে ভালো-লাগাটা শিশুর মনে প্রাধান্য বিস্তার করিলে তাহার মাকে ভালবাসিবার কত ইচ্ছা করে। শিশু যখন আরও একটু বড় হয়, 'স্বাধীন' হয়, তখনো তাহার মাকে লইয়া কত কল্পনা সে করিতে থাকে। মাকে কত প্রকারে রক্ষা করা যায়, কত প্রকারে কিছু দেওয়া যায়, মায়ের জন্য কত দুঃসাধ্য সাধন করা যায়, তাহার বিচিত্র কল্পনা চলে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বীরপুরুষ' কবিতাটিতে শিশু-বীর তাহার মাকে কী সাংঘাতিক বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কল্পনা করিতেছে! এবং যখন তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ইহা কল্পনা মাত্র, সত্য ঘটনা নহে তখন তাহার মনে কী খেদ জন্মিল! শিশু-বীরের এই কল্পনার সুখ তাহার মাতৃকেন্দ্রিক বয়সে মা'কে ভালো-লাগার প্রমাণ। এই কাহিনীতে মায়ের যে বিপদ্‌টুকু শিশু কল্পনা করিয়াছে তাহাতে হয়তো তাহার অন্তরের সামান্য গোপন মাতৃবৈরিতার পরিচয় রহিয়াছে। তাহা হউক, গোপন মাতৃবৈরিতা একটু তাহার অন্তরে লাগিয়া থাকুক, তথাপি তাহার প্রধান আশা মা'কে খুশী করা, মুগ্ধ করা। ইহাই মাকে ভালো-লাগার একটি দৃষ্টান্ত।

৩৭। মাকে ভালো-লাগার ফল কেবল মায়ের ক্ষেত্রেই শেষ হইয়া যায় না, মাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশ পরিবেশের বহু ব্যক্তির প্রতি একই ভাব সৃষ্ট হইতে থাকে। মা'কে লইয়া যেমন 'ব্যক্তি'-ধারণা গঠিত হয় এবং তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবেশের সকল ব্যক্তিকে 'ব্যক্তি' বলিয়া বুঝিবার সহায়তা করে, মাকে ভালো-লাগাও সেইরূপে পরিবেশে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। মাকে যদি ভালো লাগে তাহা হইলে পরিবেশের বহু ব্যক্তিকে ভালো লাগিবে, এমন-কি পরিবেশের সব-কিছুই যেন প্রীতিদায়ক মনে হইতে থাকিবে। মাকে ভালো-লাগা ও ভালবাসার দ্বারা শিশু যেন একপ্রকার ভালো-লাগার সাধারণ দৃষ্টি লাভ করে, পরিবেশের সবই যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তাহার পরিবেশের অন্যান্য প্রভাবের দ্বারা ব্যাহত বা বিকৃত না হইলে এই সাধারণ ভালো-লাগাটুকু চিরদিনই মনে লাগিয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাস্তব জীবনে বহু দিক হইতে এরূপ বহুবিধ বিপরীত প্রভাব কাজ করিতে থাকে; তজ্জন্য মাতৃপর্বের সাধারণ ভালবাসার দৃষ্টিটি পরিবর্তিত হয়, শৈশবের ভালো-লাগার শক্তি যেন ক্রমেই কমিয়া যায়।

৩৮। মাকে মন্দ বলিয়া ধারণা হইলে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীত হইবার

সম্ভাবনা। যেখানে মাকে মন্দ বলিয়া ধারণা হয়, সেখানে প্রায়ই শিশু-চিত্তে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শিশুর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি মা; তাহার মাতৃপর্বে ইহার ব্যতিক্রম নাই। মায়ের নিকট শিশু দিনের মধ্যে বহুবার সেবা-সুখ লাভ করে—মাতৃস্তন্য পান করিয়া বা অন্য উপায়ে মায়ের দেওয়া আরাম গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা তাহার চিত্তে মাকে ভালোই লাগিবে। ইহা সত্ত্বেও মায়ের অন্যান্য ত্রুটির জন্য মাকে মন্দ বলিয়া ধারণা জন্মিলে শিশুর মনে ভালো এবং মন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। কোনো মা সম্পূর্ণভাবে মন্দ হইতে পারিলে বোধ হয় অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বাস্তবে যেমন শতকরা একশত ভাগ ভালো-মা পাওয়া যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ মন্দ-মা বাস্তবে হয় না। সুতরাং অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়—মন্দ-মায়ের ধারণা শিশু-চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিলে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা অধিক।

৩৯। অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ ব্যাপার নহে। ইহার কুফল শিশুজীবনে অনেক। মায়ের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁহার প্রতি শিশুর বৈরভাব শিশু-চিত্তে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, তাহাতে শিশুর শক্তি-ক্ষয় হয়; সদা-সর্বদা মানসিক লড়াই করিতে গিয়া অগ্রগতির জন্য শিশু সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারে না। অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হইলে অগ্রগতি অল্প এবং শক্তির অপচয় অনেক ঘটিয়া যায়। শিশু তাহার মানসিক সাম্য ও ধৈর্য হারাইতে থাকে, তাহাতে তাহার ক্লেশ হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই-সকল পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহার মন একাধিক কৌশল অবলম্বন করে। শিশুর অভিজ্ঞতা অত্যল্প, বুদ্ধিশক্তিও অল্প; সে নিজে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোনো কৌশল আবিষ্কার করে না। কিন্তু শিশু-প্রকৃতিতে কয়েকটি বিশেষ কৌশল স্বাভাবিক দেখা যায়। ইহাদের রূপ অনেক, তবে দুইটি প্রধান ভাগ আছে। দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করাই ভালো। শিশু-চিত্তে মা ভালো হইবেন এ কামনা থাকে; অথচ কোনো শিশুর মাতৃ-ধারণা মন্দ, সুতরাং পীড়াদায়ক। এরূপ ক্ষেত্রে শিশু তাহার ধারণাকে দুইটি ভাগে ভাগ করিতে পারে—মা ভালো কামনা করিয়া মাকেই ভালো বলিয়া ধরে; মায়ের নিকট মাতৃ-অনুরূপ কেহ থাকিলে তাঁহাকে মন্দ বলিয়া ধারণা করে। ইহা যেন তাহার অন্তরের দুইটি বিপরীত অনুভূতিকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া দুইটি পৃথক ব্যক্তিতে আরোপ করা হইতেছে। এই কারণে অনেক সময় শিশু নিতান্ত বিনা কারণে শিক্ষিকা ধাত্রী বা যে-কোনো স্ত্রীলোককে বৈরভাব প্রদর্শন করিলে অনুমান করা যায়

যে মায়ের প্রতি তাহার অন্তরের অপ্রকাশিত বৈরভাবই সে অপরের উপর আরোপ করিতে চাহিতেছে এবং এইভাবে সে অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে। শিক্ষিকার প্রতি এইরূপ বৈরভাব আরোপিত হইলে শিশুর ভবিষ্যৎ যে বিকশিত হইতে বাধা পায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই অসুবিধার মূল মাতৃপর্বে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বে বা মাকে মন্দ বলিয়া ধারণা করায় নিহিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত শিশুর অকারণ ভীতি। শিশু মায়ের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিলে মাও তাহার বৈরী হইয়া থাকিবেন, ইহাই তাহার ধারণা। সে মায়ের বৈরী অথচ মা তাহার সম্পর্কে বৈরী নহেন, এরূপ ধারণা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণে যখনই শিশু-চিত্তে গোপন মাতৃ-বৈরিতার উদ্ভব হয় তখনই তাহার মনের কোণে গোপনে এক মাতৃ-ভীতি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার মনে মনে এক ভয় থাকে, মা বোধ হয় সুযোগ পাইলেই তাহাকে ভীষণ পীড়া দিবেন। শিশুর ইহা অহেতুক ভয়, মনের কোণে থাকিয়া মিছামিছি পীড়া দেয়। শিশু এই ভয় হইতেও মুক্তি চাহে। মা তাহার নিকটে সদা-সর্বদা রহিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে সদা সর্বদা ভয়ের-পীড়া ভোগ করা অসহনীয় অবস্থা। শিশু তখন দ্বিতীয় কৌশল অবলম্বন করে—বাহিরের কোনো বস্তু বা প্রাণীর প্রতি মাতৃ-ভীতিটা আরোপ করিয়া রাখে। অর্থাৎ মায়ের মনের বৈরিতা ও ভয়ানক অংশটা মায়ের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া যেন অপর কোনো কিছুতে দেওয়া হইল, তাহার ফলে শিশুর মনের নিকট মা ভালো হইয়া রহিলেন, শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব শান্ত হইল। এদিকে যে বস্তু বা প্রাণীর উপর ভয়ানক ভাবটা আরোপিত হইয়াছে শিশু তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে থাকে। বয়স্ক মনের বিচারে ইহা নিতান্ত হাস্যজনক। কিন্তু বয়স্ক মনের বেলাতেও অনেক সময় অকারণ দস্যু-ভীতি বা অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভীতি দেখা যায়, ইহাতে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বৈরিতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। যাহাই হউক, শিশু এইরূপে মাতৃ-ভীতিটা বাহিরে আরোপ করিয়া নিজেকে পীড়া হইতে মুক্তি দেয়। একবার একটি শিশু তাহার মায়ের চটিজুতা দেখিয়া অকস্মাৎ ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। মা আসিয়া তাহার এই অহেতুক ভয় দূর করিবার বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিশুর ভয় কোনোমতে কমিল না। ক্রমে শিশুর জুতা দেখিলেই ভয় পাওয়ার এক অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল। অবশেষে মা তাঁহার জুতা বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া শান্তি-বিধান করিলেন। মনোবিশ্লেষণে এই ব্যাপারটির কারণ নির্ণয়

করিতে গিয়া জানা গেল যে, শিশু অনুমান করে (এবং তাহার অনুমান মিথ্যা নহে) তাহার মা তাহার প্রতি তীব্র বৈরভাব পোষণ করিতেছেন। শিশু ইহাতে অত্যন্ত ভীত হয়। ভয়ের পীড়া একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিলে সে মায়ের জুতাকে ভয়ানক কল্পনা করিতে আরম্ভ করে। মায়ের জুতা যখন ভয়ানক হইয়া উঠিল, তখন মা ভালো হইয়া রহিলেন। শিশুর কল্পনা-শক্তি কম নহে; সে কল্পনা করিয়া লইল—মায়ের জুতা আর জুতা রহিল না, বোধ হয় বিকট-হাঁ-করা ভীষণ জীব-রূপে তাহাকে দংশন করিতে আসিল।

৪০। শৈশবের মাতৃপর্বে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা না হইলে ধরিয়া লওয়া যায় মাতৃবৈরিতার পীড়া হইতে শিশু বাঁচিবে। কিন্তু তাই বলিয়া মনের কোণে কিছুমাত্র মাতৃ-বৈরিতা থাকিবে না, এতটা বাস্তবে সম্ভব নহে। এই অপরিহার্য অন্তর্দ্বন্দ্বটুকু অনেক ক্ষেত্রে শিশু-মনে অকারণ ভীতির অভ্যাস সৃষ্টি করিতে পারে। শৈশবে এই শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুদের রাত্রি-ভীতি, অন্ধকার-ভীতি, অহেতুক পশু-পক্ষী-ভীতির গোপন কারণ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—অনুমান না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু শিশুর পক্ষে এই-সকল ভীতি অতিক্রম করিয়া যাওয়া কঠিন হয় না, কারণ সাধারণতঃ পরিবেশের অন্যান্য প্রভাব ক্রমাগত শিশুকে ইহাদের অতিক্রম করিতে সাহায্য করিতেছে। মায়ের দিক হইতে স্নেহস্পর্শ থাকিলে শিশু এই-সকল অমূলক ভীতি অতি সহজেই পার হইতে পারে। প্রায় অধিকাংশ শিশুই অমূলক ভীতি হইতে কিছুকাল পীড়া ভোগ করে, অমূলক ভয় করাটা যেন শৈশবের একটি সাময়িক ব্যাপার, সকল শিশুর ক্ষেত্রেই যেন অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাময়িক অকারণ-ভীতির কালটুকু পার হইয়া যাওয়াও স্বাভাবিক। কেবল গভীর মাতৃবৈরিতার ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ভীতি একটি মানসিক ত্রুটিরূপেই অনেক কাল থাকে।

৪১। মাতৃ-পরিবেশের মূল প্রভাব মায়ের স্নেহ। সেইটুকু যথার্থ প্রকাশ পাইলে স্তনপর্বে, মাতৃপর্বে বা তাহার পরেও সকল চিত্ত-সঙ্কট শিশু সহজেই কাটাইয়া উঠিবে এবং আপন বৈশিষ্ট্য-অনুসারে পরিণতি লাভ করিবে। মায়ের পক্ষে স্নেহ স্বাভাবিক, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তথাপি দু-একটি বিষয়ে মায়েদের মনোযোগ থাকা আবশ্যক।

৪২। অন্তরে অন্তরে মায়ের স্নেহ চিরকালই খাঁটি, এবং অকৃপণ তাঁহার আত্মদান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্নেহের প্রভাব আশানুরূপ হয় না, কখনো

কখনো খারাপ ফল হইতে থাকে। এইদিকে প্রথম কথা—মাতৃস্নেহের যথার্থ প্রকাশ হওয়া চাই। অনেকে ভাবেন, অন্তর খাঁটি থাকিলেই যথেষ্ট হইল; বাহিরের আচরণ যাহাই হউক-না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। মায়ের অন্তর সন্তান-স্নেহে পূর্ণ, অতএব বাহিরে তাহার প্রকাশ হইল কি না হইল, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে। অনেকের মুখে শোনা এই তত্ত্বটি ঠিক গ্রহণযোগ্য নহে। মায়ের স্নেহের ভাণ্ডার অফুরন্ত হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ থাকা চাই। শৈশবে ইহা অত্যন্ত সত্য। বয়স্ক জীবনেও স্নেহের, প্রেমের, প্রকাশ না থাকিলে কেবলমাত্র 'বোবা গভীরতা'র দ্বারা সার্থকতা লাভ করা যায় না।

৪৩। স্নেহের প্রকাশ, বিশেষ করিয়া শিশুর প্রতি মায়ের হৃদয়ভাবের প্রকাশ, প্রধানতঃ স্পর্শের ও আদরের মধ্যেই ঘটে। এই কারণে মায়ের দিক হইতে শিশুকে নানাভাবে আদর ও স্পর্শ করা আবশ্যক। সন্তান-স্পর্শে মায়ের আনন্দ কত তাহা মায়েরা জানেন। তাঁহাদের আনন্দ সমগ্র দেহে আনন্দ জাগাইয়া তোলে। এমন-কি শরীরতত্ত্ববিদের মতে নবজাত শিশু যখন মাতৃবক্ষে অমৃতধারা পান করিতে থাকে, তখন মায়ের আলোড়িত স্নেহ তাঁহার সর্বাঙ্গে কাজ করিতে থাকে, জরায়ু প্রভৃতি সন্তান-ধারণ ও সন্তান-প্রসবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে থাকে এবং দেহের যথাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। স্বচ্ছন্দে স্তন্যপানরত শিশু এক অতুলনীয় শান্তি ভোগ করিতে পায় বলিয়া তাহারও সকল দিকে সামঞ্জস্য ও দৃঢ়তা আসিতে থাকে। মায়ের আনন্দিত দেহের প্রধান উদ্দীপক সন্তান-স্পর্শ; শৈশবের আনন্দ-তৃপ্তির বিশেষ ধারা স্তনস্পর্শ বা মাতৃস্পর্শ। মায়ের সন্তান-স্পর্শ ও সন্তান-আদর কখনো যেন অপ্রচুর না হয়, অন্তরের পাত্র স্নেহে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে না, স্পর্শে আদরে তাহার অমৃতধারা শিশুর অণুতে অণুতে প্রবেশ করা চাই।

৪৪। শিশুকে আদর করিবার, স্নেহ করিবার কত-যে পথ, কত তাহার রূপ, বলিয়া শেষ করা যায় না। কখনো শিশুর অস্ফুট ভাষা অনুকরণ করিয়া, কখনো চুমা দিয়া, কখনো হাততালি দিয়া আদর করা হয়। আদরের তালিকা প্রণয়ন যেন দুঃসাধ্য ব্যাপার। সবই ভালো, সবই মধুর। তথাপি 'সবই ভালো'র মধ্যে, পুষ্পে কীটের ন্যায়, মাঝে মাঝে একটু খারাপ

লুকাইয়া থাকে। সেই 'একটু' খারাপের বিষয়টি দৃষ্টির বাহিরে থাকা ঠিক নহে। মা শিশুকে আদর-স্পর্শ দিয়া যে আনন্দ পান তাহা পবিত্রতম আনন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশু মায়ের স্পর্শে যে সুখভোগ করে তাহাও নির্মল। তথাপি সকল পবিত্রতা ও নির্মলতার তলদেশে কোথায় যেন একটু ময়লা লুকাইয়া থাকে, অতিরিক্ত নাড়াচাড়া পড়িলেই কেমন ঘুলাইয়া ওঠে। মাতৃস্পর্শের কোথায় একটু কামের আভাস থাকে, সাধারণ চোখে তাহা ধরা পড়ে না—না পড়িলেও মনোবিশ্লেষণের ইঙ্গিত এই দিকেই। যখন মা তীব্র স্নেহের আবেগে শিশুকে অতিরিক্ত আদরে অস্থির করিয়া তোলেন, তখন তাঁহার সেই আদর-স্পর্শে প্রচ্ছন্ন কামের প্রভাব দেখা যায়। অনেক সময়ে মায়ের আদর এতই দমকা ঝড়ের মতো বাঁধন-হীন অর্থ-হীন অতিরিক্ত হইয়া পড়ে যে সাধারণ চোখেও একটু ভিন্নপ্রকার বোধ হয়। মায়ের ও শিশুর মধ্যে যে সূক্ষ্ম সুর বাজিতে থাকে, সহসা কোথা হইতে একটা বেখাপ্পা মোটা আওয়াজ আসিয়া তাহাকে অস্বস্তিকর করিয়া তোলে। অনেকে হয়তো জানেন যে, বহু জননীর ( এবং সেই গৃহে অল্পাধিক সকলেরই ) এক অভ্যাস আছে—শিশুর কামেন্দ্রিয়কে উপলক্ষ করিয়া শিশুকে আদর করা। ইহা সরল শুদ্ধ মনে করা হইলেও ইহার প্রতিক্রিয়া ভাল হয় না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার স্পর্শ ও আদর জননীর দিক হইতে আসে বলিয়া পবিত্র মনে হয়। কিন্তু সুন্দরতম নর-নারীর দেহের অভ্যন্তরে যেমন মলস্তূপ গোপন থাকে, তেমনি সরল-হৃদয়া জননীর মনেও কাম-বীজ বর্তমান। ইহা তাঁহার অসংযত সন্তান-স্পর্শে প্রকাশ পায়। অসংযত অশোভন আদরের দ্বারা মায়ের যত ক্ষতি হইতে পারে, শিশুর জীবনে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। শিশু যখন একটু বড় হইয়াছে তখন এই ক্ষতির আশঙ্কা আরো অধিক। অল্পবয়সী শিশুর প্রতি মায়ের কাম-স্পৃষ্ট আদর অত্যন্ত গোপনভাবে ক্ষতি করে, বাহির হইতে আদৌ বোঝা যায় না। শিশুর চিত্ত-বিকৃতি হইবার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে মায়ের অ-মাতৃ-সুলভ অতিরিক্ত আদর তুচ্ছ নহে। মায়ের দিকে ক্ষতি—এইরূপ অসংযত আদরের কারণে তাঁহার নারীত্বের সকল দিক সুষম হইতে পায় না।

৪৫। শিশুর বয়সের সহিত মায়ের স্পর্শের ও আদরের ধরন পরিবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ শিশু সকল বয়সে জননীর একই প্রকার আদর পছন্দ করে না। অতি শৈশবে স্তনস্পর্শই একমাত্র কাম্য স্পর্শ, ইহার বাইরে

শিশুর কিছুই থাকে না। তাহার পর মাতৃপর্বে শিশু সমগ্র মাকে ধারণা করে, তখন তাহার মাতৃক্রোড় আবশ্যক। স্তনস্পর্শে বা মায়ের হস্তস্পর্শে সে সমগ্র মাকেই অনুভব করে। এমন-কি তাহাকে যখন শান্ত করিবার জন্য বা ঘুম পাড়াইবার জন্য চাপড়ানো হয়, তখন সে সেই চাপড়ানোর মধ্যে ছন্দ-সুখের সহিত মাতৃ-স্পর্শ উপলব্ধি করে। যত বয়স হয়, শিশু ততই মায়ের প্রত্যক্ষ দৈহিক স্পর্শ হইতে একটু একটু করিয়া স্বাধীন হইতে থাকে। ক্রমশ তাহার পক্ষে মায়ের উপস্থিতিই যথেষ্ট হইয়া ওঠে। অবশেষে সে মাকে বহুক্ষণ না দেখিয়াও আপন মনে দূরে থাকিতে পারে ; কেবল তাহার মনের তলায় 'মা' আছেন, তাঁহার স্পর্শ আছে, ক্রোড় আছে, আদর আছে,—এই ভাবটুকু ফল্গুধারার মতো কাজ করিতে থাকে। শিশু বড় হইলে মায়ের প্রত্যক্ষ আদর আবশ্যক হয় না, এবং তেমন রুচিকরও হয় না। স্তনপান-বয়সে মায়ের স্তন্যদান যেমন প্রয়োজন, মাতৃকেন্দ্রিক বয়সে শিশুর পক্ষে মাতৃক্রোড় বা মায়ের স্পর্শের প্রতীক-স্বরূপ মায়ের উপস্থিতি যেমন আবশ্যক, তেমনি শিশুকে মাতৃনিরপেক্ষ করিয়া তুলিতে সাহায্য করাও মায়েরই কর্তব্য। শিশু-পালনের জন্য মায়ের স্নেহের প্রকাশ চাই, তাহা তাঁহার আদরের ও স্পর্শের দ্বারাই প্রধানতঃ প্রকাশ পাইবে। তাই বলিয়া শিশুর বয়স বিচার না করিবার কোন কারণ নাই। শিশু যেভাবে মাতৃস্পর্শ ও আদর পছন্দ করিবে মাকে সেই ভাবেই আদর ও স্পর্শদান করিতে হইবে, নতুবা শিশুর ভালো লাগিবে না। মনে করিতে হইবে প্রাণীর ধর্ম স্বতন্ত্র হইয়া ওঠা। পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ওঠা নহে, কিন্তু, পরিবেশে মধ্যস্থতায় এবং পরিবেশের পটভূমিকায় স্বতন্ত্র হইয়া ওঠা জীবনের ধর্ম। শিশুর মাতৃজঠরে প্রাণবিন্দু-রূপে যাত্রা শুরু করিয়াছে, মাতৃ-জঠর হইতে বাহিরের আলো বাতাসে আসিয়া মাতৃদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ক্রমেই সে বড় হইতেছে, স্বতন্ত্র হইতেছে। ইহাই তাহার বিকাশের গতি। মা তাহার এই স্বাতন্ত্র্যমুখী বিকাশে সাহায্য করিবেন। যতটুকু আদর ও স্পর্শ ইহার সমর্থক হয়, তাহার অতিরিক্ত চাপাইবেন না। কোন কারণেই শিশুর স্বাতন্ত্র্য-বোধের অন্তরায় হইতে পারে এমন আদর করিবেন না। অনেক সময়, শিশু যত বড় হউক না কেন, মা হইতে তাহার স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় না ; যেন সে চিরদিনই মাতৃকেন্দ্রিকতার কিছু কিছু ভাব মনের কোণে বহন করিয়াই চলে ; সে বয়স্ক হইয়াও 'বুড়ো-খোকা' হইয়া থাকে। সর্বদা মাতৃনির্ভর, মাতৃস্পর্শমুখী থাকে। এইরূপ মায়ে-আবদ্ধ বুড়ো

শিশুর সংখ্যা হয়তো বেশী নহে, তথাপি বিরলও নহে। ইহা অস্বাভাবিক, মানসিক অপরিণতির লক্ষণ, অথবা বলা চলে মনের ইহা একপ্রকার রোগ। অতিরিক্ত মাতৃস্পর্শ, মাতৃস্পর্শে কামের আভাস এবং শিশুর সকল বয়সে একই প্রকার আদর ঐরূপ মানসিক অস্বাস্থ্য বা অস্বাভাবিকতার অন্যতম কারণ হইতে পারে। এইজন্য মায়ের আদরের ভিতরে একটি স্বভাবসংগত সংযমের ছন্দ থাকা প্রয়োজন। কোন্ বয়সে কিরূপ আদর করিতে হইবে তাহার নিয়ম নাই, তালিকা নাই। মায়ের স্নেহদৃষ্টি শিশুর অন্তরকে দেখিতে পায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং, সংযত শুদ্ধচিত্ত হইলে, সন্তানের কল্যাণ-অনুকূল বিধি ও ব্যবহার মায়ের আপন অন্তর হইতেই স্বতঃ উৎসারিত হইবে।

## মা ও শৈশবের গূঢ় পরিণতি

৪৬। শিশুর স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতে গেলে আরো দুইটি বিষয়ে আসিতে হয়। প্রথমটি প্রায় সর্বজনপরিচিত ব্যাপার, দ্বিতীয়টি একটু গূঢ় মানসিক ক্রিয়া।

৪৭। শিশু জন্মের পূর্ব হইতেই স্বাতন্ত্র্যের বীজ লইয়া আসে; তাহার সামর্থ্য, তাহার বিকাশ-গতি অপর শিশুর তুলনায় কোন-না কোন দিকে স্বতন্ত্র হয়। মাতৃ-পরিবেশ বা অপর কোন পরিবেশই এই জন্মগত স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা দূর করিতে পারে না। পরিবেশের গুণে মোটামুটি একই ছাঁচে হয়তো অনেক শিশুকে 'ঢালাই' করা যায়। তাহাতে শিশুর শক্তির অপচয় ঘটে এবং যে দিকে সামর্থ্য নাই সে দিকে পরিচালিত, প্রেষিত হওয়ায়, অথবা যে বিষয়ে সামর্থ্য আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, শিশুর দেহে-চিত্তে পীড়া ঘটে। সংসারে যে সকল চাপে শিশুকে একটি নির্দিষ্ট পথে আত্মগঠন করিতে হয়, তাহার মধ্যে মাতৃ-পরিবেশের চাপটি তুচ্ছ নহে। অন্তত শিশু যে-পর্যন্ত না বিদ্যালয়ে যায় বা বহিঃসমাজে যুক্ত হয় ততদিন মায়ের চাপটি প্রধান মা নিজের 'আদর্শ'-অনুসারে শিশুকে মানুষ করিতে চাহেন। একেবারে গোড়া হইতেই শিশুর প্রতি 'শিক্ষা'-প্রয়োগ চলিতে থাকে। শিশুর বয়স অনুসারে শিক্ষা-দান করিবার মতো ধৈর্য মায়ের থাকে না; শিশুর সামর্থ্য কোন্ পথে তাহা বিচার করিবার মতো মুক্ত মন মায়ের থাকে না। মা শিশুকে মানুষ করিতে থাকেন শিশুর পথে নহে, তাঁহার নিজের পথে। ইহাতে স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী

জীবনে অনেক শক্তি অপব্যয়িত হয়, অনেক শক্তি অ-বিকশিত থাকে। শিশুর পীড়া ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু ইহাই সাধারণ স্নেহান্ধ মায়ের স্বভাব। তিনি মনে করেন, 'শিশু, তাহার আবার নিজত্ব বা নিজস্ব বলিতে কী আছে! আমার সন্তান আমার মনের মতো ভাবে মানুষ হইবে না তো অন্য কাহার রুচি অনুসারে বড় হইবে!' মায়ের পক্ষে শিশুকে এই দৃষ্টিতে দেখা খুবই স্বাভাবিক। অথচ, শিশুর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক নহে। সন্তানের কল্যাণ কামনা করিলে, নিজের মনের কামনা শিশুর উপর চাপাইয়া তাহার পরিবেশকে একটি ছাঁচের মতো করিয়া ফেলা উচিত হয় না।

৪৮। আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহে, মায়েদের নিজস্ব মতামত কিছু আছে কিনা, নিজস্ব আদর্শ কিছু থাকিতে পায় কিনা সে বিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ করা যায়। মায়েদের নিজের নিজের ধারণা ও চিন্তা অনুযায়ী শিশুপালনের অধিকার এবং শিক্ষা যদি থাকে তাহা হইলেই উপরের অংশটি বিবেচ্য। নতুবা যে সমাজে মায়ের উপর শিশু-পালনের সত্য অধিকার দেওয়া নাই বা দেওয়া এখনো চলে না, সেখানে উল্লিখিত প্রসঙ্গের অবতারণাই অনাবশ্যক।

৪৯। শিশুর মাতৃ-নিরপেক্ষ হইয়া ওঠা ব্যাপারটিকে আর-এক দিক হইতে দেখিতে হইবে। বুঝিতে হইবে ইহার মূল কারণ, শিশু বা মায়ের অগোচরে শিশু-মনের বিকাশ। ইহাতে জীবজগতের অলক্ষ্য নিয়ম বড় বিস্ময়জনকভাবে কাজ করিতেছে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে প্রথম জন্মলাভ করে তখনই স্থির হইয়া যায় যে পুরুষ হইবে না নারী হইবে। সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার গঠন পুরুষত্ব অথবা নারীত্ব অভিমুখে চলিতে থাকে। মাতৃজঠর হইতে মুক্ত হইয়াও তাহার সেই দিকের গতি অব্যাহত থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পুরুষ বা নারী-রূপে বিকাশ সমাপ্ত হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই শিশু সম্পূর্ণ পুরুষ-দেহ বা নারী-দেহ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু পৃথিবীতে আগমন করিবার সময়ে সে দেহ ব্যতীত অন্যান্য দিকে পুরুষ বা নারী-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। পুরুষ বা নারী-প্রকৃতি লাভ করিতে শিশুর আরো কিছু সময় প্রয়োজন। এই সময়টুকু নিতান্ত অল্প নহে, ইহা শৈশবের বড় অংশটুকুই দাবি করে। শিশুর মধ্যে পুরুষ হইয়া উঠিবার বা নারী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা তাহার জন্মক্ষণে প্রকৃতির দেওয়া সম্ভাবনা। কিন্তু কেবল জন্মগত সম্ভাবনা থাকিলেই তো হয় না, উপযুক্ত

পরিবেশের প্রয়োজন। পুরুষ বা নারী-প্রকৃতি-গঠনের জন্য যে পরিবেশ উপযুক্ত তাহারই নাম মাতৃ-পরিবেশের যোগেই শিশু আপনার নারী-প্রকৃতির প্রাথমিক গঠন সমাপ্ত করে এবং পুরুষ হইলে পুরুষ-প্রকৃতির পর্বটুকু সারিয়া লয়। পূর্বোক্ত বাক্যটির নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৫০। শৈশবের একেবারে প্রথম দিকে শিশুর একমাত্র অবলম্বন তাহার মা। স্তন্যপান-পর্বে মাতৃস্তনই, অবশ্য, তাহার অবলম্বন; কিন্তু তাহার পরই, এমন-কি শিশু যখন তাহার মাতৃস্তন্য-পানের অভ্যাস ত্যাগ করে নাই তখনও মা'ই তাহার প্রধান পরিবেশ। প্রথম শৈশবে এইরূপ অবলম্বন সকল শিশুর পক্ষেই সমান, পুরুষ শিশু বা নারী-শিশু বলিয়া কোনো ভেদ থাকে না। কিন্তু এই অবস্থা খুব বেশী দিন থাকে না। মাতৃকেন্দ্রিক বয়স অতিক্রম হইবার সময়-সময় পুরুষ-শিশু ও নারী-শিশুর মধ্যে ভেদ ঘটিতে থাকে। পুরুষ-শিশু তাহার পিতার দিকে বা পিতৃ-অনুরূপ কোনো পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়। নারী-শিশু তাহার মায়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকিয়া যায়। মা যদি নারী-শিশুটির নিকট 'ভালো মা' না হন, তথাপি সে মায়ের সহিত যোগ ছিন্ন করে না (এইখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, আকর্ষণ বা ভালো-লাগা না থাকিলেও পরিবেশের সহিত যোগ থাকিতে পারে এবং সে যোগ নিবিড় হইতেও পারে)। পুরুষ-শিশু পিতার দিকে এবং নারী-শিশু মায়ের দিকে বিশেষভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য কাহারও কোনো চেষ্টার দরকার হয় না, কাহারও জ্ঞাতসারে ইহা ঘটে না; ইহা প্রকৃতির প্রয়োজনে, প্রকৃতির নিয়মে আপনা-আপনি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে পুরুষ-শিশু পিতার নিকট হইতে পুরুষ-পনা এবং নারী-শিশু মায়ের যোগে নারী-পনা নিজ সত্তায় গ্রহণ করে। ইহা প্রকৃতিরই উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে। নারী-শিশুর নারী হইয়া উঠিতে গেলে, নারী-সুলভ হাব-ভাব আচরণ ও বর্ণনাতীত নারী-বিশেষত্ব-গুলি নিজ চরিত্রে নিজেরই অগোচরে গ্রহণ করিতে পারা চাই। নারী-শিশুর স্বাভাবিক আদর্শ কে, তাহার মা ছাড়া আর কাহার সহিত এতখানি যোগ ঘটা সম্ভব? এই সময়ে মাতৃযোগ অত্যন্ত অধিক সে কথা বলাই বাহুল্য। মা সংযত-স্বভাব প্রফুল্লমতি প্রেমময়ী, স্নেহময়ী হইলে তাঁহার প্রতিক্ষণের আচরণে এই-সকল অমূল্য গুণের পরিচয় থাকিবে; নারী-শিশু নিগূঢ় অনুকরণ-বৃত্তির দ্বারা, শিশু-সুলভ অনুভূতির দ্বারা, আপন সত্তায় ইহাদেরই ছাপ গ্রহণ করিবে। এই সময়টিতে নারী-শিশু যেন মায়ের সাহিত একাত্মা হইয়া যায়,

মায়ের আচরণের অন্তরে যেন সে প্রবেশ করে এবং মায়ের সহিত মিলিয়া গিয়া নিজের আদর্শকে মাতৃ-অনুরূপ করিয়া তোলে। শিশুর সম্মুখে মায়ের আচরণে নারীসুলভ কমনীয়তা না থাকিলে নারী-শিশু যথাকালে লাবণ্যময় নারী-ভঙ্গী অর্জন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে এবং তাহার চাল-চলনে সাধারণভাবে কমনীয়তার একটা অভাব থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। অতএব নারী-শিশু যখন মায়ের সহিত একাত্ম হইয়া যাইবার বয়স প্রাপ্ত হয় তখন মায়ের দিক হইতে যথাসাধ্য অনুকরণীয় থাকিতে হয়। কিন্তু মা যদি স্বভাবতঃই ধীর সংযত আনন্দিত না থাকেন, তাহা হইলে কোনো-ক্রমেই নারী-শিশুকে ইচ্ছানুরূপ আদর্শ দিতে পারিবেন না। কারণ, অভিনয়ের দ্বারা ধীরতা প্রফুল্লতা বেশীক্ষণ রক্ষা চলে না, কিছুক্ষণ অন্তর তাহা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং শিশুর অনুভূতিতে ঐ ব্যর্থতা ধরা পড়ে। মা সহজেই নিজের স্বভাব-অনুযায়ী যতখানি আদর্শ হইতে পারিবেন, নারী-শিশুর পক্ষে ততখানি নারীধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হইবে।

৫১। নারী-শিশু মায়ের সহিত একাত্ম হইয়া নিজের এবং অপরের অগোচরে যেটুকু নারী-বিশেষত্ব লাভ করে তাহাতে তাহার ভাবী নারী-জীবনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। আরো এক ধাপ বাকী থাকে। এই বাকী ধাপটুকু সে তাহার পিতৃ-পরিবেশের যোগে সম্পন্ন করে। শিশুকে যদি ভাবী জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবেই কোন পুরুষের যোগে অন্তরের অন্তরে তাহার তদুপযোগী প্রস্তুতি হওয়া চাই। পিতাই শিশুমনে নিকটতম পুরুষ-পরিবেশ। যেখানে শিশু পিতার নৈকট্য তেমন লাভ করিতে পারে না সেখানেও তাহার নিকটতম পুরুষ-পরিবেশ পিতা। কারণ, তাহার মা ( এবং অপর সকলে ) জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, তাহার মনের সম্মুখে পিতাকেই দাঁড় করাইয়া দেন। নারী-শিশু মায়ের সহিত একাত্মতার পর পিতৃমুখী হয় এবং সেই সময়ে তাহার নারী-প্রকৃতির সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই কারণে বলা হয় যে, মাতৃ যোগে নারী-শিশু নারী-প্রকৃতির প্রথম অংশ গঠন করে, তাহার সম্পূর্ণতা হয় পিতৃ-যোগে।

৫২। অপর দিকে পুরুষ-শিশু পিতৃ-পরিবেশে একাত্মতার দ্বারা পুরুষপনা লাভ করে। ইহাতে তাহার পুরুষ-প্রকৃতির সম্পূর্ণতা আসে না। পূর্ণতা পাইবার জন্য নিকটতম নারী-পরিবেশ প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহার মাকে

প্রয়োজন। অতএব মাতৃ-পরিবেশেই পুরুষ-শিশুর আপন প্রকৃতির শেষ পর্বটুকু সমাধা হয়।

৫৩। শিশু যখন মাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে থাকে অথবা মাতৃ-যোগে আপন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করিতে থাকে, তখন মায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ মধুর হওয়া প্রয়োজন। মা ও শিশুর মধ্যে আনন্দ-সম্বন্ধটি ঠিকমত স্থাপিত হইলে, শিশুর ধারণায় 'মা ভালো' হইলে, মায়ের সহিত তাহার একাত্মতা বা মায়ের পরিবেশে পুরুষ-প্রকৃতির ভূমিকা-রচনা সহজ ও সার্থক হইবে। মাকে যদি শিশুর ভালো না লাগে, তাহার মনোবিকাশে মাতৃবৈরিতাই যদি মুখ্য হয়, নিয়ামক হয়, তাহা হইলে মাতৃ-যোগ অনেকাংশে ব্যর্থ হইবে। বৈরিতা থাকিলে পরিবেশের সহিত যোগ ছিন্ন হয় না। মাতৃবৈরিতা থাকিলে মাতৃ-পরিবেশের যোগ নষ্ট হয় না বলিয়াই বৈর থাকা সত্ত্বেও শিশু মাতৃ-প্রকৃতির নিতান্ত মৌলিক গুণগুলি নিজ স্বভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু মায়ের অন্যান্য দিক তাহার চরিত্রে বড়-একটা গৃহীত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর পরিবেশে অপর কোনো নারী থাকিলে মায়ের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব অধিক হইতে পারে।

৫৪। শিশুর পরিবেশে বহু প্রভাব কাজ করিতেছে, শিশু তাহাদের যোগে আপন জন্মগত সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য-অনুসারে আত্মগঠন করিতে থাকে। ইহারই মধ্যে তাহার মাতৃ-পরিবেশ একটি অতি-প্রধান, সময়ে সময়ে প্রায় একমাত্র, প্রভাব-স্বরূপ হইয়া থাকে। তথাপি মাতৃ-পরিবেশের মূল প্রভাব অন্যান্য প্রভাবের দ্বারা পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হইবার কথা। মাতৃ-পরিবেশ (বা যে-কোনো ব্যক্তি-পরিবেশ) সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করিতে গেলে এই কথাটুকু স্মরণ করা কর্তব্য।

## মায়ের ধৈর্য :

৫৫। শিশুর ন্যায় 'ডিক্টেটর' বোধ হয় আর নাই। পৃথিবীর সকল ডিক্টেটরই যাহাই হউক একটা তত্ত্ব খাড়া করিয়া, একটা বিশ্বাস গঠন করিয়া, কাজ (বা কুকাজ) করিয়া যায়। শিশুর আবার তত্ত্বের, বিশ্বাসের কোনো বালাই নাই। সে নিতান্ত তাহার খুশিমত চলিতে চায়; বাধা দিলে আর রক্ষা নাই, মাতা-পিতাকে চরম দণ্ড দিয়া বসে—কাজলটানা দুই চক্ষু দিয়া জল বহাইয়া দেয়। গৃহে এইরূপ কড়া ডিক্টেটর থাকিলে সকলকেই ভয়ে ভয়ে

থাকিতে হয়, বিশেষ করিয়া মাকে। তাঁহার উপর শিশুর 'অত্যাচারের' সীমা থাকে না। তাঁহার উপর সংসার অসীম ধৈর্যের ও ক্ষমার দাবি রাখে। শিশু তাহার মায়ের অনন্ত ধৈর্যের ভূমিকায় বড় হইতে পারিলে বহু দিকের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে; মায়ের ধৈর্য না থাকিলে শিশু পদে পদে তাহার আচরণে বাধা পায়। শৈশবে পদে পদে বাধা পাইলে তাহার যে কেবল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে তাহা নহে। অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা তো ঘটেই, তদুপরি শিশুর আত্মবিশ্বাস দুর্বল হইয়া পড়ে, সে অপরিজ্ঞাত কোনো বিষয়ে সাহস পায় না। শিশুর 'অত্যাচার' তাহার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্বাধীনতা মাত্র এবং আত্মবিশ্বাসের উপায়। শিশুর যে-কোনো একটি আচরণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে তাহার অত্যাচারের মধ্যে অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মনে করা যাক, শিশু তাহার মায়ের কাছে রহিয়া একটি দরোজা একবার বন্ধ করিতেছে একবার খুলিতেছে, আবার বন্ধ করিতেছে আবার খুলিতেছে এবং প্রচুর আওয়াজের সৃষ্টি করিতেছে। ইহাতে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিবার কথা, কারণ শিশুর এইরূপ আচরণ বয়স্কদের কাছে নিরর্থক অভব্যতা; বয়স্কদের নিকট এই আচরণ নিরর্থক হইলেও, শিশুর লাভ কম নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শিশু দরোজা বন্ধ করা, দরোজা খোলার দ্বারা এক প্রকার ছন্দের সৃষ্টি করিতেছে। সে যে শব্দ উৎপাদন করিতেছে তাহার মধ্যে একটি নিয়ম, একটি সরল তাল রহিয়াছে। শিশু সেই ছন্দ-সৃষ্টির এবং সেই শব্দের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতেছে। হয়তো শিশু ইহা অবলম্বন করিয়া তাহার গবেষণা, তাহার পরীক্ষা-কার্য সম্পন্ন করিতেছে। সে মনে করিতে পারে তাহার এই দরোজা খোলা ও বন্ধ করার ন্যায় পরমাদ্ভুত কার্যের জন্য মা বিস্মিত হইবেন, খুশী হইবেন। অথবা ইহার বিপরীত ধারণাও শিশু-চিত্তে থাকিতে পারে। সে হয়তো জানিয়াছে যে, দরোজার শব্দে মায়ের ( বা অপর কাহারও ) বিরক্তি ঘটে; সে ইচ্ছা করিয়াই বিরক্তি-উৎপাদনের অস্পষ্ট উদ্দেশ্যেই পুনঃপুনঃ দরোজার শব্দ করিতে পারে; তাহার উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে মাকে ( বা অপরকে ) পীড়া দেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মাতৃবৈরিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুকে এই-সকল পন্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারের মধ্য দিয়া গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বৈরভাব মোচন করিতে সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহা ব্যতীত এমনও হইতে পারে যে, কতখানি স্বাধীন ও মাতৃ-নিরপেক্ষ হইয়াছে, শিশু তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া লইতে চাহে।

আবার এই পরীক্ষাটুকুর অন্তরালে শিশু হয়তো যাচাই করিয়া লয় তাহার মায়ের স্নেহ কতখানি, তাহার মাতৃ-ভরসা কতখানি। শিশুর আরো অভিজ্ঞতার সুযোগ ঐ তুচ্ছ নিরর্থক দরোজা খোলা ও দেওয়ার মধ্যে মিলিতে পারে। বয়স্কদের পরীক্ষা করা, যাচাই করা অন্যভাবে সম্পন্ন হয়; বয়স্কদের সিদ্ধান্তের সহিত শিশুর সিদ্ধান্ত না মিলিতে পারে; শিশু তাহার মনের সম্মুখে যাহা পায় তাহা লইয়াই কাজ চালাইতে থাকে। তাই বলিয়া তাহার আচরণকে অনর্থক বা অর্থহীন বলা যায় না।

৫৬। তত্ত্ব জানা থাকিলেই যে সব সহিয়া লওয়া যায় তাহা নহে। মায়ের যদি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকে যে, শিশুর সকল প্রকার খেয়াল-খুশির পশ্চাতে শিশুর অভিজ্ঞতা গঠিত হইতেছে এবং তাহাতে বাধা দিলে শিশুর আত্ম-গঠনে বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে খুঁটিনাটি না বুঝিয়াও তাঁহার পক্ষে শিশুর অত্যাচার সহ্য করা একটু সহজ হইয়া আসে। তথাপি শিশুর খেয়াল-খুশির আচরণে মায়ের ধৈর্যের উপর যে চাপ পড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মা স্বভাবতঃই ধৈর্যশীলা, ইহা প্রকৃতির ব্যবস্থা। ধৈর্যের দিকে অভাব ঘটিবার কথা নাই। কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মায়ের অকৃপণ হৃদয়ও কেমন যেন কৃপণ হইয়া পড়ে, তাঁহারও পুনঃপুনঃ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ধৈর্যচ্যুতির কতকগুলি গূঢ় কারণও আছে।

৫৭। মায়ের ধৈর্যচ্যুতির প্রথম কারণ তাঁহার দেহ ক্লান্তি। রোগে, অস্বাস্থ্যে, অসংযত দেহ-বিলাসে, পুনঃপুনঃ গর্ভধারণে, অপরিমিত শ্রমে, অনিয়মে, পুষ্টির অভাবে, মায়েদের যে ধরনের দৈহিক শ্রম করা অনুচিত সেইরূপ শ্রম করায়, মায়ের দেহে ক্লান্তি আসে। দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও দেহের বিশ্রাম নাই, এক প্রকার চলনসই অবস্থায় তাঁহার দেহকে রাখিতেই হইবে। ইহার জন্য শক্তির প্রয়োজন। বাহির হইতে কোনো শক্তি আসিয়া তাঁহাকে সবল করিতে পারে না, তাঁহার নিজের শক্তির উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইবে। এই কারণে তিনি বাহির হইতে নিজের মনকে গুটাইয়া আনেন, বাহিরে শক্তি-প্রয়োগ কমাইয়া দেন এবং যথাসম্ভব সেই গুটাইয়া-আনা শক্তিকে নিজের মধ্যেই ব্যবহার করেন। ইহাতে আপন শিশু-সন্তানের প্রতিও একটু উদাসীনতার ভাব সৃষ্ট হয়, শিশুর আচরণে তাঁহার আনন্দটুকু তেমন বাহিরে ফুটিয়া ওঠে না; তখন শিশুর যে-কোনো আচরণে তাঁহার আত্মমুখী মন আহত হয়, তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

৫৮। মানসিক ক্লান্তি দ্বিতীয় কারণ। ইহার মধ্যে অর্থের অভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার পীড়া সর্বপ্রধান। অর্থাভাবের তীব্রতা অনেকটা মনের কামনার উপর নির্ভর করে। মায়ের বিলাসের অভ্যাস থাকিলে, বিলাস-বাসনা থাকিলে, সামান্য অর্থাভাবেও অধিক পীড়া বোধ হয়। বিলাসের কামনা না থাকিলেও অর্থাভাব মনকে ক্লান্ত করিয়া ফেলে—সংসারের ন্যূনতম প্রয়োজনও পাওয়া যাইতেছে না, এই বাস্তব অভিযোগ মায়ের মনকে ক্রমশ পঙ্গু করিয়া ফেলে। অর্থাভাবের সহিত সংসারের অন্যান্য অভাবে তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া আসে—স্বামীর প্রেমের ও প্রেমাচরণের অভাব, গৃহে প্রিয়জনের প্রীতির অভাব, স্বাধীনতার অভাব, এগুলির ক্ষয়শক্তি কম নহে। তাহার উপর থাকে মানের কান্না, অহঙ্কার-অভিমানের সঙ্ঘর্ষ, হিংসা প্রভৃতি। মনের ক্লান্তি ঘটিবার শত শত কারণ সংসারে বর্তমান। যে মায়ের মন অবস্থা-অনুসারে নিজেকে সানন্দে মানাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত তাঁহার মানসিক অবসাদ ঘটিবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। কিন্তু সানন্দে সকল অবস্থাকে গ্রহণ করার সাধনা অত্যন্ত কঠিন, মায়েদের নিকট এই অত্যুচ্চ সাধনার আশা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গত নহে। মায়ের মন ক্লান্ত থাকিলে শিশুর আচরণে ধৈর্য হারাইবার সম্ভাবনাই থাকে।

৫৯। দেহের ক্লান্তিতে মনের ক্লান্তি এবং মনের ক্লান্তিতে দেহের ক্লান্তি যে ঘটে তাহা সর্বজনবিদিত, সে বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতএব যে-কোনো দিক মায়ের ক্লান্তি আরম্ভ হইলে তাঁহার সমগ্র জীবনে, অন্তত সাময়িক ভাবেও, এক অবসাদ আসিতে থাকে। শিশু প্রায়শঃই এই নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দস্থল হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তাহার খেয়ালখুশির আচরণ মায়ের ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়।

৬০। সাধারণ গৃহে শিশুর মা প্রায়ই শিশুকে একটু-আধটু ভর্ৎসনা করেন। এমন-কি টুকটাক প্রহারও যে না করেন তাহা নহে। শিশু 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া যাইতেছে, মা তাহার কোনোরূপ উত্তর প্রদান করেন না এবং যখন হঠাৎ উত্তর দিলেন তখনও এমনি কর্কশভাবে কথা বলিলেন যে, শিশু থতমত খাইয়া গেল। বহু গৃহে শিশুর প্রতি মায়ের আচরণ এইরূপ হয়। এই প্রকার আচরণ দেখিলে মনে করা স্বাভাবিক যে, মায়ের দেহ-মন ক্লান্ত আছে এবং সেই কারণে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছে। আমাদের সাধারণ গৃহে সাধারণ মায়েরা ক্লান্ত থাকেন, এ কথা সত্য। তথাপি ক্লান্তির কারণে শিশুর প্রতি

আচরণ যতটা ধৈর্যহীন হয়, মা অজ্ঞতার জন্য এবং অভ্যাসবশে তদপেক্ষা বেশী বিরক্তি বা উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। সাধারণ মায়ের দৈনন্দিন শিশু-পালন দেখিলে কখনো কখনো সন্দেহ হয় যে, মায়ের আনন্দ-ধারা বুঝি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আসলে তাহা নহে। মায়ের আনন্দ-ধারা তেমন ক্ষীণ হইয়া আসে নাই, তাঁহার মন সত্যসত্যই শিশুর প্রতি বিরক্ত বা উদাসীন থাকে না। অথচ, শুধু শুধু অভ্যাসের দোষে এবং অজ্ঞতার কারণে এইরূপ ধৈর্যচ্যুতি দেখাইয়া থাকেন। এখানে অজ্ঞতা লেখাপড়ার অজ্ঞতা নহে। শিশু পালনে মায়ের মনের স্নেহকে অসংখ্য ধারায় বাহিরে প্রকাশ করিতে হয়, এই সত্যটি না জানার ও উপলব্ধি না করার কথাই বলা হইতেছে।

৬১। মায়ের অন্তরের অন্তরে কোনো গূঢ় কারণ থাকিতে পারে, যেজন্য মায়ের ধৈর্যচ্যুতি শিশু-পালনের দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া ওঠে। মনে হয় আমাদের অনেক গৃহেই মায়েদের অন্তরে এই গূঢ় কারণটি বর্তমান। মা অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ঐ প্রভাবটির অস্তিত্ব জানেন না। তাঁহার অন্তরের গূঢ় কোনো প্রভাবের বশে তাঁহার ধৈর্য নষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে এ কথা বলিয়া বোঝানো যায় না, বিশ্বাস করানো যায় না। অথচ তিনি আপন মনের গোপন কোনো কারণেই শিশুর প্রতি ঘন ঘন বিরক্তি প্রকাশ করেন।

৬২। অন্তরের গূঢ় কারণের মধ্যে দুইটির উল্লেখ আবশ্যক। মা এখন মা হইয়াছেন, এককালে তিনি নিজেই শিশু ছিলেন। তাঁহারও স্তনপর্ব ছিল, মাতৃপর্ব ছিল। তাঁহাকেও মাতৃযোগে নিজ-প্রকৃতির প্রথম অংশ গঠন করিতে হইয়াছে। তাঁহার শৈশবে হয়তো তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল, হয়তো সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মাতৃবৈর এখন পর্যন্ত তাঁহার মনের তলে কাজ করিতেছে। এখন তিনি মা, ধৈর্যশীলা নারী, সংসারনিপুণা গৃহিণী। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি অনেকটা পরিণত হইয়াছে। মা যে কী তাহা এখন হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। তথাপি, এমন হইতে পারে যে, সকল শিক্ষা বিশ্বাস বিচারের অন্তঃস্তলে শৈশবের সেই মাতৃবৈর এখনো জাগিয়া আছে এবং শিশুর প্রতি তাঁহার আচরণে দস্তরমত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাঁহার অন্তরের তলদেশে এই বৈরিতার পীড়া থাকায় শিশুর প্রতি তাঁহার বিচার একটু বিকৃত হইয়া যায়। শিশুর এতটুকু খেয়ালখুশির আচরণে তাঁহার মনে হয় অবাধ্যতার মধ্যে বৈরিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। মায়ের মনে রহিয়াছে আপন বৈরিতার ক্ষত, সন্তানের মধ্যে মাতৃবৈরিতার কোনো

ইঙ্গিত তিনি সহিবেন কিরূপে? সেইজন্য তিনি শিশুর তুচ্ছ খেয়ালে বা অবাধ্যতায় ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন।

৬২। অন্তরের দ্বিতীয় গূঢ় কারণ, মায়ের দিক হইতে আপন সন্তানকে মাতৃ-আদরে মাতৃ-দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে না পারা। অনেক সময় বিবাহিতা নারী মা হইবার মতো চিত্ত-প্রস্তুতির পূর্বেই মা হইয়া থাকেন। অন্তরে বিলাস-বাসনা উগ্র, দেহ-কামনা অতৃপ্ত; স্বামীর প্রতি তাঁহার প্রেম এবং তাঁহার প্রতি স্বামীর প্রেমাচরণ উভয়ই শিথিল। এরূপ অবস্থায় মানসিক স্থৈর্য বা প্রসন্নতা থাকিতে পারে না, আর মাতৃধর্ম পালন করাও কঠিন হয়। মা হইয়াছেন অথচ সন্তান তেমন যেন আনন্দ দিতে পারে না; মা কেবল কর্তব্য-বশে জ্ঞানানুসারে শিশু-পালন করিয়া যান, যেন অপরের বোঝা তিনি বহিয়া মরিতেছেন। অনেকে সংস্কার-বশে সন্তানকে গ্রহণ করেন; সেখানেও আনন্দের প্রেরণা কম। মায়ের চিত্তের এই প্রকার দৈন্য নিতান্ত বিরল নহে। এই সকল চিত্ত-দৈন্যের ক্ষেত্রে মা আপন সন্তানকে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া শিশুর সামান্যতম খেয়াল তাঁহার মনে বিরক্তি উৎপাদন করে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন। মায়ের চিত্ত-প্রস্তুতির অভাব সম্বন্ধে মা যে সকল সময় অবহিত থাকেন তাহা নহে। তাঁহার অগোচরে তাঁহার মনের মধ্যে যেন আর একটি মন রহিয়াছে, সে মনটি শিশুকে গ্রহণ করিতে চায় না। সেই গোপন মনেই কামনার অতৃপ্তি, স্বামীর প্রতি অপ্রেম প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া রহিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েরা নিজেদের গোপন মনের খবর পান না। কখনো কখনো মা একটু-আধটু নিজের মনকে যেন বুঝিতে পারেন। একেবারে সম্পূর্ণ জানিয়া-শুনিয়া শিশুকে অন্তর হইতে প্রত্যাখান করার মতো মানসিক উগ্রতা, বা তাহার হেতু, কোনো কোনো নারীর অবশ্য থাকিতে পারে, তবে তাহা অত্যন্ত বিরল।

## মায়ের অতি-সতর্কতা: অতি-স্নেহ

৬৩। এই প্রসঙ্গে মায়ের মনের আর-একটি গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লইলে ভালো হয়। ইহার ব্যবহারিক সুফল-কুফল যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোনো-কিছুই ভালো নহে, ইহা সুপ্রচলিত উপদেশ। মাতৃস্নেহের বেলাতেও এই উপদেশ খাটে। শিশুর প্রতি অত্যন্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ শুধু ব্যর্থ নহে, শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। মায়ের অতিরিক্ত স্নেহে (অর্থাৎ স্নেহের প্রকাশের মধ্যে)

লালিত হইতে থাকিলে শিশুর চিত্তে এক প্রকার আলস্য আসে। ইহার দ্বারা তাহার উদ্যম ও চঞ্চলতা বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিশুর অভিজ্ঞতা অনুভূতি আত্মবিকাশ প্রভৃতি অপ্রচুর ও সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ হইয়া পড়ে। মা তাহাকে পদে পদে সতর্ক করেন, পদে পদে সংযত করেন; যেখানে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই সেখানে বিপদ কল্পনা করেন; সামান্য অসুবিধাকে কল্পনায় মস্ত বড় করিয়া শিশুর বিপদ আশঙ্কা করেন। এইভাবে পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের দ্বারা শিশুকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বসেন। স্নেহকাতর মা কখনো কখনো আবার ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা এবং যদৃচ্ছা আচরণ করিবার সুযোগ দেন। তাঁহার মনে হয়, 'আহা', শিশু, যাহা চায় তাহাই দেওয়া যাক। বড় হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে; এখন নাহয় একটু বদভ্যাস হইতেছে, হইলেও কী আর করা যাইবে, শিশু বৈ তো নয়।' শিশু মায়ের দিক হইতে দুইটি বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া কিছু ঠিক করিতে পারে না। তাহার আত্মগঠনে সুনির্দিষ্ট কিছু ফুটিয়া ওঠে না। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে তাহার আত্মবিশ্বাসের অনুকূল অবস্থা আর থাকিবে না এবং তাহার চরিত্র মাতৃনির্ভর হইয়া পড়িবে। মাতৃ-যোগে শিশু কোথায় মাতৃ-নিরপেক্ষ, আত্মবিশ্বাসী, সুষম-চরিত্র, সদাব্যস্ত এবং বহুমুখী হইয়া উঠিবে, তাহা না হইয়া তদ্‌বিপরীত ত্রুটিগুলি, কম-বেশী, তাহার চরিত্রে দখল গাড়িয়া বাড়িতে থাকে।

৬৫। অতিরিক্ত স্নেহ-প্রকাশ সুস্থচিত্ত মায়ের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অতিরিক্ত স্নেহ-প্রকাশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের মনের গোপন কামনা স্নেহের বিপরীত হইয়া থাকে। হাস্যের অন্তরালে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র ইতিহাসে বিরল নহে। বর্তমান সভ্যতায় নমস্কার ও আপ্যায়নের আড়ালে হিংসার আত্মগোপন দৈনন্দিন ব্যাপার। সেইরূপ, মনের উপরের ধারাটি স্নেহের হইলেও গোপন ধারাটি স্নেহের নহে। সেখানে হয়তো রহিয়াছে শিশুকে গ্রহণ না করার কামনা অথবা এই শ্রেণীর কোনো গোপন ইচ্ছা। আপন শিশুকে গ্রহণ না করার ভাবে মায়ের সংস্কার ও সমাজ মাকে ধিক্কার দিয়া ওঠে। শিশুকে বর্জন করার বিষয় মায়ের মন ভাবিতেই পারে না। অথচ তাহারই গোপন কামনা রহিয়াছে। পাছে সেই কামনা কোনো প্রকারে মায়ের আচরণে প্রকাশ পায়, মা সেইদিকে অতি-সতর্ক থাকেন। তাঁহার এই অতি-সতর্কতা শিশুর প্রতি অস্বাভাবিক অতিরিক্ত স্নেহ-প্রকাশে দেখা

দেয়। মা মোটেই জানেন না যে, তাঁহার মনের প্রকৃত অবস্থা কী; তাঁহার অতি-সতর্কতা ঘটিতেছে, তাহাও তাঁহার অগোচরে। কিন্তু তিনি না জানিলেও তাঁহারই চিত্তের গোপন পীড়ায় শিশুর প্রতি অত্যন্ত অধিক স্নেহ-প্রকাশ ঘটিতেছে। যে মায়েরা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের অন্তর শিশুকে গ্রহণ করিতে চাহে না, অথচ সমাজের চাপে বা কর্তব্যের খাতিরে একটু অতিরিক্ত যত্ন করাই বরং শোভন হইতে পারে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা মনের নিতান্ত গোপন প্রভাবে অতিরিক্ত যত্ন করিতে থাকেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই টের পান না, অথচ শিশুর ক্ষতিসাধন করেন।

৬৬। আপন শৈশবের মাতৃবৈরিতা অন্তরের তলে প্রচ্ছন্ন থাকিলে মা তাঁহার শিশুকে কতকগুলি দিকে নিরুৎসাহ না করিয়া পারেন না। শৈশবে যাঁহার প্রতি বৈরভাব থাকে, তাঁহার পছন্দমত বা তাঁহার সুখকর কোনো কাজ করিতে আগ্রহ থাকার কথা নয়। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি তাঁহার সুখবিধান করিতে আমরা উদ্যত হই, তাঁহার পছন্দকে আমরা নিজের পছন্দ করিয়া লই। তাঁহার অপ্রীতি দূর করিতে চাই, তাঁহার অপছন্দকে আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় দিতে চাহি না। যে ব্যক্তির প্রতি বৈরভাব পোষণ করি তাহার সুখকর কার্য আমরা না করিতে পারিলে বাঁচিয়া যাই। তাঁহার অপছন্দকেই আমরা পছন্দ করি। তাঁহার চরিত্রে যে গুণ রহিয়াছে তাহা নিজ চরিত্রে গ্রহণ করিতে অপারগ হই। গুণকে ছোট করিয়া দেখি এবং অপর কেহ সেই গুণ অনুকরণ না করে তজ্জন্য আমাদের সাধ্যমত প্রভাব বিস্তার করি। ইহাই তো সাধারণ মনের পরিচয়। মা যখন শিশু ছিলেন তখন যদি তাঁহার চরিত্রে মাতৃবৈর বা অপর কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা কারণেই তিনি নিজের মায়ের অনুকরণ করিবার সকল উৎসাহ ত্যাগ করিবেন। নিজের মায়ের যদি কোনো বিশেষ গুণও থাকিয়া থাকে অনুরূপ গুণের অভাবে নিজের সন্তানকে তাহার সুযোগ দিতে পারিবেন না, আর দিতে ইচ্ছাও করিবেন না। শিশুর সামর্থ্য ও স্বকীয়তা অবজ্ঞা করিয়া মা যখন আপন রুচি ও মত-অনুসারে শিশুকে পরিচালিত করিতে থাকেন, তখন তাঁহার শৈশবের মাতৃ-সম্বন্ধই মনের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ন্ত্রিত করে। মা হইয়া যুক্তিবিচার দিয়াও নিজেকে তিনি ঠিক উচিত পথে চালাইতে পারেন না; একটু সুযোগ পাইলেই শৈশবার্জিত 'বৈরিতা' তাঁহার বিচারকে বিপথে টানিয়া আনে।

৬৭। যৌবনে যে ব্যক্তি প্রিয় তাঁহার ছায়া মায়ের শিশু-পালনে পড়িবে, ইহা তো সকলেই অনুমান করিতে পারেন। বিবাহের অথবা সন্তান-ধারণের পূর্বে সন্তানের পিতা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রিয়-স্পর্শ যদি জীবনে স্থায়িভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে, যৌবনের সেই স্পর্শই মায়ের শিশু-পালনে প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহাও সুপরিচিত সত্য।

৬৮। আদর্শ মা যিনি হইবেন শৈশব হইতেই সেই হওয়ার 'শিক্ষা' বা 'সাধনা' তাঁহার শুরু হয়। কারণ, কেবল শিশু-পালনের বিজ্ঞান জানিলে এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহার সুপ্রয়োগ করিলেই আদর্শ জননী হওয়া যায় না। মায়ের অন্তরের ঐশ্বর্যই আসল ঐশ্বর্য। ইহার অভাবে শিশুর বাহ্য অভ্যাস গঠন করা ব্যতীত অন্তরের বেশী-কিছু করা মায়ের পক্ষে সম্ভব হয় না। আদর্শ মায়ের অন্তরের ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয় নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া; আপন শৈশবেই আপন পরিণত জীবনের মূল বিষয়গুলির বীজ বপন হইয়া যায়। পরবর্তী জীবনে তাহাদেরই বৃদ্ধি বিকাশ ও পরিণতি ঘটিতে থাকে। এই মা এখন যাহা আছেন তাহার ভিত্তি রচিত হইয়াছিল তাঁহার শৈশবে এবং বিশেষভাবে তাঁহার মাতৃ-পরিবেশে। তখন যে ভিত-পত্তন হইয়াছিল আজ ইনি মা হইয়া তাহারই উপর মাতৃধর্ম-পালনের সাধনা করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রস্তুতি উপযুক্ত হইলে সেই সাধনা সার্থক হইবে। মায়ের সাধনা আবশ্যক। কারণ, শিশুর চরিত্রে তিনি যাহা দিবেন সেইগুলি শিশুর ভাবী জীবনের মূলধন হইয়া থাকিবে। আর, তাঁহার খুকুমণিকেও অনাগত কালের আদর্শ জননীরূপে বিকশিত করিতে হইলে এখন এই শৈশবেই তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

## শিশু-সুলভ ধারণা ও মায়ের ব্যক্তিত্ব

৬৯। বয়স্ক মন বিশ্লেষণ-পর। সে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ভালবাসে। অথচ, বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশ্লেষণ-শক্তি থাকে বলিয়াই তাঁহারা যে সকল ক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ করেন তাহা নহে। দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে, বয়স্ক মন কোথাও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতেছে, কোথাও সামান্য বিশ্লেষণ করিয়াই বাকিটুকু বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেছে। আবার, কোনো ক্ষেত্রে আদৌ ঐ পথে না গিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। কেহ যদি তখন

প্রশ্ন করে 'কেন ইহা বিচার করিয়া গ্রহণ করিলে' তখনই সে তাড়াতাড়ি এক প্রকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, ঠিক করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। রাম একজন পরোপকারী, কিন্তু কটুভাষী ব্যক্তি। শ্যাম তাঁহার নিকট উপকার পাইয়াছে। যদু কোনো উপকার পায় নাই, বরং রামের কটূক্তি শুনিয়াছে। শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে ( অর্থাৎ, ইহাই বলিবার পনেরো-আনা সম্ভাবনা ) রামের ন্যায় সৎলোক আর নাই। যদু বলিবে, রাম অত্যন্ত মন্দ। আর চতুর্থ ব্যক্তি মধু একটু ভক্ত লোক, রামের দেহে গৈরিক বসন দেখিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, রামের মতো ভালো আর ওখানে কেহ নাই। শ্যাম ও যদু ইচ্ছা করিলেই রামের স্বভাবের বিশ্লেষণ আরো পূর্ণভাবে করিতে পারিত। মধুকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও তৎক্ষণাৎ রামের পরোপকারের হিসাব দিবার জন্য একে ওকে জিজ্ঞাসা করিবে। অর্থাৎ ইহাদের সকলেরই বিশ্লেষণ করিবার শিক্ষা ও শক্তি আছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তাহার সম্যক ব্যবহার নাই।

১০। শিশুর ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া অতি-শিশুর ক্ষেত্রে, মন এই প্রকার বিশ্লেষণ করিতে অসমর্থ। শিশুকে ক্রমে ক্রমে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয়; সে আর পাঁচজনের বিশ্লেষণ করা দেখিয়া নিজেও এক-আধবার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। তাহার বয়সের সহিত এই ক্ষমতাটিও একটু একটু বাড়িতে থাকে। কিন্তু শৈশবে এইভাবে কোনো-কিছু বোঝা, অনুভব করা, স্বাভাবিক নহে। শৈশবের বোঝায় একটা সমগ্রিক ভাব আছে। শিশু যাহা বুঝিতে চাহে তাহা বিশ্লেষণের পথে নহে; সে একেবারে সমগ্রভাবে একটি ধারণা করিয়া লয় এবং এই ধারণাই তাহার বুঝিতে পারা। এ ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে। উপরিলিখিত পরোপকারী কটুভাষী রামকে দেখিয়া শিশুর কেমন লাগিবে বলা মুশকিল। যে-কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে রামের স্বভাবের নিখুঁত বর্ণনা ও তাহার ভালো-মন্দ সকল কার্যের একটি নির্ভুল তালিকা দিলে সে বলিবে যে, রামকে বুঝিয়াছে। তাহার বিশ্বাস এবং ইহা সকলেরই অল্পাধিক বিশ্বাস, এই পদ্ধতিতেই ঠিক বুঝিতে পারা যায়। ( কবি, শিল্পী, উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এইরূপ বুঝাকে 'চরম বা শ্রেষ্ঠ বুঝা' বলিয়া গ্রহণ করেন না। ) শিশুর নিকট রামের স্বভাবের যত নিখুঁত বিশ্লেষণই করা যাক-না কেন, রাম সম্বন্ধে তাহার ধারণা অন্যভাবে গঠিত হইবে। সে সব শুনিবে, কী যে বুঝিবে সেই জানে,

অবশেষে তাহার ধারণাটি নিতান্ত তাহারই মতো করিয়া সম্পন্ন হইবে। মোটামুটি রাম কিরূপ ইহাই সে বুঝিতে পারিবে, রামের একটি সামগ্রিক প্রতিরূপ তাহার অনুভূতিতে জাগিতে থাকিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো তোতাপাখীর ন্যায় রামের গুণাগুণের একটি যেমন-তেমন বর্ণনা দিবে, কিন্তু তাহার চিত্তের মধ্যে এই তালিকার স্থান নাই।

১১। শিশু যখন তাহার মাকে ধারণায় পায় তখন সে তাঁহাকে সমগ্র ভাবেই পায়। মাকে ভালো লাগিলে, দোষ-গুণ-সমন্বিত সমস্ত মাতৃ-সত্তাকেই সে ভালবাসে। গুণকে গুণ বলিয়া ভাবে না, দোষকে দোষ হিসাবে দেখে না। মাকে ভালবাসে, অতএব মায়ের গুণকেও ভালবাসে, দোষকেও ভালবাসে। দোষে-গুণে মিলিত মায়ের একটি একক অনুভূতি তাহার মনে জাগে। যাঁহাকে তাহার ভালো লাগে না তাঁহার সকল দিককেই সে প্রীতি হইতে বঞ্চিত করে। শিশুর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার জন্য তাহার ব্যক্তি-পরিবেশ যতদূর সাধ্য বিশোধিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, সে যাহার আদর্শ নিজ চিত্তে গ্রহণ করিবে, তাহার গুণ যেমন গ্রহণ করিবে, দোষও তেমনি অন্তরে আনিবে। মাতৃ-পরিবেশের দিকটি সেইজন্য অতি সুষম শোভন মধুর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১২। একটু ব্যাখ্যা, এমন-কি উপমা-প্রয়োগের প্রয়োজন। মায়ের সমগ্রতার ধারণাই যদি শিশু-চিত্তের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে সে তাহার মায়ের (বা অপরের) আচরণ দেখিয়া সে আচরণটি বা সেই আচরণগুলি নিজে অভ্যাস করে কেন? শিশুর দৃষ্টি বিশ্লেষণমূলক না হইলে মায়ের সামগ্রিক প্রকাশ হইতে বিশেষ বিশেষ আচরণের দ্বারা আকৃষ্ট হয় কিভাবে? শিশুর মাতা হয়তো স্নেহশীলা, কর্মনিষ্ঠা, গৃহকর্মনিপুণা, অথচ সঙ্গীত পছন্দ করেন না। তাহার সহিত শিশুর যোগ স্বাভাবিক হইতে পাইলে এবং গৃহে তেমন-কিছু বিপরীত প্রভাব না থাকিলে, শিশু সঙ্গীত-বিমুখ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা এবং গৃহকর্মে আকর্ষণ বোধ করিবার কথা। এক্ষেত্রে শিশু নিশ্চয়ই মায়ের আচরণকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে যে, মা সঙ্গীত-বিমুখ অথচ গৃহকর্মে নিপুণা।

১৩। শিশুর এই বিশ্লেষণটুকু অস্বীকার করিবার নহে। তবে ইহাও শিশুর একটু বয়স না হইলে সম্ভব নহে। শিশু বিকশিত ও পরিণত হইয়াই তো বয়স্ক ব্যক্তি হয়; সুতরাং শৈশব হইতে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ শিক্ষা করিতে

হইবে বৈকি, নতুবা বয়স্ক জীবনে অকস্মাৎ কোথা হইতে বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবণতা পাইবে? কিন্তু এই-সকল টুক্‌রা-টুক্‌রা আচরণের দ্বারা শিশুর জীবনের মূল গতি নিয়ন্ত্রিত হয় না। সঙ্গীতের যেখানে স্বাধীনতা আছে সেখানে গায়ক তাঁহার প্রেরণা ও শক্তি-অনুসারে সঙ্গীতকে বিচিত্র করেন; নানা প্রকার ছন্দে, বিভিন্ন কৌশলে সুরের খেলা চলিতে থাকে। তথাপি সঙ্গীতটির মৌলিক গতি ও প্রকৃতি স্থির থাকে, বহু প্রকার ছন্দ ও কৌশলের মধ্যে তাহার মূলগত ঐক্যটুকু অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। মূলপ্রকৃতির পরিবর্তন করিলে সমগ্র গীতিটিই অন্যরূপ হইয়া পড়ে, অথচ শতবিধ ছন্দ-কৌশলের প্রয়োগে গীতটির মূল প্রকৃতি অন্যরূপ হয় না। চিত্রের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি আর-একটি হইতে কতদিকে পৃথক্। তথাপি সকল পার্থক্যের অন্তরে, সকল চিত্রের মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে যাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেয় যে, সবগুলি অবনীন্দ্রনাথেরই চিত্র। তাঁহার সকল চিত্রের মধ্যে তাঁহার একটা বিশেষ ছাপ আছে। যে শিষ্য শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে এবং তাঁহার চিত্রকে ভালবাসিয়া শিক্ষা করিতেছে, চিত্রাঙ্কনে তাহার স্বাধীনতা থাকিলেও তাহার অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিবে। মাতার স্নেহ-নিবিড় যোগে শিশুর-জীবনে মূলগত প্রভাব একটা পড়ে। সেই প্রভাবই মৌলিক এবং স্থায়ী। ইহার উপর শিশু একটু-আধটু বিশ্লেষণ যদি করে, এখানে-সেখানে অনুকরণ যদি করে, তাহাতে মায়ের যোগে পাওয়া প্রধান জীবনধারার পরিবর্তন হয় না। ইহা ব্যতীত শিশু যখনই মাকে বা অপর কাহাকেও অনুসরণ করে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া করে, একথা ঠিক নহে। বরং শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে না জানিয়া, না বুঝিয়া অনুকরণ করে, সে টেরও পায় না যে, সে কাহাকেও অনুকরণ করিতেছে। এই অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করিয়া ফেলা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে না; কারণ বিশ্লেষণ কখনো না জানিয়া, টের না পাইয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার এ কথাও সত্য যে, মা প্রতিদিন যে ভাবের আচরণ করেন তাঁহার সেই-সকল টুক্‌রা-টুক্‌রা আচরণের মধ্যে তাঁহারই জীবন প্রকাশ পায়। শিশু যখন তাঁহার কোনো বিশেষ আচরণের দ্বারা আকৃষ্ট হয় বা কোনো আচরণের প্রতি উদাসীন থাকে, তখন সে আপনার অজ্ঞাতসারে মায়ের সমগ্র জীবনের সহিতই যুক্ত হয়। তাহার মনের দৃষ্টি সমগ্রকেই দেখে। অবশ্য তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত বিশ্লেষণের প্রভাবও সম্ভব।

১৪। এই স্থানে একবার স্মরণ করা বোধ হয় আবশ্যক যে, শিশুর জীবন মায়ের জীবনের যত নিকটস্থ হউক-না কেন, সে কোনোমতেই মায়ের অনুকৃতি হইবে না, কারণ তাহার নিজস্ব বিকাশ-গতি আছে, তাহার বৈশিষ্ট্য আছে। সে সমগ্রভাবে অপরকে দেখিলে বা নিজের মনে কাহাকেও সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে, অপরের ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে, তাহা নহে। তবে অনেক মৌলিক বিষয়ে অপরের সহিত তাহার চিত্তের ও চরিত্রের সাদৃশ্য আসিয়া যাইবে, ইহা ঠিক।

১৫। এই প্রসঙ্গে মায়ের ব্যক্তিত্বের কথা আসিয়া পড়ে। মায়ের সমগ্রতাকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বলিতে পারা যায়। এই সংজ্ঞার্থে ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে সে কথা অবশ্য জানা গেল না; জানাইবার উপায় এখনো নাই, কারণ, এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এই 'ব্যক্তিত্ব' কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করি। প্রায়ই ব্যবহার করি বলিয়া যে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ রক্ষা করি তাহা নহে। অবশ্য অনেক সময় এমন হয় যে, আমাদের ব্যবহৃত কোনো কোনো শব্দের অর্থ নির্ভুলভাবে এক কথায় বা অল্প কথায় প্রকাশ করিতে পারি; নির্ভুল অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করিয়া থাকি। 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটি সেই শ্রেণীর নহে। ইহার প্রয়োগের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রও আমাদের চলতি জীবনে থাকে না, ইহার অর্থও আমরা বহু কথার মধ্যে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করিতে পারি না। 'ব্যক্তিত্ব' শব্দের অর্থোপলব্ধি যেমন অস্পষ্ট, ইহার ব্যবহারও তেমনি নিরর্থক হয়। নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটি লাগাইয়া দিয়া আমরা তখনকার মতো কাজ সারিয়া লই। কোনো ব্যক্তি খুব গম্ভীর, পাঁচ ডাকে উত্তর দেন না, উত্তর যদি বা দেন তাহা হইলেও আলাপ করা চলে না—এরূপ ব্যক্তিকে কেহ কেহ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। 'তিনি রাশভারী লোক' এবং 'তাঁহার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট' যেন ঠিক এক কথা; যেন গাম্ভীর্য ও মিতভাষণ এবং ব্যক্তিত্ব একই বস্তু। আবার, কোনো কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ভয় দেখাইয়া, গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া, ছলে বলে কৌশলে অনেকের উপর আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন, ইহাই তাঁহার অভ্যাস—এই শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও 'বিরাট' ব্যক্তিত্বের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ছাত্ররা যে শিক্ষককে রীতিমত ভয় করে সেই শিক্ষকের 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে তাহাদের কোনো সন্দেহ থাকে না। পোশাক-পরিচ্ছদে কথাবার্তায় একটু বিশেষত্ব বজায় রাখিলেও নাকি

ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। সরলভাবে বাক্যালাপ, প্রাণখোলা হাসি, যে-কোনো কাজে হাত লাগাইবার অভ্যাস, এগুলি অনেকের কাছেই হালকা চরিত্রের পরিচয়, ব্যক্তিত্বহীনতার প্রমাণ। অর্থাৎ 'ব্যক্তিত্ব' শব্দের অর্থ দৈনন্দিন জীবনে সকলের কাছে সমান নহে এবং সকল সময়ে এক থাকে না। সাধারণ জীবনের কথা নাহয় মার্জনীয়, কিন্তু মনোবিদ্যায় যাঁহারা বিচক্ষণ তাঁহাদের মতও এক নয়, তাঁহাদের কাহারও ধারণা 'ব্যক্তিত্ব' সকল দোষ-গুণের সমষ্টি; এই সমষ্টির ভিতর ব্যক্তির সকল প্রকার দোষ-গুণ সুসংহত হইয়া আছে—দেহ-বৈশিষ্ট্য হইতে আরম্ভ করিয়া মনের বিভিন্ন প্রকাশ, যথা, বুদ্ধি, অনুভূতি, ইচ্ছা, কামনা, ধারণা আবেগ, আদর্শভাবনা, প্রেরণা, অভ্যাস, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, ধর্মচেতনা প্রভৃতি সব-কিছু ইহার অন্তর্গত। সকল দিকের সকল-কিছু মিলাইয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। কেহ কেহ বা ব্যক্তিত্বের এতখানি ব্যাপক ও সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন; ইঁহাদের মতে ব্যক্তিত্বের একটি বড় কথা সামঞ্জস্য বিধান। যে চরিত্রে বহু প্রকার প্রকাশের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের ভাব নাই সেই চরিত্র ঠিক সুসংহত নহে এবং তাহার ফলে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব দুর্বল হইয়া থাকে। চরিত্রে সুসংহত অঙ্গীকৃত (integrated) সামগ্রিক ভাবটি বেশ স্পষ্ট ও সবল হইলে ব্যক্তিত্বও সবল বলিতে হইবে। পূর্বে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোনো অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্বকে বুঝাইত, যেন ইহা যে-কোনো প্রকার বিশ্লেষণের বাহিরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহাই নাকি ব্যক্তির আসল শক্তি-প্রভাবের কেন্দ্র, ধরা-ছোঁওয়া তো যায়ই না, এমন-কি ইহা এমনই একটি 'একক' ব্যাপার যে, ইহার কোনো উপাদানকে অনুমানের মধ্যেও আনা যায় না। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বের এই বিশ্লেষণাতীত অদ্ভুত ধারণা এখন আর কেহ গ্রহণ করিতে চাহেন না। ফলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার্থ দেওয়া এখনো সম্ভব নহে। তবে ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু বিশ্লেষণ করা চলে এবং মোটামুটি সেগুলির পরিমাপও অসম্ভব নহে—এ ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ লইয়াও নানারূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, একাধিক পদ্ধতি লইয়া এখনো পরীক্ষা চলিতেছে। অতি বিচক্ষণ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যখন ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব ও পরিমাপ লইয়া এরূপ মতভেদ রহিয়াছে, তখন সাধারণ আলোচনায় ইহার বিশদ্ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক এবং ভ্রান্তিজনক হইতে পারে।

সেদিকে না যাওয়াই ভালো। মায়ের কোনো-কিছু বাদ না দিয়া, দোষ-

গুণ সব লইয়া তাঁহার সমগ্রতার বা ব্যক্তিত্বের ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি জানিয়া বুঝিয়া অনেক প্রকার আচরণ করেন, তিনি না-বুঝিয়াও অনেক আচরণ করেন। তাঁহার কিছু অংশ প্রকাশ পায়, অনেক অংশ সাধারণ সোজা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—মায়ের চোখেও না, অপরের চোখেও না—মনোবিশ্লেষণের কথা স্বতন্ত্র। উদাহরণ-স্বরূপ, অনেক মায়ের স্তন্যদানে বিরক্তির বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। অনেক মা শিশুকে স্তন্যদান করিতে আনন্দ পাওয়া তো দূরের কথা, অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেন। দুধের বোতলের ব্যবস্থা, অধিকাংশ সময় 'আয়া' বা 'দাসী'র নিকট শিশুকে রাখিয়া দেওয়ার অভ্যাস, অথবা শিশুকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে বিদ্যালয়ে প্রেরণের অহেতুক আগ্রহ, অনেক মায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হয়তো 'ফ্যাশন', হয়তো অপরের অযৌক্তিক অনুকরণ। তথাপি ইহার অন্তরালে শিশুকে মাতৃ-আদরে গ্রহণ না করার কামনা উঁকি দিতেছে—মা জানেন না, অপরেও জানে না। মা ইহা না জানিলেও ইহা তাঁহার সমগ্র সত্তার অন্তর্গত। মায়ের ব্যক্তিত্বে বা সমগ্রতায় ইহা বাদ পড়ে না।

৭৬। আমরা সাধারণতঃ বলি যে, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকের প্রভাব খুব বেশী। মায়ের প্রভাব শিশুর জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট হইলে মায়ের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট আছে বলা হয়। কোনো মায়ের সমগ্রতা স্পষ্ট পরিস্ফুট, কোনো মায়ের সমগ্রতার প্রকাশ দুর্বল। যেখানে মা অতি-স্পষ্ট, তাঁহার সমগ্রতা যেখানে সবল, শিশুর যোগ সেখানে ঘনিষ্ঠ। কারণ, পরিবেশের সবলতা চঞ্চলতা বেগ শিশুমনে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। মায়ের সমগ্র রূপটি শিশুর নিকট যদি অস্পষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার প্রভাবও তেমন স্পষ্ট হইতে পায় না। এই স্থানে একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মায়ের সমগ্রতা বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি প্রকাশ-শক্তি রহিয়াছে। মা বলিতে বা তাঁহার সমগ্রতা বলিতে প্রকাশহীন কোনো ব্যক্তি বা দোষ-গুণের সমষ্টি বোঝায় না। সমগ্রতা বা ব্যক্তিত্বের অর্থ সমগ্র ব্যক্তিটির আত্মপ্রকাশ।

৭৭। প্রকাশের সার্থকতা ব্যক্তির চঞ্চলতার উপর নির্ভর করে না। খুব ছট্‌ফট্‌ করিলেই শক্তির প্রমাণ দেওয়া হয় না; নানাপ্রকার মুখব্যাদন করিলেই যে সঙ্গীত ভালো হয়, তাহা নহে। স্থিরধীরভাবে সঙ্গীতের প্রাণ জাগানো খুবই সম্ভব। অতএব মায়ের সমগ্রতা স্পষ্ট করিয়া তুলিতে মা'কে

যে চঞ্চল সদাব্যস্ত হইতে হইবেই, তাহার কোনো নিয়ম নাই। মায়ের প্রকাশ-বেগ তাঁহার ধৈর্যের মধ্যে সহজেই ধরা পড়িতে পারে। সুশিল্পীর অঙ্কিত ঝড়ের ছবি দেখিলেই ঝড়ের বেগ অনুভব করা যায়। চিত্রটিতে ঝড়ের বেগ প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া চিত্রটি ছুটিতেছে, তাহা নহে; বা চিত্রের গাছপালা সব ভীষণভাবে আন্দোলিত হইতেছে, তাহাও নহে। চিত্রটি এবং চিত্রের সব-কিছু স্থিরই আছে, অথচ তাহাতে বেগ রহিয়াছে। সেইরূপ, মায়ের সমগ্র প্রকাশের স্পষ্টতার জন্য মাকে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। তাঁহার স্থির অচঞ্চল চরিত্রের বিরাট প্রভাব সার্থক হওয়ার পক্ষে কোনো বাধা নাই।

## মাতৃ-প্রতিভূ

৭৮। আর-একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিলে মাতৃ-পরিবেশের আলোচনা এক প্রকার শেষ হয়। মাতৃ-পরিবেশ শিশুর আত্ম-গঠনের জন্য অপরিহার্য বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, মা না থাকিলে শিশু আপন পুরুষ বা নারী-প্রকৃতির বিকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং কোনো দিকেই তাহার মনুষ্যোচিত গঠন সম্পন্ন হয় না। এই সত্য মানিতে হইলে প্রশ্ন জাগে, যে-শিশুর মা সন্তান-প্রসবের পরই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান তাহার দশা কী হইবে! সে কি মানব-প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত একটি প্রাণস্তূপ হইয়া থাকিবে? না। প্রকৃতি অত সহজে পরাজয় স্বীকার করে না, সে তাহারও এক ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। মা না থাকিলে শিশুর নিকট যে-কোনো নারী বর্তমান থাকিলেই চলিবে, যে-কোনো নারীর স্পর্শ ও স্নেহ পাইলেই হইবে। তিনিই তাহার মা হইবেন, তাঁহার স্নেহ-স্পর্শই শিশু-চিত্তে মাতৃ-স্পর্শের ন্যায় কাজ করিবে। ঘটনাচক্র যদি এমন হয় যে, একটিও নারী নাই, শিশুর পরিবেশে কেবলই যদি পুরুষ থাকে, তাহা হইলে তাহার দেহ ব্যতীত অপরদিকের পরিণতি-লাভ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না।

### আলোচনা-সূত্র

১। মা ও শিশু—এই সম্বন্ধটি চির-পুরাতন। আলোচনা করুন।

২। প্রকৃতির অনেক কাজই গূঢ়। মা ও শিশুর মধ্যে যে আনন্দ-যোগ রহিয়াছে তাহাতেও প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ইহা সমর্থন করুন।

৩। শিশুর প্রতি কর্তব্য আছে মনে করিয়া শিশু-পালন করিতে গেলে ফল আশানুরূপ হয় কি? আলোচনা করুন।

৪। কর্তব্য-বোধ অপেক্ষা আনন্দ-বোধ মূল্যবান কেন?

৫। শিশুর আত্মগঠনে মায়ের সহিত আনন্দ-যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক কেন?

৬। যে শিশু তাহার অতি শৈশবে মাতৃস্তন হইতে বঞ্চিত হয় সে অতি দুর্ভাগা। ইহা কি কেবল ভাবের কথা, না, ইহার পশ্চাতে বাস্তবতা আছে? আলোচনা করুন।

৭। মাতৃস্তন্যপান শিশুকে পরিতৃপ্ত করে। স্তন্যপান-বয়সে ইহা অপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক কিছু আর নাই। এইরূপ বিশ্বাস সমর্থনযোগ্য কেন?

৮। শিশুকে দোল দেওয়া, সুর যোগ করিয়া ছড়া বলা, শিশুর পিঠ চাপড়ানো প্রভৃতি অতি পুরাতন 'ছেলে-ভুলানো' পদ্ধতির সার্থকতা কি?

৯। শিশুচিত্তে 'ভালো' এবং 'ভালোবাসা'র প্রথম উন্মেষ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১০। 'মন্দ' ও বৈরভাব—উভয়ের প্রথম আভাস শিশু কেমন করিয়া পাইতে পারে?

১১। 'মাতৃস্তনপর্ব' বলিয়া কি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে?

১২। শিশু মাতৃস্তনের প্রাধান্য অতিক্রম করিয়া কিভাবে মাতৃ-প্রাধান্যে উপনীত হয় তাহা আলোচনা করুন।

১৩। 'ব্যক্তি'-ধারণার গোড়াপত্তন কিভাবে হওয়ার সম্ভাবনা?

১৪। 'মাতৃপর্ব' কথাটির বিশেষ তাৎপর্য কি?

১৫। 'মাতৃপর্ব' ও 'স্তনপর্ব' এই দুইটি কথার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

১৬। 'বীরপুরুষ' কবিতা হইতে বালকটির অতি-শৈশব সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায়?

অপর কোনো কবিতায় শিশুর এই গূঢ় মনোভাব লক্ষ্য করা যায় কিনা ভাবিয়া দেখুন।

১৭। ভালো-মন্দের প্রাথমিক ধারণা হইতে শৈশবের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইতে পারে। আলোচনা করুন।

১৮। মোটামুটি একই আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশে বড় হইয়াছেন এমন

দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের চোখে প্রায় সব-কিছুই ভাল লাগে, আর-এক জনের সহজে কোনো-কিছু পছন্দ হয় না। এরূপ হওয়ার কি কারণ অনুমান করা যায়?

১৯। শৈশবের অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু-মন নানারূপ কৌশল আবিষ্কার করে। আলোচনা করুন।

শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বা কৌশলের কথা কিছু বলিতে পারে কি? কেন?

২০। শিশুর 'অকারণ' ভয়েরও কারণ আছে। আলোচনা করুন।

২১। শিশুর অকারণ ভয় দেখিলে অভিভাবক চিন্তিত হইয়া পড়েন। চিন্তার বিশেষ কারণ আছে কি? অকারণ ভয় অতিক্রম করিতে মাতাপিতা কিভাবে শিশুকে সাহায্য করিতে পারেন?

২২। মায়ের অন্তরে শিশুর প্রতি গভীর স্নেহ থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে তাহার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কেন, আলোচনা করুন।

২৩। আদরেও সংযম প্রয়োজন। আলোচনা করুন।

২৪। মায়ের স্নেহ-প্রকাশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

২৫। শিশুর নারী বা পুরুষ-রূপে বিকাশে মায়ের স্থান কি?

২৬। শিশু-পালনে মায়ের ধৈর্য অত্যন্ত আবশ্যক কেন?

২৭। মায়ের ধৈর্যচ্যুতির প্রধান কারণগুলি আলোচনা করুন।

২৮। মায়ের অতীত শৈশব-জীবন কিরূপ ছিল তাহাতেই তাঁহার বর্তমান জননী-জীবনের সার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে। কেন?

২৯। অতিরিক্ত স্নেহ-প্রকাশ স্বাভাবিকও নহে, মঙ্গলজনকও নহে। কেন?

৩০। শিশুর ধারণা-গ্রহণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩১। মায়ের ব্যক্তিত্ব বলিলে সাধারণভাবে কি বুঝা উচিত?

৩২। শিশুর বিকাশে মাতৃ-পরিবেশ কি অপরিহার্য? আলোচনা করুন

# পিতৃ-পরিবেশ

## পরিবেশের সাদৃশ্য

১। পিতৃ-পরিবেশ একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয় নহে। মাতৃ-পরিবেশের মূল ব্যাপারটি ধরিতে পারিলে এবং তাহার প্রধান প্রধান সূত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম হইলে পিতৃ-পরিবেশের অনেকখানি জ্ঞানগোচর হইয়া যায়। মাতৃ-পরিবেশের বহু কথা পিতৃ-পরিবেশে প্রযোজ্য বলিয়া সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই এক-একটি গোটা বিষয় জানা যাইতে পারে এবং বিশেষ কোনো ইঙ্গিত না থাকিলেও অনেক স্থানে নির্ভুল অনুমান সম্ভব। পিতৃ-পরিবেশের আলোচনায় মাতৃ-পরিবেশের অনেক কথার পুনরুল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। সংক্ষেপেই সারা চলিবে, তবু যে পুনরুক্তিদোষ ঘটিবে তাহা মার্জনীয়।

## পিতৃ-পরিবেশের আবশ্যকতা

২। পিতৃ-পরিবেশের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটি ভ্রান্তি আছে দেখা যায়। এই ভ্রান্তিটি যে কেবল আমাদের সমাজে রহিয়াছে তাহা নহে। শোনা যায় যে, ইহা অন্যান্য দেশেও আছে। সাধারণতঃ মনে হয় যে, শিশুর জন্য মায়ের যেমন প্রয়োজন পিতার প্রয়োজন তেমন নহে। মায়ের দানের নিকট পিতৃ-পরিবেশ নাকি অতি তুচ্ছ; অন্তত শৈশবের প্রথম দিকে পিতার যোগ শিশুর না থাকিলে কোনো ক্ষতি নাই। মা নহিলে শিশুর একদণ্ড চলে না, অথচ পিতাকে শিশু প্রথম তো চিনিতেই পারে না। মা নহিলে শিশু বাঁচে না, পিতার অবর্তমানে শিশুর আসে যায় না। মা না থাকিলে শিশুর আত্ম-গঠন সম্ভব নহে। তাই বলিয়া পিতার অবর্তমানে শিশুর আত্মবিকাশ ব্যাহত হইবার কারণ কোথায়? পিতা বা পিতার মতো দায়িত্ব-সম্পন্ন যে-কোনো ব্যক্তি, তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন, শিশু-পালনের অর্থনৈতিক দিকটির প্রয়োজন পূরণ করিতে পারিলে শিশুর বেশ চলে। শিশুর যথোপযুক্ত খাদ্য, বাসস্থান, বিদ্যালয়, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সুব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই মায়েরা করিতে পারেন। মায়েরা যেখানে অপারগ, সমাজের পাঁচ জনে বা আত্মীয়েরা সে ভার লইতে পারেন। সুতরাং আপন দায়িত্ব অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া পিতা বনবাসী হইতে পারেন, শিশুর আত্মগঠনের দিক দিয়া কোনো প্রতিবন্ধক নাই।

৩। উল্লিখিত ধারণাটি ঠিক নহে। ইহা পিতার কার্যকে এবং শিশুর সহিত পিতার সম্বন্ধকে নিতান্ত বাহির হইতে দেখিবার ফল। মানব-মনের অতি অল্পই বাহির হইতে অনুমান করা যায়। শিশু-জীবনে পিতার প্রয়োজন যখন সর্বাধিক, শৈশবের যে অংশে পিতার স্থান অ-পিতার পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব নহে, বাহিরের ভাসা-ভাসা বিচারে ঠিক সেই সময়টিই উপেক্ষিত হইয়াছে। শিশু যখন একটু বড় হইয়াছে, বিদ্যালয়ে যাইবে, একটু জ্ঞান হইয়াছে, তখন পিতৃ-পরিবেশের মূল্য অধিক নহে, অন্তত অতি-গভীর নহে। শৈশবের শেষের দিকে পিতার যোগ হইতে শিশু বঞ্চিত হইলে তাহার মনের গোড়াপত্তন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু শিশুর মনের নিকট পিতৃ-যোগ ঘটিতেই হইবে, নতুবা শিশুর প্রকৃতিই গঠিত হইবে না। শৈশবের প্রথম দিকে শিশুর মনে পিতৃ-যোগ না থাকিলে শিশুর মানবোচিত গোড়াপত্তন সম্ভব নহে। এইস্থানে মাতৃ-পরিবেশের একটি বিষয় স্মরণ করা যাইতে পারে। শিশু তাহার আত্মগঠনের বিশেষ পর্বে পিতৃ-মুখী হয় বা পিতার সহিত একাত্মা হইয়া যায়। নারী-শিশু তাহার মানসিক বিকাশের একটি ধাপে পিতাকে একান্তভাবে অবলম্বন করে এবং পিতাকে অবলম্বন না পাইলে সে স্বভাব ও সমাজ-নির্দিষ্ট নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের আদর্শে উন্নীত হইতে পারিত না। নারী-প্রকৃতির সম্পূর্ণতার জন্য পিতৃ-পরিবেশ অপরিহার্য। পুরুষ-শিশু পিতার যোগে পৌরুষ বা পুরুষপনার প্রথম ধারণা গ্রহণ করে, সে প্রকৃতির নিয়মে শৈশবের কিছুকাল পিতার সহিত একাত্মা হইয়া যায়। এইরূপ একাত্মতা না ঘটিলে পুরুষ-শিশু যে কী হইয়া উঠিত বলা যায় না, তবে পুরুষোচিত হইত না। শিশু-চিত্তে পিতার যোগের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে ইহা একটি দিক মাত্র। কিন্তু এই সত্যটুকু সর্বসাধারণের জানা নাই অথবা ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস সুপরিণত নহে। সেই কারণে তাহাদের নিকট পিতৃ-পরিবেশ মাতৃ-পরিবেশের ন্যায় প্রয়োজনীয় মনে হয় না। মনোবিজ্ঞানের তথ্য এবং সত্য সাধারণ দৃষ্টির দেখার সহিত মিলিবে এমন কোনো কথা নাই। তবে মনোবিজ্ঞান একটু গভীর স্তর পর্যন্ত সন্ধান করে বলিয়া তাহার মত বা বিশ্বাসটুকু গ্রহণ করাই ভালো।

৪। প্রশ্ন উঠিতে পারে, শিশু মাতৃ-জঠরে থাকার কালে পিতার মৃত্যু বিরল ঘটনা নহে। সে-সকল ক্ষেত্রেও শিশু সুন্দর সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখা যায়। অতএব শিশু-চিত্তে পিতৃ-পরিবেশের স্থান তো অপরিহার্য নহে। মাতৃ-পরিবেশের

আলোচনা-কালে এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে। শিশুর চিত্তে পিতৃ-যোগ চাইই। কিন্তু কোন্ ব্যক্তির যোগ চাই, সে কথা শিশুর নিকট নিষ্প্রয়োজন। যে-কোনো ব্যক্তির যোগ পিতৃ-যোগের অনুরূপ হইলেই শিশুর প্রথম বিকাশ সম্পন্ন হইবে। রাম তাহার পিতা কি শ্যাম তাহার পিতা, এ পার্থক্য শিশুর ধারণার বাহিরে। পিতৃ-যোগের জন্য শিশুর জনককেই প্রয়োজন অথবা যে ব্যক্তিটির সহিত মায়ের বিবাহ হইয়াছিল তাঁহাকেই মনের সম্মুখে আবশ্যক, এমন কোনো হেতুবাদ জানা নাই। তবে, শিশু যখন একটু বড় হয়, যখন সে সমাজ-সংস্কারের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহার আপন জনককে বা সমাজ-স্বীকৃত পিতাকে আবশ্যক হয়। তখন তাহার চিত্তে অপর কোনো ব্যক্তিই পিতৃ-যোগ দান করিতে পারেন না। শিশু বড় হইলে গৃহের বা সমাজের পুরুষ ব্যক্তিরা পুরুষ-পরিবেশ ছাড়া আর কিছুই নহেন, পিতার যোগ তাঁহারা দিতে পারেন না। তাঁহারা শিশুর চিত্তে পিতৃ-প্রভাব না দিতে পারেন, তাহার প্রতি পিতৃ-দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তারও করিতে পারেন। কিন্তু শিশু তাহা পিতৃ-পরিবেশ বলিয়া মানে না। শৈশবের প্রথম দিকে শিশুর চিত্তে যে-কোনো ব্যক্তিকে পিতৃ-পরিবেশ-রূপে দাঁড় করানো যাইতে পারে। এমন-কি, যদি কোনো ব্যক্তিকে শিশুর পিতার অবর্তমানে পিতৃরূপে দাঁড় করানো না হয়, তাহা হইলে শিশু আপন খেয়াল ও বৈশিষ্ট্য-অনুসারে যাঁহাকে নিকটে পাইবে তাঁহাকেই, পুরুষ হইলে, পিতৃবৎ গ্রহণ করিবে এবং তাঁহারই যোগে তাহার আপন প্রকৃতির বিকাশ-সাধন করিতে থাকিবে। অর্থাৎ শিশুর প্রথম দিকে পিতৃ-যোগ অপরিহার্য, যে-কোনো পুরুষ ব্যক্তিকে পিতৃরূপে সে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, যে-কোনো পুরুষকে পিতৃরূপে ধারণা করিয়া তাঁহারই যোগে সে আত্মগঠন করিতে থাকে। শিশু বড় হইলে একদিকে যেমন পিতৃ-যোগ অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে তেমনি আপন জনককে বা সমাজ-স্বীকৃত পিতাকে না পাইলেও তাহার অচল হয় না।

৫। অতি-শৈশবে পিতার মৃত্যু হইলে শিশুর পিতৃ-পরিবেশ সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গৃহে একাধিক পুরুষ থাকিতে পারেন বা শিশুর সহিত বাহিরের কোনো পুরুষ ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন। নিজের পিতাকে মনের সম্মুখে না পাইলে শিশু ইহাদের কাহাকেও পিতৃ-পরিবেশরূপে ব্যবহার করিবে। মায়ের দিক হইতে ইহা অভিপ্রেত না হইতে পারে। পতি-প্রেমের নিবিড়তা থাকিলে

মায়ের অবশ্যই এরূপ কামনা হয় যে, শিশু তাহার পিতার গুণাবলী প্রাপ্ত হউক। কিন্তু শিশুর পিতা তো বাঁচিয়া নাই। শিশু বাধ্য হইয়া অপর পুরুষকে অবলম্বন করিবে; মায়ের শত অনিচ্ছা থাকিলেও তিনি ইহাতে বাধা দিতে পারিবেন না। এ অবস্থায় মায়ের মনে মহা সমস্যা উপস্থিত হয়। শিশুর হিতাহিতের বিচারে অপর পুরুষের পিতৃ-যোগ ব্যর্থ না হইতে পারে, বাস্তব বিচারে হয়তো শিশুর আপন পিতা অপেক্ষা অন্য পুরুষ অনুকরণীয়, তথাপি পতিপ্রাণা মায়ের মনের প্রয়োজন শিশুকে তাহার পিতার প্রভাবে আনয়ন করা। এই-সকল অবস্থায় মনোবিশ্লেষণের বিশেষ অভিমত যে, মায়ের এই মানসিক প্রয়োজন শিশুর চিত্তে বিশেষ মঙ্গলসাধন করে। বাহিরের ব্যক্তি যতই আপনার হউক-না কেন, তাঁহার 'আপন' হইয়া উঠার সীমা আছে। শিশুর সহিত বাহিরের পুরুষের যোগ নিবিড় হইলেও, শিশুর মায়ের সহিত তাঁহার দূরত্বটুকু শিশু-মনে ছাপ দেয়। সেইজন্য, বাহিরের পুরুষের সহিত পিতৃ-যোগ-স্থাপন এবং মনে মনে এক প্রকার পিতৃ-প্রতিরূপ-গঠন সত্ত্বেও শিশু-মনে মায়ের দিক হইতে তেমন উৎসাহ আসিয়া পৌঁছায় না। শিশু যাহার সহিত পিতৃ-যোগ স্থাপন করিয়া আত্মবিকাশ করিতেছে মা ভুলিয়াও তাঁহাকে শিশু-চিত্তে পিতারূপে দাঁড় করাইতে চাহেন না। মা সংস্কারবশে আপন স্বামী ব্যতীত অপর কোনো পুরুষকেই শিশুর পিতৃ-প্রতিরূপ হিসাবে চাহেন না বলিয়া শিশুর ঐ পিতৃ-অবলম্বনে তেমন সবলতা থাকে না। এ ক্ষেত্রে মায়ের দিক হইতে স্বাভাবিক হইবে শিশুমনে তাহার আপন পিতার প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলা। শিশু যখন একটু আধটু ভাষার প্রকাশ অনুভব করিতে পারে, তখন হইতেই মা পরলোকগত ব্যক্তিটির কথা বলিবেন; নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে শিশুর পিতার জীবনের ঘটনা শিশু-বোধ্য করিয়া বলিতে থাকিবেন; স্বামীর প্রতিকৃতি থাকিলে বা তাঁহার চিহ্ন কিছু সংসারে বর্তমান রহিলে তাহার সাহায্য লইবেন। বলা বাহুল্য ইহা কৌশল নহে, ইহা মায়ের দ্বারা শিশুর নিকট পিতার দোষ-গুণের তালিকা বর্ণনা নহে। ইহা জীবন্ত চরিত্রচিত্র-সৃষ্টির কথা, শিশু-চিত্তে শিশুর পিতার প্রতিরূপ গঠনের স্বাভাবিক পথ, ইহা মায়ের প্রেমের স্মৃতির অবলম্বনে প্রকৃতির স্বকার্যসাধন। পিতৃ-প্রতিরূপ-গঠনের ব্যাপারে যথার্থ আনুকূল্য হয়, মা যখন সত্যই অন্তরের আবেগে শিশুর সম্মুখে স্বামীকে স্মরণ করেন। প্রেম-রিক্তা নারীর পক্ষে শিশুকে এ বিষয়ে কোনোরূপ সাহায্য করা সম্ভব নহে। ইহাতে শাস্ত্র-মেলানো সতী-ধর্মের কোনো প্রসঙ্গ নাই, ইহা

মনোবিশ্লেষণের অভিমত। শিশু কোনো পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া পিতৃ-পরিবেশ-রূপে ব্যবহার করিবার সময় মায়ের নিকট হইতে পাওয়া আপন পিতার ছবিটি মিলাইয়া লয়। এবং নিজ মনে প্রত্যক্ষ পুরুষের ভিত্তিতে আপন পিতার অনুসরণে এক প্রতিরূপ সৃষ্টি করে, ইহাই তাহার পিতৃ-প্রতিরূপ। মায়ের মনও শান্ত হয়, পতির মতোই হইবে পুত্র; শিশু মায়ের উৎসাহ অনুভব করিয়া অন্তরে সবলতা লাভ করে। সে প্রত্যক্ষ পুরুষের যোগে আপন প্রকৃতির বিকাশ সাধন করে এবং মায়ের নিকট হইতে পাওয়া পিতৃরূপকে আপন চিত্তে মিশাইয়া পিতৃ-প্রতিরূপ গঠন করে। এইভাবে মায়ের মনের সমস্যা দূর হয়, শিশুর মনেও কোনোরূপ গাঁঠ পাকাইয়া ওঠে না।

৬। মনোবিশ্লেষণের ইঙ্গিত হইতে আরো বলা চলে, সন্তান অতি শিশু, স্বামী মাসের পর মাস দূরে রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় শিশুর পিতার সম্পর্কে আলোচনা যত হয় ততই ভালো। কারণ, শিশু-চিত্তে পিতৃ-পরিবেশ সবল হইবে, শিশুর পিতৃ-প্রতিরূপ ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

৭। গৃহে মায়ের সহিত অন্যান্য সকলেই যদি শিশুর সম্মুখে তাহার পিতাকে লইয়া সুখকর আলোচনা করেন, তাহা হইলে আরো ভালো। বিশেষ কোনো কারণে, শিশুর আপন পিতার প্রতিরূপ শিশু-চিত্তে ফুটাইয়া তোলা উচিত কি অনুচিত, তাহা অবশ্য স্থির করিবেন শিশুর মা এবং গৃহের অপর সকলে। সেখানে মনোবিজ্ঞানের কিছু বলিবার নাই।

৮। যে শিশু তাহার মাকে হারাইয়াছে, পিতাকেও হারাইয়াছে, তাহারও মনোবিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার মনে পিতৃ-প্রতিরূপ জাগিয়া আছে। সে তাহার মায়ের কথা স্মরণ করিতে হয়তো পারে না, পিতার কিছুই সে জানে না, অথচ তাহার চিত্ত পিতৃ-রিক্ত নহে। এইসকল কারণে বিশ্বাস করিতে বাধা নাই যে, শিশুর চিত্ত-বিকাশের জন্য পিতৃ-পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন, এবং তাহা একরূপ অবশ্যম্ভাবীও বটে আর ইহা প্রকৃতিরই ব্যবস্থা।

৯। শিশু যখন একটু বড় হয়, সঙ্গী-সাথী আসিয়া জোটে, তখন পিতৃ-প্রতিরূপ আরো স্পষ্ট ও পরিবর্ধিত হইতে থাকে। শিশু এখন নূতনভাবে পিতাকে অনুভব করিতে থাকে। সঙ্গী-সাথীদের পিতা আছেন, তাহারা নিজ নিজ পিতাকে কিভাবে গ্রহণ করে, পিতা তাহাদিগকে কেমনভাবে কি বলেন, সে লক্ষ্য করিতে থাকে এবং তদনুসারে আপন পিতার সহিত

আপনাকে খাড়া করিয়া অনুভব করে। পিতা জীবিত থাকিলে অন্যান্য শিশুর পিতার সহিত তাঁহাকে মিলাইয়া দেখে; পিতা মৃত হইলে মনের পিতৃ-প্রতিরূপকে ব্যবহার করে। প্রতিদিন একাধিক গৃহে পিতৃরূপ দেখিয়া শিশু আপন পিতৃ-পরিবেশ বা পিতৃ-প্রতিরূপ গঠন করে এবং নিজেকেও তদনুসারে গড়িয়া তোলে। বিশ্লেষণ-বিচার সাধারণতঃ শিশুর নাগালের বাহিরে থাকে বলিয়াই সে পিতাকে সমগ্রভাবেই অনুভব করে।

## পিতৃ-দায়িত্ব

১০। এই তো গেল পিতৃ-পরিবেশের প্রয়োজন। ইহাকে একেবারে মৌলিক প্রয়োজন বলা চলে, ইহার কাজ অত্যন্ত গভীর; স্থূলদৃষ্টির আড়ালে ভাসা-ভাসা জানা-চেনার বাহিরে ইহা চলিতে থাকে। ইহা ব্যতীত পিতার কতকগুলি সাধারণ দায়িত্ব আছে; সেগুলি অল্পাধিক অপরের দ্বারা উদযাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পিতার দ্বারা হইলেই সব দিক দিয়া স্বাভাবিক হয়। এজন্য শিশুর প্রতি পিতৃ-দায়িত্বের আলোচনা আরো বিশদ না করিয়া উপায় নাই।

১১। মায়ের স্বাস্থ্যের উপর শিশুর স্বাস্থ্য যে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তাহা সুবিদিত। পিতার নীরোগ দেহ শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক, এ কথাও অপ্রচলিত নহে। মাতৃ-জঠরে শিশু-প্রাণ উৎসৃষ্ট হইবার কালে পিতার নীরোগ থাকা বাঞ্ছনীয়; বিশেষ করিয়া বংশানুক্রমে যে-সকল ব্যাধি সঞ্চলিত হয় সেগুলি পিতৃদেহে ( বা মাতৃদেহে ) থাকা মারাত্মক। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও পিতার স্বাস্থ্য নীরোগ থাকা দরকার। তিনি শিশুকে আদর করিবেন, স্পর্শ করিবেন, ইহাই তো সকলে আশা করে এবং ইহার মূল্যও আছে। তাঁহার রোগ-স্পর্শ শিশুকে রোগ দান করিতে পারে। ইহা ব্যতীত মায়ের দেহ বাহিয়া পিতার রোগ শিশু-দেহে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য যতদিন শিশু তাঁহাদের স্পর্শের ও চুম্বনের পাত্র হইয়া থাকিবে, ততদিন বিশেষ সতর্কতারই প্রয়োজন। এই কারণেই শিশুর ওষ্ঠে বা মুখে চুম্বন করা বা অপরিচ্ছন্ন হস্তে শিশুকে আদর করা অনুচিত। এগুলি অবশ্য অতি সহজ কথা, যদিও দৈনন্দিন জীবনে পালন করা সহজ নহে দেখা যায়।

১২। পিতার ( এবং মাতার ) সুস্বাস্থ্যের একটি বিশেষ দিক হইল দেহ-বিলাসের দিক। সংযতকাম জনক-জননীর শিশু বহু দিক দিয়া সুরক্ষিত।

বংশানুক্রমিক ব্যাধির সম্ভাবনা অল্প, এমন-কি বর্তমান বিজ্ঞান-সাধনার যুগে এই প্রকার ব্যাধি শিশুদেহে আসিবার কারণ থাকে না। কখনো কখনো স্নায়বিক দুর্বলতা পিতা হইতে শিশুতে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়। তবে, এই বিষয়টি বংশানুক্রমিক কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া এখনো বলা যায় না। স্নায়বিক ত্রুটিরও একটি বড় কারণ অসংযত কাম বা তীব্র কামবাসনার অতৃপ্তি-জনিত পীড়াদায়ক মানসিক অবস্থা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মুক্ত বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিমিত মানসিক ও দৈহিক শ্রম, মনের প্রফুল্লতা ও উন্নত বিষয়ের চর্চা—এগুলি অত্যাবশ্যক। ইহাদের অভাব ঘটিলে পিতামাতার স্বাস্থ্য থাকে না, সুতরাং রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক পরিমাণে দেখা দেয় এবং তাহারই ফলে স্পর্শের কারণে শিশুকেও রোগজীর্ণ হইয়া পড়িতে হয়। এ-সকল কথা ঠিক। তবে পিতামাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করা অবস্থানুসারে যা'ও সম্ভব হয়, সংযত-কাম না হইলে তাহাতেও ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য পিতামাতাকে বিশেষ পরামর্শ দেওয়া চলে যে, সকল অবস্থাতেই পরিমিত কামচর্যার অভ্যাস-গঠন প্রথম কর্তব্য।

১৩। সংযত কামাচরণের পরামর্শ মাতৃ-পরিবেশে না দিয়া, পিতৃ-পরিবেশে দেওয়ার বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে কি? সমাজের পুরুষ ও নারীরাই তাহা বলিতে পারিবেন।

১৪। শিশুর মঙ্গলের জন্য পিতার (এবং মাতার) একটি দায়িত্ব নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা, নিজেকে রোগমুক্ত রাখা। ইহা প্রধান দায়িত্ব। সংযত কামভোগ ইহারই প্রধান নিয়ম বা শর্ত। ইহার পর পিতার আর্থিক দায়িত্ব স্বাস্থ্যের দায়িত্বের পর আর্থিক দায়িত্ব উল্লেখ করিবার কোনো কারণ নাই, একটিকে ছোট করিয়া অপরটিকে বড় করিবার অভিপ্রায় নাই। পিতার আর্থিক কর্তব্য সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে। অর্থ-পরিচালিত সভ্যতায় এবং পুরুষ-প্রধান সমাজে আর্থিক কর্তব্যের ভার আছে গৃহের পুরুষের উপর, অর্থাৎ পিতার উপর। অর্থ সম্পর্কে মায়ের কাজ গৌণ এবং পরোক্ষ, তাহাও আবার চোখে পড়ে না। পিতার আর্থিক দায়িত্ব সার্থক হইলে তাঁহার স্বাস্থ্য, শিশুর মায়ের স্বাস্থ্য এবং তাহার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো হইতে পারে। শিশু যতদিন মাতৃ-জঠরের অতিথি ততদিন মাতৃদেহ হইতেই তাহার সেবা চলে। এইজন্য শিশুর মাকে সবল ও প্রফুল্ল রাখিতে হয়। ইহার ব্যবস্থায় অর্থের প্রয়োজন এবং সেই অর্থ সংগ্রহের ভার পিতার।

পিতাকে যথোপযুক্ত পরিমাণে অর্থোপার্জন করিতে যেভাবে নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, যেভাবে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার অন্য কর্তব্যের কথা চাপা পড়িয়া যায় এবং লোকচক্ষে অর্থোপার্জনটাই তাঁহার প্রধান দায়িত্বরূপে দাঁড়াইয়া যায়। সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিলে হয়তো পিতাকে আর্থিক দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া শিশুর প্রতি অপর দায়িত্বের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে না।

১৫। সমাজের বর্তমান অবস্থায় পিতার আর্থিক সচ্ছলতার উপর শিশুর বহু দিক নির্ভর করিতেছে। মাতৃ-জঠরে অথবা তাহার বাহিরে শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ পিতার অর্থ-সচ্ছলতার উপর। দেহের স্বাস্থ্য ছাড়াও শিশুর স্ফুটনোন্মুখ মনের বিকাশ অর্থের দ্বারা অনেক প্রকারে প্রভাবান্বিত হয়। ইহা শুনিতে কেমন কেমন লাগে। শিশুর স্বাস্থ্যানুকূল্য করা ব্যতীত শিশুর নিকট অর্থের কী মূল্য থাকিতে পারে? শিশু অর্থ কাহাকে বলে জানে না, অর্থের অর্থ তাহাকে ক্রমশ শিক্ষা করিতে হয়। সে অর্থকে আদৌ আমল দেয় না। তাহার ঐশ্বর্য সর্বত্র, ফল-ফুল, পাথর, কাঠের টুকরা, ভাঙা বাসন, ধুলা, জল, কাদা ইত্যাদি। ঐশ্বর্যের উপাদান তাহার চতুর্দিকে শত শত রূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সে কেবল মনে করিলেই হইল 'উহা আমার'। তাহার ঐ পাথরের নুড়ি আর ভাঙা-বাসন লইয়াই কত সোহাগ, আহ্লাদ, কান্না, প্রতিযোগিতা। শিশুর চক্ষে মোহর বা টাকা 'চক্‌চকে পদার্থ' বলিয়া যদি কিছু আদর পায়, অর্থ বলিয়া নয়, নোটের তাড়া সাজাইয়া রাখিলে সে তাহার বিশেষ কোনো মর্যাদা দিবে না। শিশুর ধারণায় যখন অর্থের বিশিষ্ট অর্থ নাই তখন অর্থের দ্বারা তাহার চিত্ত কী ভাবে প্রভাবিত হইতে পারে?

১৬। কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাক। যে-কোনো গৃহে পিতার শাসনই প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। পিতার পছন্দ-অপছন্দ, পিতার খেয়াল-খুশি, পিতার বিচার-বিবেচনা, পিতার সেবা-যত্ন, পিতার রোষ-ক্ষোভ, পিতার সন্তোষ-করুণা—গৃহে প্রাধান্য লাভ করে। তিনিই যেন গৃহের মূল, তাঁহাকেই সকলে অল্পাধিক অনুসরণ করে। সংক্ষেপে তিনিই যেন গৃহের পরিবেশকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। যে সংসারে পিতা ধীর ও বিবেচক হন সেখানেও তাঁহার প্রতাপ মৌন-সম্মতিতে স্বীকৃত, অপ্রতিহত। ইহাই সভ্যতার নিদর্শন, ইহাই সাধারণ গৃহস্থালির রূপ। 'অতিরিক্ত' স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ যদি কোথাও থাকে, তাহা হইলে হয়তো গৃহের চিত্র সেখানে অন্যরূপ।

তথাপি সর্বদেশে মোটামুটি এই প্রকার পিতৃ-প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার কারণ একাধিক—সংস্কার, প্রথা, পুরুষ-নারীর সামর্থ্য ভেদ প্রভৃতি। ইহারা বিভিন্ন মাত্রায় পিতৃ-প্রাধান্য সমর্থন করে। প্রধান কারণটি আরো স্থূল, তাহা আর্থিক। পিতা গৃহের আর্থিক অবলম্বন বলিয়া সমগ্র গৃহ-পরিবেশেই যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে। পিতা যে গৃহে অর্থোপার্জনে অক্ষম, সে গৃহে পিতৃ-প্রাধান্য অধিক দিন অপ্রতিহত থাকে না। যিনি অর্থ আনয়ন করিয়া গৃহের সকলকে বাঁচান, সুখ দেন, ধীরে ধীরে তিনিই গৃহ-পরিবেশের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে দোষ-গুণের কিছু নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম। পিতৃ-প্রাধান্যের আর্থিক হেতু-বিচারে কেবলমাত্র পিতার অর্জিত বা প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণই আলোচনার বিষয় নয়; তাঁহার অর্থ সংগ্রহের প্রধান পদ্ধতিটিও গৃহ-পরিবেশের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি না করিয়া পারে না। কৃতী উকিলের গৃহের ধরন-ধারণ, অধ্যাপকের গৃহের চাল-চলন, পুলিসের গৃহের আচার-ব্যবহার, একটি অন্যটির সহিত মেলে না। এই সকল পৃথক পৃথক পরিবেশে বর্ধিত শিশুরা পরস্পর মনের গঠনেও স্বতন্ত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর্থিক কারণে শিশুর মনের বিকাশ-গতি যে বিশেষিত হইয়া পড়ে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। ইহা প্রধানতঃ পিতার মধ্যস্থতাতে ঘটে বলিয়া পিতৃ-পরিবেশের আলোচনায় ইহার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। শিশু নিজে অর্থ চাহে না, তাহার নিকট অর্থ নিরর্থক। তথাপি অর্থের কারণেই তাহার মনের বিকাশ এদিকে না হইয়া ওদিকে হইতেছে। পিতা তাঁহার আর্থিক দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া সমগ্র গৃহস্থালিকে তাঁহার চিন্তা, তাঁহার কার্য, তাঁহার অনুভূতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন। পিতা যে বলপূর্বক গৃহের পরিবেশকে তাঁহার অর্থের পরিমাণ-অনুসারে এবং অর্থোপার্জনের পন্থা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহা নহে। পিতার দিক হইতে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ না থাকিলেও সমস্ত সংসারটি তাঁহাকে স্বতঃই অনুসরণ করে, শিশুও পিতাকেই অনুসরণ করে এবং গৃহের মোট ধারা-ধরনটুকু স্বীয় চরিত্রে গ্রহণ করিয়া বসে। সংসারে পিতার প্রাধান্য হেতু শিশুর মনে তাঁহারই দিকটি অবিরত বড় হইতে থাকে; অপরের প্রভাব এমন-কি মায়ের প্রভাব পর্যন্ত ক্ষীণ রহিয়াই যায়। পিতার অনুকরণটাই প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। শিশুর আত্ম-গঠনে পিতার এই অধিক প্রভাবের মূলে থাকে গৃহ-পরিবেশে তাঁহার প্রাধান্য এবং পিতৃ-প্রাধান্যের প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার উপরেই সংসারের আর্থিক নির্ভরতা।

১৭। একটু বলিয়া রাখা চলে যে, শিশু বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় পিতার অর্থগত প্রতিষ্ঠার কথা বোঝে না এবং জানে না। সে চতুর্দিকে অনুভব করে গৃহের সকলেই প্রায় পিতাকে 'ভালো' মনে করিতেছে, সকলেই তাঁহাকে 'ভালবাসিতেছে'। সেও পিতাকে ভালো মনে করিবার এবং ভালবাসিবার একটা প্রেরণা পায়। সেই কারণেই তাঁহার অনুকরণ করে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পিতার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ যোগটুকু যদি সুখের না হয়, পিতার ব্যবহারে তাহার চিত্তে যদি বৈরিতার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সে পিতার অনুসরণ করিতে পারিবে না, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব পিতাকে কেন্দ্র করিয়া তীব্র হইয়া উঠিবে। তখন পিতার আর্থিক প্রতিষ্ঠা শিশুচিত্তে অধিক দূর পৌছিতে পারিবে না; হয়তো শিশু বাহ্য আচরণে পিতার অনুরূপ হইয়া উঠিবে, অথচ অন্তরে অন্তরে অন্যরূপ থাকিবে।

১৮। আর্থিক অবনতির জন্য পিতা আপন গৃহে প্রভাব হারাইয়া ফেলিতে পারেন। গৃহের পরিবেশে তাঁহার দিকটি ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতে পারে। তাঁহার পত্নীর এবং অন্য সকলের সংস্কার, প্রীতি প্রভৃতির দ্বারা হয়তো কিছু প্রভাব থাকিয়া যাইবে, তথাপি তাঁহার প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। ব্যতিক্রম থাকিলেও, ইহাই সাধারণতঃ ঘটে। পিতা নিষ্প্রভ হইয়া থাকিলে শিশুর চিত্তে পিতাকে অনুসরণ করার প্রেরণা তেমন থাকিবে না। যদি পিতাকে তাহার নিজের ভালো লাগে, সে যদি পিতাকে ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলেই 'নিষ্প্রভ' পিতাও তাহার কাছে অনুকরণীয় রহিবেন

## দারিদ্র্য ও শিশু

১৯। পিতার আর্থিক দায়িত্ব-পালনে অক্ষমতা থাকিলে শিশুর মানসিক ক্ষতি বহু দিকেই হয়। পিতার অনুকরণীয় গুণ শিশুর নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, কারণ আর্থিক অক্ষমতায় তাঁহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। পিতার বিশেষ গুণ হইতে বঞ্চিত হইলে শিশুর ক্ষতি। সে তাহার সামর্থ্য-অনুসারে পিতার গুণ নিজচরিত্রে লাভ করিতে পারিত, কিন্তু পিতার বিশেষ গুণটি তাহার মানসদৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায় বলিয়া সে তাহা আত্মস্থ করিতে পায় না। এই ক্ষতি ছাড়া শিশুর আরো মহা ক্ষতি ঘটে অন্যভাবে। পিতার অক্ষমতা স্বেচ্ছাকৃত নহে, তথাপি তাঁহার দারিদ্র্যের ফল শিশুকে একাধিক পথে আঘাত করে। গৃহের দারিদ্র্য এবং শিশু-চিত্তের গঠন সম্পর্কে

মনোবিজ্ঞানে অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে, এখনো এই লইয়া গবেষণা চলিতেছে। শিশু-চিত্তে দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়া শৈশবেই প্রকাশ পাইবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই ; কখনো শৈশবে, কখনো পরবর্তী জীবনে, দারিদ্র্য-জনিত মানস ক্ষত উৎকট মানসিক পীড়ার সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কোনো কোনো বয়স্ক জীবনে অকারণ অনিশ্চয়তা বোধের উল্লেখ করা যায়। বয়স্ক জীবনে অনিশ্চয়তার পীড়া অনেকেই বোধ করিয়া থাকেন। এখন এক রকম করিয়া দিন যাইতেছে, পরক্ষণে যে কী হইবে কিছুই স্থির নাই, কোথায় কী সর্বনাশ কোন্ পথে আসিয়া পড়িবে কিছুই অনুমান নাই—তাহারই দুশ্চিন্তা অবিরত মনকে পীড়া দিতে থাকে। সত্যসত্য অনিশ্চিত অবস্থায় অনিশ্চিত অবস্থার পীড়া ঘটিতেই পারে। (সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।) কিন্তু তাই বলিয়া অতি তুচ্ছ কারণে বা কতকটা অকারণে অনিশ্চিত অবস্থার পীড়া ভোগ করা সুস্থ সবল মনের পরিচয় নহে। 'অকারণে' বা সামান্য কারণে এই প্রকার পীড়ার একাধিক প্রচ্ছন্ন বা দূরবর্তী কারণ থাকিতে পারে ; তাহার মধ্যে শৈশবে দরিদ্রগৃহের প্রভাব একটি বিশেষ কারণ। শিশুর অনুভূতিতে পিতা-মাতার দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তার পীড়া অনেক সময়েই ধরা পড়ে, দারিদ্র্যজনিত অনিশ্চয়তার ও দুশ্চিন্তার প্রচ্ছন্ন ছাপ শিশু-মনে থাকিয়া যায়। ইহা কখনো কখনো অল্প বয়সেই অকারণ দুশ্চিন্তারূপে প্রকাশ পায় ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স্ক জীবনে স্পষ্টভাবেই দেখা দেয়।

২০। দরিদ্রগৃহে পিতামাতা এবং সংশ্লিষ্ট অপর সকলের মধ্যে যে-সকল আলোচনা হয় তাহার অধিকাংশই দারিদ্র্যের ক্লেশ ও গ্লানি সম্পর্কে এবং তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের বিষয়ে। শিশু প্রায়ই তাহার মাকে, তাহার পিতাকে ক্লিষ্ট দেখিতে পায় এবং দারিদ্র্য, অভাব, অর্থের টানাটানি প্রভৃতির এক প্রকার অর্থ করিয়া লয়। ক্রমশ সে অর্থের অভাব এবং 'কী হইতে কী হইবে' ভাবনা যেন বুঝিতে পারে। সেও এ সংসারে অর্থের মূল্য যে কতখানি তাহা অনুভব করে। অর্থের মাহাত্ম্য বুঝিবার বয়স তাহার হয়তো হয় নাই। তথাপি পিতামাতার পীড়া দেখিতে দেখিতে এবং দারিদ্র্যের কথা শুনিতে শুনিতে সে অল্পবয়সেই অর্থাভাবের ব্যাপারটুকু তাহার মতো করিয়া বুঝিয়া লয়। দারিদ্র্য পিতাকে ও মাতাকে বহুজনের কাছে নত করিয়া দেয় ; অথচ গৃহে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় শিশু আভাসে বুঝিয়া লয় পিতামাতার নত হইতে আদৌ ইচ্ছা নাই। সে অনুভব করে কোথাও যেন কোনো শান্তির

ব্যবস্থা আছে যাহার ভয়ে মাতা ও পিতা তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও নত হইতেছেন— শিশু নিজেও তাহার ক্ষুদ্র জীবনে একাধিকবার তাহার মাতা ও পিতার কাছে অনিচ্ছা লইয়াও শাস্তির ভয়ে নতি-স্বীকার করিয়াছে। শিশু অনুভব করে মাতা ও পিতা যেন কোনো কিছুতেই সাহস দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের আলোচনায় অবিরত দ্বিধা সংকোচ ভয় রহিয়াছে বোঝা যায়। শিশু হয়তো দেখিতে পায় তাহার মাতা পিতা প্রায়ই অপর ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন, নিজেরা কোনো কাজেই অগ্রসর হইতে চাহেন না। বাহিরের উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে শিশু নিজেই কেমন যেন হইয়া যায়। নিজের খেয়ালে কিছু করিবে সে ভরসা কমিয়া আসে, তাহার অভিজ্ঞতাও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। তাহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তাহার মা ও তাহার বাবা; তাঁহারাই যখন অসহায় অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন তখন শিশুর ভরসা কোথায় দাঁড়াইবে? শিশুও তাহার অজ্ঞাতসারে অনিশ্চিত-মতি হইয়া পড়ে, তাহারও আত্মবিশ্বাস ক্ষয় হইয়া যায়, সেও সকলের কাছে ভয়ে ভয়ে থাকে এবং সকল কাজেই অপরের উপর নির্ভর করিতে চাহে। শৈশবের এই সর্বনাশ কিছু কিছু অল্প বয়সেই দেখা দেয়; দারিদ্র্য-অভিশাপের পূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশ পায় বয়স্ক জীবনে, তখন নিজের ভার এবং অপরের ভার তাহাকে স্বহস্তে লইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অভিশাপ আর কী আছে, দারিদ্র্য অপেক্ষা অধিক আঘাত সংসারকে কে দিতে পারে?

২১। দারিদ্র্যে কখনো কখনো শিশুর মন অন্য এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিশু অনেক সময় দারিদ্র্যের পীড়া সহ্য করিতে পারে না, অথচ সহ্য না করিয়াও উপায় নাই। তখন তাহার একমাত্র পথ নিজের মনকে অসাড় করিয়া ফেলা। শিশুর মন অংশতঃ অসাড় হইয়া আসিলে দুঃখের আঘাত তাহার মর্মে গিয়া পৌঁছায় না। শিশু যেন বাঁচে, দারিদ্র্যের দংশনে তাহার আর তেমন কিছু হয় না। তাহার মায়ের বা পিতার ক্লেশ তাহাকে আর বিচলিত করে না, সে এক প্রকার অসাড় জীবন যাপন করে। কিন্তু এই প্রকার অসাড়তা উন্নত জীবনের অন্তরায়। শিশু দারিদ্র্যের পীড়া হইতে বাঁচে বটে, কিন্তু পরের ব্যথায় ব্যথিত হইবার যে মানবোচিত গুণ তাহা হারাইয়া ফেলে। সে তাহার মাতাপিতার দুঃখ অনুভব করিতে না পারিলে সংসারে অপর কাহারও দুঃখে দুঃখিত হইবে না। তাহার অন্তর এক অসাড় কঠিনতার আড়ালে আত্মগোপন করিবে। তাহাতে কাহারও দুঃখের স্পর্শ থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সুখের

স্পর্শও তাহার নিকট ব্যর্থ হইতে থাকিবে। দারিদ্র্যের সহিত উপযোজন করিতে গিয়া শিশু জীবনের সূক্ষ্ম সুখ-দুঃখ, বেদনা-আনন্দ অনুভব করিতে ভুলিয়া যাইবে। কেবল অত্যন্ত স্থূল মোটা ধরনের সুখ ও কষ্ট তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিবে। সূক্ষ্ম অনুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে মানব-জীবনের কতটুকু অংশ বাকি থাকে? সকল শিশুই এই প্রকার পথ গ্রহণ করে না। যাহার যেমন বৈশিষ্ট্য, তদনুসারে তাহার মনও প্রস্তুত হয়; শিশু জানিয়া ভাবিয়াও ইহা করে না, ইহা তাহার মন অগোচরেই সম্পন্ন করে।

২২। শিশুর দিকে যেমন, তাহার মাতাপিতার জীবনেও সেইরূপ ঘটিতে পারে। এখানে ওখানে দু-চারিটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের দ্বারা বয়স্ক জীবনে এক অসাড় আবরণের সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য-পীড়িত মন প্রতিদিনের ক্লেশের সহিত উপযোজন করিতে গিয়া যেন খানিকটা অবশ হইয়া যায়। বয়স্ক জীবনের বেদনা-আনন্দ স্থূল হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমশ সংস্কৃতির মান নামিয়া আসে। তখন গৃহে মাতাপিতার মধ্যে পরনিন্দার ও পরশ্রীকাতরতার প্রাধান্য দেখা যায়। যাহা-কিছু মহৎ ও সূক্ষ্ম তাহা তাঁহাদের মনের বাহিরে পড়িয়া থাকে। কঠিনতার এই আবরণ অগভীর হইলেও সহজে ইহা অপসারিত করা যায় না। শিশুর জীবনে ইহার কুফল স্পষ্টভাবেই অনুমেয়। মাতাপিতার দৈনন্দিন জীবনে স্থূল আচরণ ব্যতীত সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ দেখিতে না পাইলে, শিশুর অনুভূতির সূক্ষ্মতা বিকশিত হইতে পায় না, শিশুর জীবনও মহত্ত্বের স্পর্শ হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়। শৈশবের কঠিনতা বয়স্ক মনের আবরণ অপেক্ষা কঠিন। শৈশবে মন স্থূল ও কঠিন হইয়া পড়িলে ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের পীড়া হইতে মুক্তিলাভ ঘটিলেও, মনের সূক্ষ্মানুভূতি ফিরাইয়া আনা দুঃসাধ্য। সেই কারণে শৈশবে দারিদ্র্যের তীব্র দংশনের ভোগ মাতাপিতাকেই যথাসাধ্য বহন করিতে হয়, শিশুকে সাধ্যমত ইহার পীড়া হইতে স্নেহের বর্ম পরাইয়া রক্ষা করিতে হয় অথবা দারিদ্র্যকে এমন হাসিমুখে, এমন বীরত্বের সহিত, মহত্ত্বের সহিত গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে শিশুর অন্তরে বিশেষ গ্লানি স্পর্শ না করে, আচার-আচরণে হীনতাবোধ বা অসহায় ভাব আসিয়া না পড়ে।

২৩। আনন্দ উপভোগ করিতে গেলে দেহের সুস্থতা এবং মনেরও স্বাস্থ্য ও শক্তি আবশ্যক। সূক্ষ্ম আনন্দ-ভোগের শক্তি আরো দুর্লভ—বিশুদ্ধ আনন্দের স্বাদ পাইতে হইলে নিয়ত অনুশীলন চাই, সাধনা চাই।

দেহ-মনে শক্তির প্রাচুর্য ইহার মূল শর্ত। মাতা-পিতার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। শিশু-সন্তানকে পাইয়া মাতা-পিতার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক, শিশুর প্রতিটি আচরণ তাঁহাদের চিত্তে সুখের তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার কথা। দারিদ্র্যে ইহার বিপর্যয় ও ব্যতিক্রম ঘটে; অভাবের পীড়া হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া মায়েব, বিশেষ করিয়া পিতার, প্রায় সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়। শিশুকে দেখিয়া নির্মল ও 'অহেতুক' আনন্দ উপভোগ করার মতো যথেষ্ট শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে না। যাহাতে অভাবের পীড়া দূর হয়, দারিদ্র্য-নিপীড়িত চিত্তে কেবল তাহাই সুখ দিতে পারে। শিশু অভাব-মোচন করে না, অতএব স্নেহময় পিতার নিকট সে কেমন করিয়া সুখের কারণ হইয়া উঠিবে? সে বরং অভাব বৃদ্ধি করে, সে তো দুঃখের কারণ। দারিদ্র্যের জন্য পিতা পিতৃস্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, এবং মায়ের ধৈর্যচুতিতে শিশুর যত ক্ষতি হয় পিতার অসহিষ্ণুতায় তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ, গৃহপরিবেশে পিতার প্রাধান্য হেতু তাঁহার অসহিষ্ণু আচরণ গৃহের মধ্যে চতুর্দিকে যেন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়া প্রচণ্ড হইয়া উঠে।

২৪। আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইলে পিতাকে সঙ্কীর্ণ গৃহে থাকিতে হয়, স্বল্প-পরিসর স্থানে সমস্ত পরিবারকে বাস করিতে হয়। ইহাতে শিশুর অপরিণত মনের সম্মুখে এমন-সব আচরণ হইতে পারে যাহাতে শিশু কামভাবের অনুচিত অভিব্যক্তির আভাস পায়। অপরিণত দেহে-চিত্তে ইহার অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব। অর্থাভাবে অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করার কুফল সকলেরই জানা আছে। অনেক সময়ে শিক্ষার অভাবে এবং অভ্যাসের দোষে গৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অভাবের বশে অস্বাস্থ্য গ্রহণ করা সাধারণ ব্যাপার। শহরে বাস করিতে গেলে অনেক পিতাকেই একই অট্টালিকার একটি ক্ষুদ্র অংশে অন্যান্য পরিবারের সহিত বাস করিতে হয়। একাধিক পরিবারের একত্র বাস শুভ অপেক্ষা অশুভ সাধন করে, অন্তত টানাটানি কাড়াকাড়ির 'সভ্যতা'য় বহু পরিবারের মিলন শিশু-চিত্তে সু-প্রভাব বিস্তার করে না। বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন ধারণা। এই বিবিধ প্রকার ধরন-ধারণার সমন্বয় সাধন করিবার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। শিশুর উপর বহুপ্রকার চালচলন ও ভাব-ধারার সামঞ্জস্যসাধন করিবার ভার দেওয়া যায় না। শিশু শুধু-শুধু বিহ্বল হয়, অবশেষে বিভিন্ন প্রভাবের

মধ্যে স্রোতে-ভাসা খড়-কুটার ন্যায় অসহায় হইয়া পড়ে। তাহার চরিত্রে, ভালো হউক, মন্দ হউক, কোনো-একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না, তাহার চরিত্রে বিভিন্ন প্রকাশের সুষম অঙ্গীকরণও সম্ভব হয় না। তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাপনে কেমন যেন অগোছালো অসম্বন্ধ ভাব দেখা দেয়। ইহার সহিত, বহু শিশুর যোগে যে সুফল ও কুফল ঘটে শিশু তাহাও লাভ করে। কুফলের ভাগই অধিক। শিশু-নিকেতনেও বহু শিশু একত্র থাকে; তাহাতে শিশুর কতকটা মঙ্গল হয়, কারণ সেই স্থানের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। বহু পরিবারের একত্র বাসে পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ বলিয়া কিছু নাই, কোনো সমাজ সেখানে গড়িয়া ওঠে না। সেখানে থাকে কেবল সঙ্ঘর্ষ, নিজের নিজের জন্য টানাটানি, পীড়াভোগ এবং পীড়াদান। শিশু এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বহু শিশুর যোগে আত্মরক্ষার, স্বার্থসাধনের এবং সুযোগ পাইলেই অন্যকে পীড়াদানের মানসিক অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। পিতা ইহা যে বুঝিতে পারেন না তাহা নহে। কিন্তু আর্থিক কারণে তাঁহাকে ইহা সহ্য করিতে হয়। পরস্পরের সহিত সত্য-সত্য ঘনিষ্ঠ না হইয়া বহু পরিবার অত্যন্ত কাছাকাছি থাকিতে বাধ্য হইলে, সেইসব পরিবারের শিশুরা সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবারই সম্ভাবনা। শিশুরা শিশু হইলেও স্বাতন্ত্র্য-মুখী, তাহাদের নিজেদের নিজস্বতা আছে। তাহারা সঙ্গী-সাথীদের সহিত খেলাধূলা ভালবাসিলেও, কিছুক্ষণ ধরিয়া নিজের মনে থাকিতে চায়। নিজের মনে থাকার অবসরটুকু প্রত্যেক শিশুর একান্ত প্রয়োজন। এই অবসরটুকুতে সে যেন সকল অভিজ্ঞতা ঠিকঠাক গুছাইয়া লয়। এইরূপ অবসর প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি কামনা করে; অদৃষ্টে না জুটিলে কাহারও নিজস্ব-প্রকাশ বলিয়া কিছু সম্ভব হয় না। শৈশবেও নিজস্ব অবসরটুকু ব্যবহার করিবার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশু ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে অন্তঃকরণের গভীরতা পায় না, তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছু প্রকাশ পায় না। তাহার যদি বিশেষ সামর্থ্য থাকে, সেটিও ঠিকমত বিকশিত হয় না। বহু-পরিবারের জটলা-বাঁধা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সকল শিশুই নিজ নিজ অবসর হারাইয়া বসে।

## পিতৃ-দায়িত্বের অপর দিক

২৫। পিতার আর্থিক দায়িত্বের কয়েকটি উদাহরণ লইয়া সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই, কারণ প্রত্যেকটির আলোচনা সম্ভব নহে। অর্থ-দায়িত্ব ব্যতীত পিতার অন্য দায়িত্বও আছে। সন্তানের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ কেবল অর্থগত আচরণে হয় না। প্রতিদিন নানাপ্রকার ক্ষেত্র উপস্থিত হয় যেখানে শিশুর সহিত তাঁহার গভীর যোগ ঘটিয়া যায় এবং শিশু সেই-সকল যোগের দ্বারা আত্মগঠন করে। মায়ের পরিবেশ যেমন পিতার পরিবেশও তেমনি—স্নেহের ও আদরের পরিবেশ-সৃজনে মাতাপিতার ভেদ নাই। মা স্নেহ করিবেন, পিতাও স্নেহ করিবেন, অর্থাৎ স্নেহ প্রকাশ করিবেন; তবেই শিশুর অন্তরে স্নেহ-স্পর্শ সার্থক হইবে। অনেকের মুখে শোনা যায় যে, মা স্নেহ দিতেছেন, আদর করিতেছেন, পিতার আবার আদর করার প্রয়োজন কি? এ কথাও বিরল নহে যে, পিতার ও মাতার উভয়ের আদর পাইতে থাকিলে শিশু একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিবে, কাহাকেও মানিবে না। পিতার একটা শাসনের ভঙ্গী থাকা দরকার, নহিলে শিশু 'মানুষ' হইবে না। অনেক পিতাকেই এই অভিমত পোষণ করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহার সহিত আরো একটু 'জ্ঞান' যোগ করেন; বলেন যে, শিশুকে আদর করা মেয়েলী ব্যাপার, পুরুষের পক্ষে উহা শোভন নহে। এই-সকল অভিমত যে ভুল তাহা পিতার অন্তরই বলিয়া দিবে। তাঁহারা একবার স্থিরচিত্তে নিজেদের মনের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের অন্তর শিশুর প্রতি স্নেহে পূর্ণ। তাঁহাদের মন শিশুকে আদর করিতে চাহিতেছে। হয়তো ভ্রান্ত ধারণার বশে আদর করার লোভ সংবরণ করিতেছেন, অথবা আর্থিক বা অন্য কারণে চিত্ত এতই বিপর্যস্ত হইয়া আছে যে আদর করিবার মতো শক্তি অবশিষ্ট নাই। শিশুকে আদর করা, স্নেহদান করা, মায়ের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক পিতার পক্ষেও সেইরূপ। পিতৃহৃদয়ের স্নেহ বিভিন্ন ধারায় শিশু-চিত্তে রসসঞ্চার করিবে, ইহার প্রয়োজন আছে।

২৬। স্নেহ প্রকাশ করার ধরন মায়ের একরূপ, পিতার অন্যরূপ। মায়ের স্নেহ-আদর নারীসুলভ, পিতার আদর পুরুষসুলভ। কোন্ কোন্ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, বা কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে আদর করিলে নারীসুলভ হয়, আর পুরুষসুলভ স্নেহ-প্রকাশের নিয়মই বা কী, তাহা কাহারও জানা

নাই। পিতার আদর স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষোচিত হয়, মায়ের আদর স্বভাবতঃই নারীজনোচিত। ইহাতে কাহারও পরামর্শ চলে না। তবে দুই-চারিটি ক্ষেত্র এমন দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে পিতার স্বভাবে নারী-সুলভ ভাব থাকায় তাঁহার আদর করার ধরন মায়ের আদরের সহিত অনেকটা এক হইয়া যায়। এই-সকল ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। পিতার আদরে শিশু যে ভাব দেখিতে ভালবাসে তাহা মায়ের আদরের ভাব নহে। শিশু সেইজন্য পিতার 'মেয়েলী' আদরকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে না। পিতাকে তাঁহার 'মেয়েলী' আদরের কথা জানাইয়া দিলে বিপরীত ফল হয়। পিতা কখনো 'মেয়েলীপনা'র অপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার পুরুষ-গর্বে আঘাত লাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েলীপনার অপবাদ অস্বীকার করেন এবং তিনি যে মোটেই নারী-স্বভাব নহেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অনাবশ্যক কর্কশ ব্যবহার আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট পুরুষ-স্বভাব এবং কর্কশতা একই গুণ। তাঁহার পৌরুষের কর্কশতায় ও আকস্মিকতায় শিশুচিত্ত ব্যথিত বিহ্বল হইয়া যায়, পিতার আদরে আর তাহার বিশ্বাস থাকে না। প্রথমতঃ পিতার মেয়েলী আদর শিশুর ভালো লাগে না, তাহার পর অকস্মাৎ দুর্বোধ্য রূঢ় আচরণ তাহাকে পিতা-বিরোধী করিয়া তুলিতে পারে।

২৭। পুরুষ-চিত্তে মেয়েলীপনা অনেক যুবকের মধ্যেই দেখা যায়। ইহা যৌবনের মোহময় ভ্রান্তি, নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ব্যর্থ কৌশল। যৌবনের আকস্মিকতা পার হইয়া গেলে ইহা আর থাকে না, সাধারণ সামঞ্জস্য ফিরিয়া আসে। ইহারা পিতৃ-জীবনে নারী-স্বভাব প্রদর্শন করিবে না। শৈশবে যদি মেয়েলীপনার অতিরিক্ত প্রভাব সৃষ্ট হয় বা পুরুষ-শিশু যদি কোনো কারণে মাতৃকেন্দ্রিকতা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বয়স্ক-জীবনেও নারীপনার চিহ্ন থাকে। উহা পিতৃ-ভূমিকায় মেয়েলী আচরণে প্রকাশ পায়।

২৮। শিশুর আত্মগঠন দুইটি বিপরীত প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হয়। তাহার মনের সম্মুখে এক দিকে মা এবং নারী-প্রকৃতি, অপর দিকে পিতা ও পুরুষ-প্রকৃতি। মা যতদূর নারী-স্বভাবা হইবেন এবং পিতার পৌরুষ যতটা স্পষ্টভাবে শিশু প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই শিশু নারী ও পুরুষ চরিত্রের মৌলিক বিষয়গুলি অনুভব করিতে পারিবে।

মাতৃ-আচরণে অস্পষ্টতা থাকিলে শিশুর অনুভূতি অস্পষ্ট হয়। পিতৃ-আচরণেও সেইরূপ অস্পষ্টতা থাকিতে পারে, তাহাতে শিশু-চিত্ত পিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারে না। মায়ের চরিত্রে পুরুষ-পনা এবং পিতৃ-স্বভাবে নারীপনা—এইজন্য শিশুর আত্ম-বিকাশে ক্ষতিকর। নারীত্বের পটভূমিকায় পৌরুষ এবং পৌরুষের পটভূমিকায় নারীত্ব যাহাতে ঠিকমত ফুটিয়া ওঠে সেজন্য মাতা ও পিতাকে আপন আপন স্বভাবের বশেই সাধনা করিতে হয়।

২৯। এক শ্রেণীর দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া পিতা রূঢ়তার আচরণ ও অভ্যাস গ্রহণ করেন। অপর এক শ্রেণীর ত্রুটি আড়াল করিবার জন্য পিতা শিশুর প্রতি অতি-স্নেহ প্রদর্শনের অভ্যাস গঠন করেন। মায়ের অতিস্নেহ প্রকাশের হেতু এবং পিতার অতি-স্নেহের হেতু মূলতঃ এক। অতিরিক্ত স্নেহ-প্রকাশের একাধিক কারণের মধ্যে পিতার (এবং মাতার) মনের গোপন কোণে শিশুকে প্রত্যাখ্যান করার কামনাই প্রধান। এইস্থানে মাতৃ-পরিবেশের আলোচনাটি স্মরণ করা যাইতে পারে। অনুরূপ অবস্থায় পিতা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারেন না যে, তিনি আপন সন্তানের শত্রু, এবং তাহার চির-অনুপস্থিতি কামনা করেন। তিনি যে আপন শিশু-সন্তানের শত্রু, আপনার মনের এই গূঢ় ভাবটি আদৌ অবগত নহেন। তথাপি ইহাই মনের তলে থাকিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত শিশুর প্রতি বৈর-সাধন করিতে উস্কানি দিতেছে। তিনি এই বৈর-কামনা হইতে নিজেকে সকল দিকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে শিশুর প্রতি যখন-তখন অস্বাভাবিক 'স্নেহ-প্রকাশ' করিতে থাকেন। অস্বাভাবিক স্নেহ-প্রকাশে তাঁহার মনের গোপন বৈরই প্রকাশ পায়, কোনো পিতাকে ইহা বলিয়া বুঝানো যায় না। অতি-স্নেহ পিতার অতি সতর্কতার অভ্যাস সৃষ্টি করে—পিতা প্রতিক্ষণই শিশুর সর্বনাশ-আশঙ্কায় চিন্তিত থাকেন। অতি-স্নেহ পাইতে থাকিলে শিশুর একাধিক দিকে ক্ষতি হয়। সেই অতিরিক্ত স্নেহ মায়ের নিকট হইতেই আসুক অথবা পিতার কাছ হইতে আসুক, তাহার কুফল একই প্রকার।

৩০। শিশুর প্রতি পিতার গোপন বৈরিভাবের দুইটি কারণ প্রধান। কামভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত তীব্র হইলে শিশুকে তাহার অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে। সন্তানকে সাদরে গ্রহণ করিতে গেলে পিতাকেও মনের দিকে প্রস্তুত হইতে হয়। সন্তান লাভ করিবার পর নূতনভাবে জীবনযাপন

করিবার আহ্বান আসে। অতৃপ্ত কামভোগেচ্ছা লইয়া এই নূতন জীবনে, আনন্দের নূতন রাজ্যে আসা যায় না। শিশু আসিয়া তাহার মায়ের মনের কেন্দ্রস্থলটি একেবারে অধিকার করিয়া বসিবে, ইহার পিতার মনের দিক দিয়া সকল সময় বাঞ্ছিত না হইতে পারে, সহজ না হইতে পারে। শিশু শুধু তাঁহার ভোগের অন্তরায় নহে, সে আর্থিক সচ্ছলতারও অন্তরায়। অর্থের জোরে খ্যাতিলাভের কামনা থাকিলে আরো বিপদ্, সন্তানেরা তাঁহার আর্থিক সামর্থ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ দেয়। পিতা এই দুইটি কারণের অস্তিত্ব মনে মনে অনুভব করিতে পারেন; তবুও তাঁহার মন যে সন্তান-বৈরী হইয়া ইহা তাঁহার ধারণার ও বিশ্বাসের অতীত।

৩১। কাহারও মতে কোনো সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে পিতা অপর সন্তান সম্পর্কে অতি-সতর্ক হইয়া পড়েন এবং একটু অতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা যে সকল পিতার চরিত্রে ঘটিবে তাহার কোনো উঠিয়াছে, স্থিরতা নাই।

## শিশুর পিতৃ-বৈরিতা

৩২। পিতা যেমন সন্তান-বৈরী হইতে পারেন, শিশুও তেমনি পিতৃ-বৈরী হইতে পারে। শিশুর মাতৃ-বৈরিতার কথা মনে পড়ে। পিতৃ-বৈর এবং মাতৃ-বৈর ঠিক একই কারণে উদ্ভূত হয় না, তবে শিশুচিত্তের শক্তি-ক্ষয়ের দিক দিয়া দুইটিই মারাত্মক এবং দুইটির ফলই সুদূরপ্রসারী। শিশু জন্ম হইতে কোনো 'বৈরিতা' লইয়া আসে না। পিতৃ-বৈরিতা শৈশবের একেবারে প্রথম দিকে ঘটিবার কারণ নাই। পিতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি আরম্ভ হয় মাতৃকেন্দ্রিক বয়সের পরে। ইহা আবশ্য অনুমান। পিতার সহিত যখন শিশুর প্রত্যক্ষ যোগ আরম্ভ হয় তখন হইতেই বৈরিতার সূচনা সম্ভব নহে, কারণ তখন যে-কোনো ভালো-মন্দ তাহার মায়ের প্রতি আরোপিত হয়। পিতার শাসন শিশুকে পিতা সম্পর্কে প্রথম বিরুদ্ধ-ভাবের অভিজ্ঞতা দান করে। পিতার নিষেধ, পিতার কঠোরতা, শিশু-চিত্তে পিতৃ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে পারে। শিশুর বয়স অত্যন্ত অল্প থাকিলে পিতৃ-শাসন বা পিতৃ-নিয়ম শিশুর জীবনে প্রযোজ্য হয় না। এইজন্য অতি শৈশবে পিতৃ-বৈরিতার কারণ ঘটে না। পিতৃ-বৈরিতার বয়স যাহাই হউক, পিতার শাসনের সহিত শিশুর নিজের ইচ্ছার সঙ্ঘর্ষ যখন বাধে তখনই পিতৃ-বৈরিতার সূচনা সম্ভবপর হয়। পিতৃ-

শাসন এবং শিশুর খুশি উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিলেই শিশু পিতৃ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিবে, তাহা নহে। এতটুকু কারণেই যদি পিতৃ-বিদ্বেষ সৃষ্ট হইত তাহা হইলে পিতার পক্ষে সন্তান পালন করা বা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু বারে বারে এবং পর পর পিতার দিক হইতে শাসন আসিলে এবং শিশুর মনে পিতা সম্পর্কে ভয় সৃষ্ট হইতে থাকিলে পিতৃ-বৈরিতা ঘটা সম্ভব। পুনঃ পুনঃ শাসনের অন্তরালে পিতার অপরিমিত স্নেহ থাকিতে পারে। অনেক স্নেহের অধিকারী বলিয়াই পিতা বারে বারে শাসন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন 'সন্তানের মঙ্গল হইতেছে', ইহা প্রায়ই ঘটে। শিশু এতসব বুঝিতে পারে না। তাহার বরং ধারণা জন্মায়, পিতা-নামক ব্যক্তিটি তাহাকে ভালবাসে না, তাহাকে দেখিতে পারে না, এবং সেই কারণেই তাহাকে কেবল শাসনের পীড়া দেয়। ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকিবে, পিতা তাহাকে পীড়াই দিতে পারে, অতএব পিতা শত্রু। এই ধারণার মাঝে মাঝে আবার পিতার স্নেহ-প্রকাশ দেখিতে পায়—পিতা তাহাকে আদর করিতেছেন, গৃহে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত আদরের ব্যবহারই করিতেছেন, ভাই-বোন ও অন্যান্য শিশুও পিতার স্নেহ হইতে তেমন বাদ পড়িতেছে না। এই দ্বিবিধ ধারণার প্রভাব শিশু-চিত্তে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। তাহার মনে হয়, তাহার পিতা তাহার শত্রু, অতএব সেও তাঁহার শত্রু। আবার মনে হয়, পিতা স্নেহময়, তিনি ভালবাসেন, সুতরাং পিতাকেও সে ভালবাসে। তাহার অন্তরের দ্বন্দ্বে যে ভাবটি প্রাধান্য লাভ করে তাহাই তাহার আচরণে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। মনের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট হইলে শিশু পীড়া অনুভব করিতে থাকে। এই পীড়া হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে, মাতৃ-পরিবেশে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, নিজের ধারণাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলে; এক ভাগে থাকে পিতার প্রতি বৈরীভাব, অপর দিকে থাকে পিতার প্রতি ভালবাসা। সে পিতার বৈরী, ইহা তাহার শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতির বিরোধী। সুতরাং সে পিতাকে তাহার চিত্তের ভালবাসার দিকে স্থাপন করে—এখন পিতা তাহার বৈরী নহেন, তিনি শিশুর ভালবাসার পাত্র। বৈরী হিসাবে শিশুমন পিতার অনুরূপ যে-কোনো ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া দেয়, আর ভাবে এই ব্যক্তিই তাহার শত্রু। এই ভাবে নিজের হৃদবোধ ভাগ করার ফলে শিশুর নিকট অনেক সময় অনেক পুরুষ-ব্যক্তি অকারণে বিরক্তি-ভাজন হন। অভাগা শিক্ষকের অদৃষ্টেও এ দুর্ভোগ ঘটিতে পারে।

৩৩। পুনরায় উল্লেখ করা নিরাপদ্ যে, শিশু এই সকল ব্যাপার নিজে কিছুই বুঝে না। অথচ তাহারই মন পিতা সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা গ্রহণ করিতেছে, নিজের ধারণাকে সুবিধামত ভাগ করিয়া দিতেছে, পিতাকে ভালবাসার আসনে বসাইতেছে, আর দুর্ভাগ্য কোনো পুরুষকে অযথা বৈরী মনে করিতেছে। শিশু এত যে করিতেছে, সব না জানিয়া।

৩৪। পিতার শাসন বা কঠোরতা ছাড়াও আর-একটি বিশেষ কারণে শিশু পিতৃ-বৈরী হইতে পারে। শিশু মাকে একেবারে নিজের করিয়া রাখিতে চাহে। পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে ইহা হয়তো একটু স্পষ্ট; নারী-শিশুর ক্ষেত্রেও তাই বলিয়া ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। মায়ের প্রতি একাধিপত্য করিবার পথে শিশু কাহারও বাধা মানিতে চাহে না। পিতা যদি শিশুর সম্মুখে তাহার মায়ের সহিত সপ্রেম ব্যবহার করেন বা একটু অধিক মনোযোগ দেন, অথবা মা পিতার প্রতি অধিক মনোযোগ দেখান, তাহা হইলেই শিশু বিচলিত হয়। সে পিতার আচরণে নানাভাবে প্রতিবাদ করে। পিতার কঠোরতায় তাহাকে প্রায়ই হার স্বীকার করিতে হয়, অথচ মাকে সম্পূর্ণতঃ পাওয়ার অন্তরায় তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। ইহাতে ক্রমশ পিতৃ-বৈরিতা সৃষ্ট ও পুষ্ট হইতে পারে। মায়ের উপর দখল সাব্যস্ত করিবার গূঢ় চেষ্টায় (ভাবিয়া-চিন্তিয়া তো নয়ই, স্বভাব হইতে) শিশুর কাঁদুনে হইয়া পড়া, অসুস্থ হওয়া, অসম্ভব নয়।

৩৫। অনেকের মতে পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রেই পিতৃ-বৈরিতা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। নারী-শিশুর অন্তরে যেমন মাতৃ-বৈরিতার সৃষ্টি হইতে পারে, পুরুষ-শিশুর অন্তরেও তেমনি মাতৃ-বৈরিতা থাকিতে পারে। পিতৃ-বৈরিতার ব্যাপারে খোকাখুকুর আচরণে একটু যেন পার্থক্য দেখা যায়।

৩৬। পিতৃ-বৈরিতার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ একাধিক দিকে আঘাত পায়। শিশু তাহার মঙ্গলকামী শিক্ষককে শত্রুভাবে গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষককে বৈরীরূপে খাড়া করিয়া সে অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়া হইতে অব্যাহতি পায় বটে, কিন্তু শিক্ষকের দান হইতে সে বহুলভাবে বঞ্চিত হয়। তাহার ভবিষ্যতের সার্থকতা শৈশব হইতেই বাধা পায়। পিতার বিচার-শক্তি শিশু অপেক্ষা অধিক, একথা শিশু যে ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারে না, তাহা নহে। তথাপি অন্তরের গোপন পিতৃ-বৈরিতার জন্য সে পিতার অনুমোদিত কোনো পথ সহজে গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহার ইচ্ছা পিতার আদেশ পালন করে, অথচ কেমন করিয়া যেন তাহার সেই কার্য

অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত থাকিয়া যায়। পিতা সন্তানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, সন্তানও সাধ্যমত পিতার ইচ্ছা অনুসরণ করিতে শ্রম করিতেছে—তথাপি কোনো অদৃশ্য শক্তি সব বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে। এই অদৃশ্য শক্তিটি সন্তানের গোপন বৈরিতা। শিশু যখন বড় হয় তখন তাহার মন পিতার পরামর্শ গ্রহণ না করিবার জন্য নানপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে। আসলে তাহার অন্তরের নিভৃত স্থান হইতে এক বাধা আসে। সেই বাধার জন্যই পিতার পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়া উঠে না। বড় বয়সে পিতৃ-বৈরিতা ( বা মাতৃ-বৈরিতা ) সৃষ্ট হইতে পারে না, তাহা নহে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবের বৈরিতাই এই-সকল বিরুদ্ধতার মূল কারণ।

৩৭। শৈশবের পিতৃবৈরিতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে। কোনো কোনো ব্যক্তি সমাজের বা রাজ্যের বিধি-নিষেধ প্রথা অনুশাসন প্রভৃতি অবজ্ঞা করিতে ভালবাসেন। সত্য সত্য কোনো যুক্তির কৈফিয়ত তাঁহার থাকে না, কোনো বিশেষ বিশ্বাসও ইহার মূলে থাকে না, থাকে কেবল অমান্য করার অনিবার্য প্রবৃত্তি। এইরূপ অসামাজিক আচরণের গভীর কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে শৈশবের পিতৃ-বৈরিতা ইহার মূলে রহিয়াছে বোঝা যায়। পিতৃ-বৈরিতাই একমাত্র কারণ না হইতে পারে। তবু ইহার গোপন প্রভাব অহেতুক সমাজ-বিরোধিতার মধ্যে বর্তমান। অযথা নেতৃস্থানীয় বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপমান, পিতা যে বৃত্তি-জীবী ছিলেন বা যে কাজ করিতেন সেই কাজের প্রতি এবং যাঁহারা সেই কাজ করেন তাঁহাদের প্রতি অযৌক্তিক অবজ্ঞা, কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কর্মীদের প্রতি যুক্তিহীন ক্রোধ এবং এই শ্রেণীর বহুপ্রকার আচরণের মূলে শৈশবের পিতৃ-বৈরিতা থাকার সম্ভাবনা।

## সাধারণ কথা

৩৮। পিতৃ-পরিবেশে শিশুর কোনো বৈরিতার সৃষ্টি যেন না হয়, দারিদ্র্যের পীড়ায় শিশু-চিত্ত যেন দলিত হইতে না পারে, সেদিকে পিতার দৃষ্টি থাকা একান্ত দরকার। পিতার করণীয় কি তাহা ক্ষেত্র-অনুসারে বিধেয়, কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম বাৎলানো যায় না। তবে একটি কথা সকল সময়ে স্মরণে রাখা উচিত, পিতার হৃদয় শিশু-স্নেহে পূর্ণ থাকা চাই এবং তাহার সংযত প্রকাশও চাই। ইহাতেই যথাসাধ্য করণীয়ের অধিকাংশই প্রতিপালিত হইবে।

## আলোচনা-সূত্র

১। মাতৃ-পরিবেশের সহিত পিতৃ-পরিবেশের সাদৃশ্য অনেক। আলোচনা করুন।

২। মাতৃ-পরিবেশের যেমন প্রয়োজন পিতৃ-পরিবেশও তেমনি প্রয়োজনীয়। ইহা সমর্থনযোগ্য কিনা বিবেচনা করুন।

৩। নারীত্বের বা পুরুষত্বের ভিত্তি গঠিত হয় শৈশবে এবং সেই ভিত্তিগঠনে পিতার পরিবেশ অপরিহার্য। আলোচনা করুন এই উক্তি কতদূর সত্য।

৪। শিশু পিতৃহীন হইলেও তাহার চিত্ত পিতৃ-পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতে পায় না কেন?

৫। পিতৃহীন শিশুর চিত্তে পিতৃ-পরিবেশের সৃষ্টি করিতে মা কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন?

৬। পিতা নিজে সংযত-চিত্ত হইলে শিশুর ভবিষ্যৎ শুভ হওয়ার সম্ভাবনা। আলোচনা করুন।

৭। পিতার আর্থিক প্রভাব ও শিশুর দেহ-চিত্ত-বিকাশ—এই লইয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৮। শিশুর ঐশ্বর্য চতুর্দিকে—ফুল লতা পাতা পাথর মাটি প্রভৃতি অতি তুচ্ছ জিনিসও তাহার নিকট অমূল্য সম্পদ। অথচ দারিদ্র্যও শিশু-চিত্তের অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। এরূপ কেন হয়?

৯। দারিদ্র্যে শিশুর সর্বাধিক ক্ষতি ঘটে কোন্ দিকে? আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

১০। ক্ষুদ্র গৃহে বৃহৎ পরিবার বাস করিতে বাধ্য হইলে শিশুর মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?

১১। বৃহৎ পরিবার শিশুর আত্ম-বিকাশে সাহায্যও করে, ক্ষতিও করে। আলোচনা করুন।

১২। শিশুর সহিত পিতার আচরণ স্নেহসিক্ত হওয়া চাই। পিতার দৈনন্দিন আচরণে স্নেহের প্রকাশ কিভাবে হওয়া উচিত, তাহা উদাহরণ-যোগে বুঝাইয়া দিন।

১৩। শিশুর সম্মুখে পুরুষের মেয়েলীপনা ক্ষতিকর কেন? পুরুষচিত্তে নারী-সুলভ অশোভন ভাব কখনো কখনো দেখা দেয়, ইহার দু-একটি কারণ বিবৃত করুন।

১৪। শিশু-সন্তানের প্রতি সাধারণতঃ রূঢ় আচরণ করার অভ্যাস অনেক পিতারই আছে। ইহাতে শিশুর কি ক্ষতি হয়?

এইরূপ রূঢ় আচরণের অভ্যাস সাধারণতঃ কি কি কারণে গঠিত হইতে পারে?

১৫। শিশু পিতৃ-বৈরী হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ কি? শিশু কি জানে যে, সে পিতার উপর বৈরভাব পোষণ করিতেছে?

১৬। শিশু অনেক সময়ে বিনা কারণে কোনো পুরুষ বা নারীর সহিত শত্রুভাবে ব্যবহার করে। পিতা বা মাতা কি এই 'অকারণ' বৈরভাবের কারণ? আলোচনা করুন।

১৭। শৈশবের পিতৃবৈরিতা ভবিষ্যতের সামাজিক জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে?

১৮। পিতার প্রতি শিশুর সুস্থ মনোভাব গঠন করিতে হইলে পিতার দিক হইতে কি করা কর্তব্য, কিভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন করা আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৯। শিশু-সন্তানের প্রতি পিতার কর্তব্যপালনের প্রধান অন্তরায় কি?

# পিতা-মাতা

## পটভূমি ও প্রভাব

১। মাতৃ-পরিবেশে শিশুর বিকাশ এবং পিতৃ-পরিবেশে শিশুর বিকাশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করায় একদিকে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে। এমন কি, সেই দিকটি দৃষ্টির বাহিরেই থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। মাতৃ-যোগে শিশু আত্মগঠন করে বলিলে এরূপ বুঝা ঠিক হইবে না যে, শিশুর মনের নিকট মা একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি ব্যক্তি এবং শিশু সম্পূর্ণ একাকিনী মাকে অন্তরে গ্রহণ করিতেছে। শিশুর স্তন্যপানকালে শিশুর দেহে মাতৃস্তনের স্পর্শই কেবল জাগে না; তাহার দেহে এবং অস্ফুট মনে আলো বাতাস ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বিচিত্র স্পর্শ লাগে। শিশু কোনো কিছু পৃথক পৃথক করিয়া উপলব্ধি করে না। তাহার আত্মগঠনে আলো বাতাস প্রভৃতি এবং মাতৃস্তন যুগপৎ ব্যবহৃত হয়। তাহার দেহে-চিত্তে যখন মাতৃস্তন প্রভাব বিস্তার করে, তখন চতুর্দিকের আলো-বাতাসও অন্যান্য বহু বস্তুর মধ্যে মাতৃস্তনকে রাখিয়া, মিলাইয়া, তবেই সে উহা ধারণায় গ্রহণ করে। স্তন্যপানের পারিপার্শ্বিক বহু-কিছুর পটভূমিকায় মাতৃস্তনই তাহার নিকট প্রধান হইয়া উঠে বলিয়া স্তন-পরিবেশের আলোচনা করাই সংগত। আনুষঙ্গিক যে-সকল বস্তু ( এবং অবস্থা ) শিশু-চিত্তে মাতৃস্তনকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাদের পৃথক পৃথক প্রভাবের বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। কোনো চিত্রের প্রধান বিষয়টিকে ঠিকমত দাঁড় করাইতে গেলে বহু বিষয়ের মধ্যে তাহাকে দাঁড় করাইতে হয়। প্রচণ্ড ঝড়ের চিত্রে ধূলি-লুণ্ঠিত বৃক্ষাদি, অসহায় পশুপক্ষী, ধূলি-আচ্ছন্ন আকাশ, কোনোটিকে বাদ দিয়া ঝড়কে সম্পূর্ণ অনুভব করা যায় না। সবগুলি মিলাইয়া তবে একটি 'বিশেষ'কে প্রকাশ করা সম্ভব হয় ও চিত্তে গ্রহণ করা সার্থক হয়। শিশু-চিত্ত যখন মাতৃস্তনের প্রতিরূপ গঠন করে, তখন তাহার মনে জাগে আলো-বাতাসের সহিত মিলানো মাতৃস্তনের রূপ। আলোক বাতাস প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রতিরূপ তাহার মনে উদিত হয় না। আমরা ঝড়ের চিত্রে 'ঝড়'ই দেখি—বৃক্ষ, ধূলি, পশু, পক্ষী কিছুই পৃথকভাবে দেখি না। অথচ বৃক্ষ, ধূলি, পশু-পক্ষী—সব যে দেখি না, তাহাও নহে। সেইরূপ শিশুর দেহে-চিত্তে মাতৃস্তনের ভাব যখন শিশু গ্রহণ করে তখন আলো-বাতাসের স্পর্শও সে গ্রহণ করে, অথচ ঠিক প্রভাবরূপে সে গ্রহণ করে

মাতৃস্তনকেই। মাতৃস্তনের বেলায় যে কথা, সমগ্র মাকে ধারণা করিবার যখন সময় হয়, সে সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। মাকে যখন শিশু গ্রহণ করে এবং সমগ্র মা তাহার মাতৃ-পরিবেশ হইয়া ওঠেন, তখন পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি ব্যক্তি এবং আলো বাতাস বাগান বাড়ি ঘর প্রভৃতি বস্তু ও অবস্তু মাতৃ-পরিবেশের পটভূমি-রূপে কাজ করে। শিশু এইগুলির মধ্যে মাকে অনুভব করিতে থাকে, এগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে তাহার মাকে পায় না। পিতাকে অবলম্বন করিয়া শিশুর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রেও এই মূল সত্যটির ব্যতিক্রম নাই। শিশু তাহার পিতৃ-যোগে কেবল পিতাকেই পায় না, পিতার পটভূমি-স্বরূপ যাহা-কিছু রহিয়াছে, তাহাও গ্রহণ করে। মায়ের বা পিতার পটভূমি-রূপে যাহা-কিছু তাহার দেহে-চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা মায়ের বা পিতার বাহিরে থাকিয়া শিশু-চিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দাগ কাটিতে পারে না।

২। এই স্থানে আর একটু কথা আছে। শিশুর মায়ের বা পিতার পারি-পার্শ্বিক বস্তু বা অবস্তুর মধ্যে কোনোটিকে শিশু যে পৃথকভাবে অনুভব করিতে পারে না, তাহা নহে। ভ্রাতা-ভগিনীকে শিশু মাতৃ-পরিবেশের পটভূমিরূপে যেমন দেখিতে পারে, আবার মাকে পটভূমিরূপে রাখিয়া ভ্রাতাকে বা ভগিনীকে অনুভব করিতে পারে। আসল কথা হইল যে, শিশু কোনো-কিছুকেই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার পরিবেশরূপে ব্যবহার করে না। কোনো ব্যক্তি বা অন্য কিছু এক এক সময়ে প্রধান হইয়া উঠিয়া শিশু-মনের নিকট পরিবেশ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য যাহা-কিছু সবই পটভূমির ন্যায় পরোক্ষ হইয়া পড়ে। এইজন্য পিতৃ-পরিবেশে পিতার সহিত মাকে দেখা স্বাভাবিক এবং মাতৃ-পরিবেশে মায়ের সহিত পিতাকে দেখা আবশ্যক। এইভাবে ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মাঝখানে মাতৃ-যোগ বা পিতৃ-যোগ ঘটিতে থাকিলে তবেই শিশুর আত্মগঠন যথার্থভাবে পূর্ণতামুখী হইতে পারিবে।

## পারস্পরিক সম্বন্ধ

৩। গৃহে মা আছেন, পিতা আছেন, হয়তো ভ্রাতা ভগিনী এবং আরো অনেকে রহিয়াছেন। বাগান, পুষ্করিণী, খেলনা, অলঙ্কার, ছবির বই অথবা ভাঙা কুঁড়ে, দারিদ্র্য, রোদন প্রভৃতি রহিয়াছে। সমস্ত-কিছু লইয়া শিশুর

মাতৃ-পরিবেশ বা শিশু-পরিবেশ। শিশুর চিত্তে সমস্ত বস্তু-অবস্তুর তুলনায়, সকল সম্বন্ধের তুলনায়, মাতাপিতার পারস্পরিক সম্বন্ধটিই সর্বপ্রধান প্রভাব দান করে। শিশু পিতার সম্বন্ধে মা'কে দেখিয়া যেভাবে প্রভাবান্বিত হয়, গৃহে ভ্রাতা-ভগিনী বা অপর কাহারও সম্বন্ধে মা'কে তত গভীরভাবে অনুভব করে না। পিতার পরিবেশও মায়ের সম্পর্কেই সার্থক হয়; শিশুর পক্ষে অন্য কোনো সম্পর্কে পিতাকে ততখানি গভীর করিয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। শিশু-চিত্তে ভ্রাতা-ভগিনী পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতি মাকে স্পষ্ট ও বিচিত্র করিয়া তোলেন, সে কথা ঠিক। তবু পিতা না থাকিলে মায়ের কয়েকটি বিশেষ দিক ফুটিয়া ওঠে না; সেইরূপ মা না থাকিলে অপর কাহারও প্রভাবে পিতৃ-পরিবেশ বিশেষ বিশেষ দিকে সার্থক হইতে পারে না। এইজন্য মাতা-পিতাকে শিশুর আত্মবিকাশের প্রথম দুই-চারিটি বৎসর একসঙ্গে পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

৪। মাতাপিতাকে এক সঙ্গে পাইলে তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটি শিশু-চিত্তে এমনভাবে কাজ করে যে, অন্য সব সম্বন্ধ তাহার নিকট সামান্য হইয়া যায়, শিশু বড় হইলে ক্রমশ বৃহত্তর পরিবেশের বিবিধ সম্বন্ধের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় মাতাপিতার পারস্পরিক সম্বন্ধটিই গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। শিশু-চিত্তে মাতাপিতার নিজেদের সম্বন্ধটি কখনো অতি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে, কখনো পরোক্ষভাবে শিশুর আত্ম-গঠনে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন সম্ভব নহে বলিয়া কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

৫। মাতাপিতার মধ্যে মধুর সম্বন্ধ বিরাজ করিলে শিশুমনে একটা 'অহেতুক' আনন্দের সৃষ্টি হয়। মধুর ভাব তাহার প্রতিক্ষণের আচরণে আপনা-আপনি প্রকাশ পায়। শিশুর মনে সম্মুখে মাতাপিতা পরস্পরের প্রতি যে-সকল আচরণ প্রত্যাচরণ করেন তাহাতে এক প্রকার আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, শিশুর আচরণে সেই মাধুর্যগুণ আসিয়া যায়। শিশুর আচরণ মধুর ও শোভন করিতে হইলে উপদেশে প্রায়ই কাজ হয় না, কাজ হয় তাহার সম্মুখে মধুর আচরণের দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকিলে। মায়ের মধুর আচরণের শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ্য শিশু এবং শিশুর পিতা। পিতার কোমলতম ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র শিশু এবং তাহার মা। শিশুর নিকটতম পরিবেশ তাহার মা ও তাহার পিতা। সেই কারণে তাঁহাদের মধ্যে যাহা-কিছু ঘটে, তাহাই শিশুর মনকে

আকর্ষণ করে এবং মাতাপিতার প্রতি শিশুর ভালোবাসা প্রবল হইলে এই আকর্ষণও প্রবল হয়। মাতা পিতার প্রতি যে আচরণ করেন, তাহাতে প্রেমের মাধুর্য এতটুকু প্রকাশ হইলেই শিশু-চিত্ত সেই আচরণে আকৃষ্ট হয় এবং মাধুর্যের ও আনন্দের স্বাদ পাইতে থাকে। অন্যের প্রতি মায়ের মিষ্ট ব্যবহার শিশুকে এতখানি স্পর্শ করিতে পারে না। পিতার আচরণ মায়ের প্রতি কোমল হইলে, সেই কোমলতা সহজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে, অথচ অপর ব্যক্তির প্রতি পিতার অতি-কোমল ব্যবহারও তেমনি আনন্দ জাগাইয়া তোলে না। ইহার কারণ বোধ করি শিশুর নিকট মাতাপিতার অতুলনীয় নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা। শিশুর মনে মাধুর্যের, মিষ্টতার, গোড়াপত্তন করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন মাতা ও পিতার পারস্পরিক ব্যবহারে মধুরতার প্রকাশ। শিশুর অন্তরে মাধুর্যের রস সৃষ্টি করিবার তিনটি ধারা আছে, এই তিনটি ধারাই প্রধান। শিশুর প্রতি মায়ের মধুর আচরণ, শিশুর প্রতি পিতার মধুর আচরণ, এবং মাতাপিতার নিজেদের মধ্যে আনন্দপূর্ণ আচরণ। মাতা-পিতার পারস্পরিক মধুরতাই প্রধানতম বলা চলে। কারণ, মাতা ও পিতার মধ্যে আনন্দ-সম্বন্ধ না থাকিলে শিশুর প্রতি মধুর আচরণ করা মাতার পক্ষে এবং পিতার পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না, বারেবারেই শিশুর আব্দারে ও খেয়াল-খুশির ব্যবহারে তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মাতাপিতার পারস্পরিক সম্বন্ধটি শিশু-চিত্তে মাধুর্যধারা সৃজনের প্রধান হেতু; তাঁহাদের সম্বন্ধ যত অন্তরঙ্গ ও আনন্দদায়ক হইবে, শিশুর প্রতি তাঁহাদের আচরণও ততই মধুর হইয়া উঠিবে এবং শিশু ততই আপন স্বভাবকে মধুর করিয়া তুলিতে পারিবে।

৬। মাতাপিতার মধ্যে আনন্দ-সম্বন্ধ থাকিলে বাহিরের আঘাত হইতে গৃহের পরিবেশ অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত থাকে। সমাজের নিন্দা, প্রতিবেশীর হিংসা, গৃহের ভিতর জ্ঞাতি-বন্ধুর বিদ্রূপ, কোনো-কিছুই মাতা-পিতাকে সহজে অস্থির অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে না—সকল আঘাতই মাতা-পিতার পারস্পরিক প্রেমের আনন্দের জাদুতে যেন ক্ষীণ দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শিশু শান্তির পরিবেশে বিকশিত হইতে থাকে। এমন-কি দারিদ্র্যের পেষণও মাতাকে পিতাকে এবং শিশুকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারে না। শিশুর জীবনে মাতা-পিতার মিলিত স্নেহ এবং মিলিত চেষ্টা শুধু যে তাহাকে দারিদ্র্য হইতে এবং বাহিরের অমঙ্গল-প্রভাব হইতে

রক্ষা করে তাহা নহে, তাঁহাদের মিলিত চেষ্টার মধ্যে অন্তরের যে ঐক্য প্রকাশ পায় এবং যে ঐক্য ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে, শিশু তাহা আপন অন্তরে সকলের অলক্ষ্যে গ্রহণ করে, নিজেকেও সেই ঐক্যের সহিত মিলাইয়া লয়। শিশু যখন একটু বড় হয় তখন তাহার অন্তরে মাতা-পিতার চেষ্টার সহিত নিজের চেষ্টা মিশাইবার এক প্রেরণা জাগ্রত হয়, তখন মাতা পিতা শিশু যেন একটি স্বরে বাজিতে থাকে। বোধ করি শিশু-জীবনে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিতে অন্য কিছু নহে, ইহাই শিশুর শ্রেষ্ঠ আত্মগঠন। ইহাকে অবলম্বন করিয়া শিশুর পরবর্তী জীবন ও চরিত্র যে-কোনো দিকে বিকাশের শেষ সীমায়, উৎকর্ষের চরমে পৌছিতে পারে। মাতা ও পিতার মধ্যে এই মিলিত চেষ্টার মূল কথা তাঁহাদের পরস্পরের প্রেমমাধুর্য। বিপদের সময়ে বা কষ্টের সময়ে শত্রুরাও পরস্পর মিলিত হয়। শত্রুদের বা অ-বন্ধুদের এই মিলন অত্যন্ত সাময়িক, একান্তই উপরকার ব্যাপার, কূটনৈতিক চুক্তির ন্যায় বাহিরের চাপে সৃষ্ট। মাতাপিতার যে চেষ্টা শিশুকে সকল আঘাত হইতে রক্ষা করে এবং তাহার অন্তরে নূতন প্রেরণা দান করে, তাহা বাহিরের সাময়িক চুক্তি নহে ; তাহা মাতা-পিতার স্বভাবের প্রকাশ, স্বভাবসংগত প্রেমের পরিচয়।

৭। শিশুর আত্মগঠনের সময় পরিবেশে শান্তি বিরাজ করা চাই। বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময়ে যদি ক্রমাগত তাহাতে নানা দিক হইতে টান পড়ে, আঘাত আসে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, আকাশে মাথা তুলিতে পারে না। শিশুর আত্মবিকাশে ছন্দোহীন আকস্মিকতা ও অশান্তির পীড়ন অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাহার প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক উপায়ে সুষম অবস্থায় আসিতে পারে না, ক্রমাগত অনিশ্চয়তার আঘাতে বিপর্যস্ত হইতে থাকে। ফলে যে-সকল গুণ তাহার চরিত্রে স্পষ্ট হইতে পারিত, তাহা সম্ভব হয় না। শিশুর পরিবেশকে সদাসর্বদা অশান্তি ও আকস্মিক পরিবর্তন হইতে রক্ষা করা পিতার এবং মাতার কর্তব্য। কিন্তু কর্তব্য থাকিলেই পালন করিবার সুযোগ থাকিবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা এ সংসারে কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। মাতা-পিতা শত চেষ্টাতেও সকল অশান্তি দূর করিতে পারিবেন না, আকস্মিকতার আঘাত ব্যর্থ করিতে পারিবেন না। শিশু-চিত্তে কিছু ক্ষতি হইবে। তথাপি, অশান্তির তীব্রতা খর্ব করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত নহে,

আকস্মিকতার বিপর্যয়কে মৃদু করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে শান্তি ও চিন্তার মিল থাকিলে গৃহ-পরিবেশ অনেকখানি রক্ষা পায়। তাঁহাদের শান্তিতে গৃহে সহনশীলতা ক্ষমা ও দৃঢ়তার গুণ অল্পাধিক প্রতিষ্ঠিত হয়ই। কারণ, তাঁহারাই গৃহের প্রধান নিয়ন্তা, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গৃহের পরিবেশ তাঁহাদেরই মতে সৃষ্ট হইবে। শিশু তাহার মাতা-পিতার প্রভাবে গৃহের শান্ত পরিবেশে বিকশিত হইতে পাইবে। তবে, মাতা-পিতার মধ্যে শান্তির অর্থ পরস্পর উদাসীন থাকা নহে। পিতা মাতার খেয়ালখুশিতে কিছুই বাধা দেন না, মাও পিতার যদৃচ্ছাচরণে কোনো অমত প্রকাশ করেন না, এরূপ অবস্থাতেও একপ্রকার 'শান্তি' তাঁহাদের মধ্যে থাকে। ইহা প্রকৃত শান্তি নহে, অন্তরে অশান্তি পোষণ করিয়া বাহিরে পরস্পরকে কোনোরকমে সহ্য করিয়া যাওয়া মাত্র। ইহার প্রচ্ছন্ন অশান্তি ও অনৈক্য গৃহ-পরিবেশে চাপা বিরোধ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, শান্তি-সৃষ্টি তো দূরের কথা। নালী ঘায়ের মতো এরূপ হৃদয়-ক্ষতের যে ক্ষতি তাহা আরো গভীর, আরো দূরপ্রসারী। (খোলাখুলি বিরোধ হয়তো ইহার চেয়ে ভালো।) ইহাতে শিশুর চিত্ত শান্তি অনুভব করে না, কেমন যেন সব শ্বাসরোধকর 'চাপা' 'ছাড়-ছাড়' ভাব সে বুঝিতে পারে। সুতরাং মাতা-পিতার শান্তি অন্তরের গভীর শান্তি হওয়া চাই, তবেই শিশুর উপকার।

৮। শিশুর সম্মুখে দুইটি প্রধান প্রভাব রহিয়াছে—তাহার মাতা ও পিতা। এই দুইটি প্রভাবের মধ্যে বিরোধিতা ঘটিলে শিশু-চিত্তে সঙ্কট দেখা দেয়। সে মাকে ভালবাসে, সে পিতাকেও ভালবাসে। কাহারো প্রভাব তাহার মন অস্বীকার করিতে পারে না। তাহার মনে পীড়া আরম্ভ হয়, দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একবার পিতাকে, একবার মাতাকে তাহার মন অনুসরণ করে। একটি সবল চরিত্র-গঠনের পক্ষে ইহা বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। মাতা-পিতার মধ্যে মতানৈক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তাঁহারা কেহই কাহারও অনুকৃতি নহেন। তাঁহাদের বিচার-শক্তি পৃথক্, অনুভব-ক্ষমতা পৃথক্, তাঁহাদের ধারণাও পৃথক্। মাতাপিতার মধ্যে এই স্বাভাবিক পার্থক্য দূর করিবার দুইটি পথ। একটি পথ প্রায় প্রতি গৃহেই দেখা যায়। সেটি আর কিছুই নহে, পিতার নিকট মায়ের নতি-স্বীকার এবং পিতার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে দিয়া চুপ করিয়া সহিয়া যাওয়া। মায়ের দিক হইতে আপন মত প্রকাশ না করিবার প্রথা অনেক সমাজেই আছে। (কোনো কোনো গৃহে ইহার বিপরীতও ঘটিতে

পারে, সেখানে জবরদস্ত মায়ের নিকট পিতাকেই আপনার মতামত গোপন করিতে হয়।) এই পথ ঠিক নহে, কারণ ইহার দ্বারা গৃহে ক্রমশ অশান্তি ঘটিতে থাকে এবং মাতা-পিতার ভিতরকার অনৈক্যটি ক্রমশ প্রকাশ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পথটি মাতা-পিতার প্রীতির পথ, সাধনার পথ। ইহাতে তাঁহারা যুক্তির দ্বারা, প্রীতির দ্বারা পরস্পরকে পরিবর্তিত করেন এবং শিশুর জন্য একটি মত দুইজনেই অন্তর দিয়া সমর্থন করেন। শিশু তখন মাতা ও পিতা উভয়েরই সমর্থিত মতটি নিজের সম্মুখে পায় এবং তাহাই নিজের বিকাশের জন্য ব্যবহার করে। এইরূপে মতের ঐক্য সাধন করিতে না পারিলে, শিশুর মনের সম্মুখে দুইটি বিরুদ্ধ প্রভাব উপস্থিত করিলে, শিশু ক্রমশ পিতাকে অথবা মাতাকে ছোট করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিবে এবং মাতৃ-স্নেহে অথবা পিতৃ-স্নেহে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। শিশু মাতার অথবা পিতার আচরণে স্নেহ-মাধুর্য হারাইবে এবং মাতা-পিতার পারস্পরিক বিরোধিতায় পীড়া বোধ করিতে থাকিবে। মতের ঐক্য সাধন করিতে পারিলে এইসকল অমঙ্গল ও পীড়ার সৃষ্টি হয় না। তথাপি, প্রতি পদক্ষেপে মাতা-পিতার মতামতের আদর্শ মিল হওয়া দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য শিশুকে বহু বিষয়ে স্বাধীনভাবে আত্মগঠন করিবার সুযোগ দিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুকে স্বাধীনভাবে চলিবার সুযোগ দিতে গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মাতা-পিতার জ্ঞানে ও বিশ্বাসে অনৈক্য হইতে পারে। এইসকল ক্ষেত্রে মাতাকে অথবা পিতাকে অপরের মত সমর্থন করিতেই হইবে, অন্তরে সেই মতের পূরা সমর্থন হয়তো থাকিবে না। তথাপি শিশুকে কোনোমতেই মাতা-পিতার বিরুদ্ধ মতামতের দ্বন্দ্ব-আবর্তে টানিয়া আনিতে নাই। মাতা-পিতার মধ্যে যদি অকৃত্রিম প্রীতি ও মধুর সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতানৈক্য কাহারও পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে না এবং ইহাদের সংখ্যাও দিনে দিনে কমিয়া আসিবে। দীর্ঘদিন মাতা-পিতার প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকিলে মতানৈক্যের উপলক্ষ্য খুবই কমিয়া আসে। একটু-আধটু মতবিরোধ মাতা-পিতার বাস্তব জীবনে থাকিবেই। শিশুর পক্ষে নিশ্চয়ই তাহা আদর্শ পরিবেশ নহে। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে, মূলতঃ যেখানে মিল ও ঐক্য রহিয়াছে সেখানে তুচ্ছ অমিল অতি সামান্য ক্ষতিই করিতে পারে, সেখানে আশঙ্কার কিছু নাই। অথবা এমনও কেহ বলিতে পারেন, যেখানে মাতা-পিতার মধ্যে প্রীতি স্থায়ী ও গভীর, কল্যাণেচ্ছা একাগ্র ও একমুখী,

সেখানে খুঁটিনাটি একটু-আধটু অমিল তাঁহাদের বিশিষ্ট চরিত্রের বা স্বাতন্ত্র্যের দ্যোতক মাত্র—শিশুর পক্ষে তাহারও একটি বিশেষ কল্যাণকর প্রভাব ও শিক্ষা থাকিতে পারে। তবে মাতা-পিতার মধ্যে সত্যকার প্রেম ও মাধুর্য থাকা চাই।

## পারস্পরিক পটভূমিকা

৯। পিতার সহিত মাকে দেখা এবং মায়ের সহিত পিতাকে দেখা শিশুর নিকট মাতৃ-পরিবেশের এবং পিতৃ-পরিবেশের বিশেষ দিক, মনোবিশ্লেষণের ধারণা পিতার পটভূমিকায় মাকে এবং মায়ের পটভূমিকায় পিতাকে অনুভব করিয়া শিশু তাহার ভাবী দাম্পত্য-জীবনের একরূপ আদর্শ গ্রহণ করে। শিশু শিশু হইলেও নিতান্ত নির্বোধ নহে। সে অল্প বয়সেই ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয়-আত্মীয়া প্রভৃতির মধ্যে অদ্ভুত উপায়ে তাহার মায়ের সহিত তাহার পিতাকে পৃথক্ করিয়া অনুভব করে। মাতা ও পিতা দুইজনে কেমন যেন একটা আলাদা দল বলিয়া শিশুর মনে হয়। মাতা ও পিতা তাহার নিকটতম ব্যক্তি-পরিবেশ, তাহার উপর তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ নৈকট্য দেখিতে পায়। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে সামান্য ঘটনাও শিশুর নিকট চিত্তাকর্ষক হইয়া ওঠে। মাতা-পিতার পারস্পরিক আচরণের সহিত গৃহের অন্যান্য সম্পর্ক-জনিত আচরণ ঠিক যেন মিলিয়া যায় না; শিশুর মনে ইহাই দাম্পত্য-জীবনের অতি দূরাভাস। শিশু এখন মাতা-পিতার মধ্যে যাহা দেখিবে, তাহা তাহার দাম্পত্য-ধারণার অন্তর্গত হইবে। যদি সে দেখে মা তাহার পিতাকে মধুর আচরণে সুখী করিতেছেন, পিতা মাকে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আনন্দিত করিতেছেন, শিশু-চিত্তে ভাবী দাম্পত্য-জীবনের প্রেরণায় মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে মধুর আচরণ ও পরস্পরকে আনন্দ-দান। তেমনি মাতা-পিতাকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলে, বিবাহিত জীবনে শ্রদ্ধার ও সম্মানের ব্যবহার স্বাভাবিক বোধ করিবার প্রেরণা থাকিবে। শিশুর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কেও মাতা ও পিতার পারস্পরিক সম্বন্ধ ও আচরণ দায়ী, শিশুর মা-বাপের এ কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য।

## সন্তান-বিমুখতা

১০। আপনার সন্তানকে মনে মনে ঠিক-ঠিক গ্রহণ করিতে না পারার বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মা-বাপের চরিত্রে এইরূপ স্বধর্ম-চ্যুতি

যে প্রায়শঃই ঘটে, তাহা নহে। তবে ইহা নিতান্ত বিরলও নহে। সন্তানকে একেবারে বর্জন করার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুষ্প্রাপ্য। তথাপি সন্তানকে মাতৃস্নেহে বা পিতৃস্নেহে লওয়ার বিষয়ে গোপন অনিচ্ছা নানারূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা মাতৃ-পিতৃ-চরিত্রে নাতিবিরল মনে হয়। সন্তান-বিমুখতার বহুবিধ লক্ষণের মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত। শিশুর সহিত অকারণ কর্কশ ও স্নেহহীন ব্যবহার, শিশুর প্রতি অতি-স্নেহ প্রদর্শন, সদা-সর্বদা শিশুর মারাত্মক বিপদ-আশঙ্কা, শিশুর যে-কোনো সাধারণ কার্যে অত্যন্ত বিস্ময়-বোধ, নিজের শিশুর সম্মুখে অযাচিত ভাবে অপর শিশুর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করা বা অপর শিশুর প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় আদর-প্রদর্শন, ছল-ছুতা করিয়া শিশুকে দূরে রাখা, 'আয়া' বা 'দাসদাসী'র উপর আপন শিশুর ভার অর্পণ, স্তন্যদানে বিরক্তি, শিশুকে অতি উচ্চ 'নৈতিক' জীবন-যাপনের জন্য বা অতি উচ্চ সামর্থ্য-প্রদর্শনের জন্য চাপ দেওয়া—ইহাদের কতকগুলি একসঙ্গে মাতৃ-আচরণে বা পিতৃ-আচরণে দেখা দিতে পারে। এই লক্ষণগুলি দেখিলে, উহাতে মায়ের বা পিতার সন্তান-বিমুখতার গোপন ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মনের বহুপ্রকার অবস্থায় এই লক্ষণগুলির কিছু কিছু প্রকাশ পাইতে পারে, সন্তান বর্জনের গোপন কামনাই ইহাদের জন্য সকল সময়ে দায়ী নহে। মাতা-পিতার অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, অপরের অনুকরণ, অনভিপ্রেত অভ্যাস প্রভৃতি নানা কারণেই ঐ-সকল আচরণ ঘটিতে পারে। তবে একথা সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক লক্ষণের পুনঃ পুনঃ প্রকাশে সন্তান-বিমুখতাই অনুমান করা চলে।

১১। সন্তান-বর্জনের গোপন কামনা থাকিলে মাতা-পিতার চরিত্রে ও আচরণে উহা প্রকাশ হইয়া পড়েই, সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। শিশুর আচরণেও ইহা প্রতিফলিত হয়। শিশু মাতার বা পিতার আদর হইতে নির্বাসিত হইলে সে কেমন একটা 'গায়ে পড়া'র অভ্যাস অর্জন করিয়া বসে। গৃহে কেহ আসিলে নানা কৌশলে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে—কখনো আধো-আধো কথা বলে, কখনো হামাগুড়ি দেয়, চেঁচায়, কাঁদে, অপর শিশুকে কাঁদায়, জিনিসপত্র সশব্দে ফেলে, আরো কত কী। আবার, কোনো শিশু বা একেবারে সকলের আদরেই অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। কাহারও মধ্যে স্ফূর্তির অভাব দেখা দেয়।

১২। শিশু বিকাশের এই অন্তরায়টির একটি কারণ মাতা-পিতার মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির অভাব, প্রেমাচরণের অভাব বা উহার কৃত্রিমতা। শিশুর দিক হইতে ইহা বিষবৎ, মাতা-পিতার পক্ষে ইহা ধর্মচ্যুতি।

## আলোচনা-সূত্র

১। পিতৃ-পরিবেশ ও মাতৃ-পরিবেশ পৃথকভাবে আলোচনা করার পর আবার 'মাতা-পিতা' অধ্যায়টির আবশ্যকতা কি?

২। পরিবেশে 'পটভূমি' বলিতে কি বুঝায়? দৃষ্টান্তযোগে আলোচনা করুন।

৩। মা পিতার পটভূমি, পিতা মায়ের পটভূমি। শিশুচিত্তে ইহার সার্থকতা কি এবং ইহার অর্থই বা কি?

৪। মাতা-পিতার পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর শিশুচিত্তের গঠন অনেকখানি নির্ভর করে। আলোচনা করুন।

৫। মাতা-পিতার পারস্পরিক আচরণ শিশুর মনে যতটা আগ্রহ উদ্দীপিত করে, অপর কাহারও সম্বন্ধ ততটা আগ্রহ জাগাইতে পারে না কেন?

৬। মাতা ও পিতার মধ্যে আনন্দ-সম্পর্ক থাকিলে শিশু অনেক দিক হইতে রক্ষা পায়। আলোচনা করুন।

৭। শৈশবে শান্তির পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন কেন? মাতা-পিতার পারস্পরিক সম্বন্ধ ইহার জন্য কতখানি দায়ী?

৮। মাতা ও পিতার মধ্যে সুমধুর মিল থাকা বাঞ্ছনীয় কেন?

৯। মাতা ও পিতার মধ্যে আদর্শ সম্বন্ধ বিরাজমান, এ কথা বলিলে কি তাঁহাদের মধ্যে শতকরা একশোটি ক্ষেত্রেই মতের মিল বুঝায়? তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ-ঐক্যের অর্থ কি?

১০। শিশুর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য-জীবনের অনেকখানি ভালো-মন্দের সম্ভাবনা বর্তমানে শিশুর মাতা-পিতার পারস্পরিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতে পারে। আলোচনা করুন।

১১। সন্তান-বিমুখতা প্রকাশ মায়ের ও পিতার আচরণে কিভাবে ঘটে দৃষ্টান্ত দ্বারা আলোচনা করুন।

১২। মাতা-পিতার সন্তান-বিমুখতা শিশুর আচরণে কিভাবে প্রতিফলিত হয় দৃষ্টান্ত দিন।

১৩। দাম্পত্য-জীবনের সাধনা কেবল যে গৃহের সুখশান্তির জন্য আবশ্যক, তাহা নহে। এই সাধনার একটি মহৎ সামাজিক দিক আছে। প্রবন্ধাকারে আলোচনা করুন।

# ভ্রাতা-ভগিনী

## এই পরিবেশের বিশেষত্ব

১। শিশুর প্রথম ব্যক্তি-পরিচয়ের অবলম্বন তাহার মা, মাকে লইয়া তাহার সমাজ-জীবন শুরু। শিশু ও মা, এই উভয়ের সমাজ বাস্তব সমাজ হইতে এত স্বতন্ত্র যে, ইহাকে ঠিক সমাজ বলিতে পারা যায় না। তবে মানব-জীবনের এইখানেই ব্যক্তি-ধারণার সূত্রপাত বলিয়া এবং মাকে লইয়াই মানব-শিশুটির প্রথম ভালো-মন্দের বোধ ও রাগ-দ্বেষের, প্রীতি-ক্রোধের প্রকাশ বলিয়া, এখানেই সামাজিক জীবনের সূচনা ধরা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, আসন্ন সমাজ-জীবন শিশুর আরম্ভ হয় ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে 'মানুষ' হইতে থাকায় তাহার সমাজ-জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা একটু বিশেষ ধারায় সম্পন্ন হইতে থাকে। সমাজ-শিক্ষার দুইটি বিপরীত দিকই শিশু অনুশীলন করে। প্রীতি ও মিলনের অনুশীলন, অপ্রীতি ও সঙ্কটের পরিচয়, উভয় অভিজ্ঞতাই তাহার প্রতিদিনকার জীবনে লাভ হয়। বাহিরের সমাজেও এই দুইটি দিক রহিয়াছে, মিলন রহিয়াছে এবং সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে। এক-দল শিশু ভ্রাতা-ভগিনীদের আচরণ লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে এক দিকে প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে, অপর দিকে ছোটো-খাটো বিষয় লইয়াই লড়াই চলিতেছে। প্রতিদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতি ঐক্য দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মধ্যস্থতায় শিশু বৃহত্তর সমাজের বৃহৎ ও জটিল জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা তাহার প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং ইহাতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

২। বিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্বগুলির একটির কথা এইখানে মনে পড়ে। বিদ্যালয়ে নানা স্তরের নানা শ্রেণীর, নানা মতের গৃহ হইতে ছাত্র-ছাত্রী আসে। বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাহাদের পার্থক্যের অন্তরে একটি মূলগত ঐক্য স্থাপন করা হয়, ইহা বিদ্যালয়ের একটি কঠিন দায়িত্ব। গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিলে ঐ দায়িত্বটির আর একটি রূপ চোখে পড়ে। শিশুরা কেহ কাহারও মত নহে, এক ভাই বা ভাই বা ভগিনী সহোদর আরও কোনো ভাই-ভগিনীর মত নহে। তাহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য-সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ, যে গৃহে মাতা-পিতার মধ্যে একতান একটি ভাব বর্তমান এবং প্রতি-

দিনের আচরণে সেই ঐক্যটি প্রকাশিত, সে গৃহে সকল ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরন, একপ্রকার বিশেষ স্বভাব ও অভ্যাস গঠিত হইয়া যায়। ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে পার্থক্যও থাকে, আবার ঐক্যও গড়িয়া ওঠে। মা-বাপ কোনো বিশেষ শিক্ষাদান-পদ্ধতি না জানিয়াই সন্তান-সন্ততির স্বভাবে স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তোলেন, কতকগুলি বিষয়ে মিলও আনিয়া দেন। ইহা যে-কোনো বিদ্যালয়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও মাতা-পিতার পক্ষে কঠিন নহে।

৩। জনক-জননীর প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ অল্পাধিক সকল শিশুরই থাকে। বাহিরের আচরণে কখনো কখনো শিশুরা এই আকর্ষণটুকু দেখাইতে চাহে না বটে, তথাপি মনে মনে তাহারা অনুভব করে তাহাদের ভরসা কোথায় এবং নিতান্ত আপনার জন কে। একই মাতা-পিতাকে ভালবাসিয়া, তাঁহাদের অনন্য প্রভাবে আত্মগঠন করিতে পাইয়া, ভাই-ভগিনীরা সকলে পরস্পরের আপনার হইয়া উঠে; মাতা-পিতার যোগে সকল ভাই-ভগিনী মোটামুটি একই-প্রকার আদর্শ গ্রহণ করে এবং পরস্পরের যোগে প্রধানতঃ সেই আদর্শটিরই সমর্থন পায়। ছোট্ট একটি শিশু তাহার দাদা-দিদিদের যোগে বড় হইতেছে, মনে করা যাক্। শিশুটি মাতৃ-পিতৃ-পরিবেশে যেটুকু পাইয়াছে, তাহার দাদা-দিদিরাও সেই মাতৃ-পিতৃ-প্রভাবে বড় হওয়ার জন্য সেই একই ধারা ও আদর্শ লাভ করিয়াছে। এখন শিশুটির আদর্শ ধরন-ধারণ প্রভৃতি মায়ের দিক হইতে যেমন উৎসাহিত হইতেছে, দাদা-দিদিদের নিকট হইতেও সেইভাবে সমর্থন পাইতেছে। মাতা-পিতার রুচি শিশুটির মনে যে পছন্দ অপছন্দ সৃষ্টি করিতেছে, দাদা-দিদিরাও সেই দিকে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। শিশু কেবল মাতৃ-পরিবেশের যোগে বড় হইতেছে না, তাহার দাদা-দিদিদের একই ধরনের প্রভাবে বড় হইতেছে। তজ্জন্য তাহার চিত্তের বিকাশে একই দিকে অনেক প্রভাব কাজ করিয়া এক প্রবলতর প্রভাবের সৃষ্টি করিতেছে। বিদ্যালয়ে বা অন্য কোথাও এতগুলি আপন জনের প্রভাব একই দিকে কাজ করিতে পায় না। সেই কারণে গৃহে ভাই-ভগিনীর যোগে সামাজিক জীবনের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়, সমাজোচিত গুণের যে-সকল অনুশীলন হয়, তাহার সহিত বাহিরের কোনো শিক্ষার তুলনা হয় না। গৃহে ভাই-বোন না থাকিলে তাহাদের প্রভাব ছোট্ট শিশুটি পাইত না, মাতৃ-পিতৃ পরিবেশ হইতে যাহা তাহার চিত্তে গৃহীত হইত, তাহার অতিরিক্ত কিছু লাভ হইত না। তারের যন্ত্রের তরফের তারের সহিত

ভ্রাতা-ভগিনীদের তুলনা মনে আসে। মূল তারটি যে স্বর সৃষ্টি করে, তরফের তার ঠিকমত বাঁধা থাকিলে সেই স্বরটিকেই পুনরায় ঝঙ্কৃত করে। মূল স্বরটির সহিত ঝঙ্কারের প্রভাব মিলিত হইয়া শ্রোতাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। তরফের তারগুলি যত ক্ষীণ স্বরই তুলুক না কেন, মূল স্বরটিকে গভীর করিতে তাহাদের প্রভাব অল্প নহে। একদিকে যেমন মাতা-পিতার যোগে শিশু-সন্তানের মধ্যে কোনো একটি আদর্শের ও স্বভাবের মূল গুণগুলি গঠনের পরিবেশ পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি গৃহের শিশুরাও পরস্পরকে সেই আদর্শ ও স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী অনু প্রভাব মূল প্রভাবের ভূয়ঃ ভূয়ঃ অনুরণন সৃষ্টি করে। গৃহে মাতা-পিতাকে নিকটতম ব্যক্তি বলিলে ভ্রাতা-ভগিনীকে নিকটতর বলিতে পারি। শিশু এই নিকটতম ও নিকটতর পরিবেশের সম্মিলিত প্রভাবে আত্মগঠন করিতে পায়। ইহা ভ্রাতা-ভগিনী-পরিবেশের একটি বৃহৎ দান।

৪। ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে পরস্পরকে সার্থক করিয়া তুলিবার একটি বিশেষ শর্ত আছে। শর্তটি মাতা-পিতার মধ্যে প্রীতি এবং ভাবধারার ঐক্য। কিন্তু এই প্রীতি ও ভাবধারার মিল কতকগুলি কারণে নষ্ট হইয়া হইয়া যাইতে পারে, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে মতামতের বিরোধ দেখা দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে দেহের ও মনের ক্লান্তি প্রধান। পিতার দিকে প্রধানতঃই অর্থ-সঙ্কট এবং মায়ের দিকে, বিশেষ করিয়া, বহুপ্রজনন-জনিত শারীরিক ক্ষয়, দেহে ও মনে ক্লান্তি আনিয়া দেয়। যে গৃহে অনেকগুলি সোদর ভাই-ভগিনী, সে গৃহে অশান্তি, মতামতের দ্বন্দ্ব, শিশুর প্রতি ধৈর্যচ্যুতি ও অমনোযোগ,—এ-সব ঘটিবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। ইহার ফলে পরিবারস্থ শিশুদের স্বভাবের মিল হয় না, এক-একজন এক-এক-ভাবে আত্মগঠন করিতে থাকে। এরূপ অমনোযোগ এবং শৃঙ্খলাভাবের অবস্থায় ভাই-ভগিনীদের পারস্পরিক আনুকূল্য সম্ভব হয় না, বরং মা-বাপের অনুকরণে পরস্পরের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি দ্বন্দ্ব প্রভৃতি আসিতে থাকে। তখন ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ শিশুর কাছে আশীর্বাদ না হইয়া অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায়।

৫। মাতা, পিতা এবং শিশু পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সুখের প্রভাব বিরাজ করিলে, শিশু ও তাহার দাদা-দিদির চরিত্রে স্নেহপ্রীতির অভ্যাস গঠিত হয়। দিদি তাহার ছোট ভাইটির নিকট যেন একটি ক্ষুদ্র মা হইয়া দাঁড়ায়, মা হইয়া সন্তানকে যত্ন করিবার সুখ অনুভব করে। দাদাটি বাপের মতো

স্নেহ-গম্ভীর শাসন ও আদর করিবার চর্চা আরম্ভ করে। ছোট্ট ভাইটিও তাহার দাদা দিদিকে অতি নিবিড়ভাবে পাইতে থাকে। ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে স্নেহাবেগের যে-প্রকার সুযোগ থাকে, বাহিরে তাহা সম্ভব নহে। ছোট শিশুটি বড় হইয়া একটু স্বাধীনভাবে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে গিয়া পৌছিবার পূর্বেই তাহার মনের স্নেহ-ভিত্তি রচিত হইয়া যায়। অবিরত বাহির হইতে বিপরীত প্রভাবের চাপ না আসিলে শিশুর স্বভাবে স্নেহগুণ দৃঢ় হইয়া যায়।

৬। ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে স্নেহের দিকটিই বৃদ্ধি পাইলে ক্রোধ-হিংসার ক্ষেত্র উপস্থিত হইবে না, এমন নহে। শিশুর ক্রোধ, হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম উপলক্ষ্য মাতা ও পিতা এবং তাঁহাদের পারস্পরিক আচরণ। কিন্তু সাধারণতঃ এই উপলক্ষ্য অধিক কাল থাকে না। শিশু অধিক সময় 'অপব্যবহার' না করিয়া মাতা-পিতার ক্ষেত্র হইতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে। সে মাতৃ-নিরপেক্ষ এবং পিতৃ-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেকে স্বতন্ত্র করিতে চায়। স্বতন্ত্র হইয়া কাহারও উপরে নির্ভর না করিয়া কেমন ভাবে চলা যায়, শিশু তাহারই পরীক্ষা করিতে থাকে, নিজেকে স্বতন্ত্র-রূপে অনুভব করিতে চাহে। শিশুর এই স্বাতন্ত্র্য-যাত্রায় মাতা-পিতা অপেক্ষা ক্রমশ ভ্রাতা-ভগিনীরা তাহার প্রতিদিনকার জীবনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। শিশু এখন মাতা-পিতার কোল হইতে নামিয়াছে, গৃহের অনেকের মধ্যে দস্তরমত একজন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এমন বয়স হয় নাই যে গৃহের বাহিরে সঙ্গী-সাথীদের নিকট রীতিমত আনাগোনা সম্ভব। শিশুর এইরূপ বয়সে ভ্রাতা-ভগিনীই প্রধান পরিবেশ হইয়া পড়ে, মাতা-পিতার প্রতি তেমন আর লক্ষ্য থাকে না। স্বতন্ত্ররূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে গেলে এবং নিজেকে আরো পাঁচ জনের মত স্বাবলম্বী বলিয়া অনুভব করিতে হইলে নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করিতে পারা চাই। যদি কেহ তখন শিশুর খেয়াল-খুশিতে বাধা দেয়, তাহা হইলে শিশু লড়াই করিবে, কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিবে না, সহজে মাকে বা পিতাকে ডাকিবে না। কোনো চিত্তাকর্ষক দ্রব্য অধিকার করিবার জন্য শিশু প্রতিযোগিতা করিবে। পুনঃ পুনঃ কোনো ভ্রাতা বা ভগিনী যদি মনোহর দ্রব্যাদি লাভ করে, আর ছোট্ট শিশুটি বারে বারে অধিকার বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়, তাহার মনে হিংসার উদয় হইতে পারে। এইভাবে প্রতিদিন বিচিত্র ক্ষেত্রে শিশুর ভালো-লাগা, ভালো-লাগার বস্তুকে নিজের অধিকারে আনিবার চেষ্টা, সেই

কারণে অন্যান্য শিশুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে থাকে। বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত দৈনন্দিন সম্পর্ক স্থাপিত হইলে শিশুর সঙ্ঘর্ষ ক্রোধ হিংসা ইত্যাদির ক্ষেত্র আরো বিস্তীর্ণ হয়। যতদিন বাহিরে গিয়া 'স্বাধীন' আচরণ করিবার বয়স না হয়, ততদিন ভ্রাতা-ভগিনীরাই তাহার 'স্বাধীন' আচরণের ক্ষেত্র। মাতা-পিতা বা গৃহের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা ঠিক শিশুর সমাজের নহেন। তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা যায় না। কারণ, হয় তাঁহারা শাসনের দ্বারা বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিশুকে নিরস্ত করিয়া দেন, নাহয় তাঁহারা শিশুর সামান্য দাবিতেই পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাকে আপন খেয়ালে ছাড়িয়া দেন। সঙ্গী সাথী বা ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত একখানি লাল রঙের ছবি লইয়া শিশুর লড়াই চলা স্বাভাবিক। কিন্তু লাল ছবির জন্য মাতা-পিতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব নহে। শিশু চাহিবামাত্র মাতা-পিতা লাল ছবিটি শিশুকে দিয়া দিবেন, সম্ভব হইলে একখানির স্থানে দুইখানি দিবেন। অথবা, রায় দিবার স্বরে বলিয়া দিবেন, 'না, ও ছবি পাইবে না, ওটি দরকারী' এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুর লাল ছবি অধিকারের চেষ্টায় যবনিকা-পাত ঘটিবে। এরূপ ক্ষেত্রে মাতা-পিতা বা তৎশ্রেণীর কাহারও সম্পর্কে বিরোধ-বিদ্বেষের সুযোগ নাই। ক্রোধ জাগ্রত হইলেও তাহার স্থায়িত্ব অধিক নহে। দাদা বা দিদির সহিত শিশুর বয়সের পার্থক্য যথেষ্ট থাকিলে দাদা-দিদিও হিংসা ও ক্রোধের তেমন উপলক্ষ্য দান করে না। পিঠোপিঠি সন্তানদের মধ্যে ক্রোধ হিংসা প্রভৃতির কারণ প্রায়ই ঘটিতে পারে।

৭। বাহিরে সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ক্রোধ-হিংসার উদ্রেক এবং ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত শিশুর দ্বন্দ্ব-দ্বেষ একটু পৃথক্। দুইটি ক্ষেত্রে দুই প্রকার ফল হইবার সম্ভাবনা। শিশু গৃহে যখন কোনো-কিছু লইয়া তাহার স্বাধীন আচরণের চর্চা করে এবং সেই কারণে ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত লড়াই বাধে, তখন তাহার অন্তরের নিভৃত স্থানে দাদা-দিদির স্নেহ এবং তাহারা যে আপন জন এই বোধটি জাগ্রত থাকে। সেই কারণে দাদা-দিদিদের সহিত বিরোধে শিশুর কোনো মর্মান্তিক পীড়া ঘটিতে পায় না, শিশুর চিত্তের গভীর দেশে অসহায় হীনমন্যতা সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার উপর মাতা-পিতার স্নেহদৃষ্টি থাকার জন্য ভ্রাতা-ভগিনীদের বিরোধ উপরে-উপরেই মিটিয়া যায়, মর্মে কোনো ব্যর্থতাবোধের ক্ষত হইবার অবকাশ থাকে না।

৮। শিশুর পক্ষে আত্মসংযম একটি কঠিন শিক্ষা (কোন্ বয়সেই বা নহে?)—ভ্রাতা-ভগিনীর যোগেই ইহার হাতে-খড়ি হয় বলা চলে। মাতা ও পিতার স্নিগ্ধ প্রভাবে এবং নিজেদের পারস্পরিক প্রীতি-সম্বন্ধের জন্য আত্ম-সংযম একটু সহজ হইয়া আসে। সুখের ও প্রীতির মধ্যস্থতায় সকল শিক্ষাই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, নিজের ঝোঁক সামলাইয়া লওয়ার অভ্যাসও সহজসাধ্য হইতে পারে। একেবারে গৃহের বাহিরে প্রথম হইতেই আত্ম-নিয়মনের আবশ্যক হইলে শিশু ক্লেশ পাইত। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে তাহার প্রাথমিক অভ্যাস-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বা উহার পরে বাহিরে আত্মসংযমের অনুশীলন ও আবশ্যকতা কম বেদনাদায়ক হয়।

৯। ভ্রাতা-ভগিনীদের পরস্পরের প্রভাবে শিশুর কতকগুলি ধারণা পূর্ণতর ও বিচিত্রতর হইয়া উঠে। মাতাকে পিতার সম্বন্ধের ভূমিকায় দেখিয়া এবং পিতাকে মায়ের সহিত দেখিয়া শিশু ভাবী দাম্পত্য জীবনের আভাস পাইতে থাকে ইহাই মনোবিদের বিশ্বাস। অবশ্য, স্তনানুরক্ত শিশুমাত্রের স্তনের প্রতি এবং পরবর্তী সময়ে পিতার প্রতি কন্যার, মায়ের প্রতি পুত্রের যে আকর্ষণ থাকে, তাহাকেও কাম-প্রেরণার সূক্ষ্ম বা কারণ-রূপ বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। মাতা-পিতাকে অবলম্বন করিয়া শিশুর কাম-প্রেরণার বিকাশ যে ভাবে হইতে পারে, ভ্রাতা-ভগিনীর যোগে সে ভাবে ঠিক গঠিত হইতে পারে না। মাতা-পিতার যোগে শিশুর ধারণায় দেহগত কোনো প্রভাব থাকে না। কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে প্রায়ই শিশুর মনোযোগ দেহস্তরে আসিতে পারে। ভ্রাতা-ভগিনীরা তাহাদের শৈশবে পরস্পরের দেহের প্রতি এক কৌতূহল প্রকাশ করে। তখন তাহাদের দেহ লইয়া লজ্জা করিবার বয়স নহে; সে বয়সে ভ্রাতাই হউক আর ভগিনীই হউক, দেহাবরণের প্রয়োজন বোধ করে না। শিশুদের এই আদি অবস্থায় পরস্পরের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিবার সুযোগ ঘটে। অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মুখে বা আড়ালে তাহাদের এইপ্রকার দেহ-বিজ্ঞানের পরীক্ষা চলিতে বাধা নাই, কারণ তাহাদের মনে পাপ নাই। শিশুরা স্বাভাবিক কৌতূহলে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর দেহ তুলনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই অভিজ্ঞতা বয়স্ক ব্যক্তির পরিবেশে সম্ভব নহে, বাহিরে সঙ্গীসাথীদের যোগে এইপ্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার বাধা অনেক এবং বাহিরে দেহগত কামের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে।

১০। নারী-পুরুষের দেহগত পার্থক্য ব্যতীত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে। শিশু নারী-পুরুষের অঙ্গের পার্থক্য ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে বিনা বাধায় বুঝিয়া লয়, নারী-পুরুষের সূক্ষ্ম মানসিক দিকটিও একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে থাকে। মাতা ও পিতার সহিত একাত্ম হইয়া এবং পিতা ও মাতার প্রতি নারী বা পুরুষের প্রকৃতি লইয়া যোগ-স্থাপন করিয়া শিশু যতটুকু অনুভব করিতে পারে, ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে তাহার উপর আরো অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভ্রাতা-ভগিনীদের আচরণ ঘনিষ্ঠ-ভাবে বহুপ্রকার অবস্থায় দেখিতে পাইয়া শিশুর নারী-পুরুষের ধারণা বিচিত্র হয় এবং মাতা ও পিতার নিকট পাওয়া ধারাটুকু আরো পূর্ণ হইয়া উঠে। কিশোর-কিরোরীর প্রেম পরিণত হইয়া যৌবনের প্রেমের রূপ গ্রহণ করে; শৈশবে মা-বাপের পরিবেশে পাওয়া কাম-ধারণা ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যস্থতায় আর-একটু পরিণতি লাভ করে, ক্রমশ বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে ইহা আরো পরিস্ফুট হয়। ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যস্থতা শিশুর কাম-বিকাশের সহায়ক, কারণ ইহার প্রভাব একটু বাস্তব-ঘেঁষা।

১১। শিশুর কাম-শিক্ষা একটি বিশেষ সমস্যা বলিয়া মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। কিন্তু এখানে সে বিষয়ের অবতারণা না করিয়া আবশ্যকবোধে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিশু ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হইলে বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সাহায্যে তাহার কাম-কৌতূহল চরিতার্থ করে। সে বাহিরে পুরুষ-শিশুর এবং নারী-শিশুর দেহ লক্ষ্য করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। বাহিরে শিশুদের দেহ-পার্থক্য লক্ষ্য করিতে দেওয়ায় বিপদ আছে। বাহির হইতে কাম-বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা শিশুর পক্ষে অনেক সময় অমঙ্গলজনক হইয়া পড়ে। শিশুর সরল কাম-কৌতূহলে বাহিরের পরিবেশের দোষে বিকৃত অভিজ্ঞতায় এবং মৃদু কাম-ভোগে মলিন হইয়া যাইতে পারে। ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে সরল কৌতূহলের এরূপ বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। ভ্রাতা-ভগিনীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট নিতান্ত আপন-জন, শিশুরা প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে এই আপনজনের বিশেষ টানটুকু বোধ করিতে থাকে। মনোবিশ্লেষণের অনুমান—যুগ-যুগান্তর হইতে মানুষের মনে একপ্রকার সংস্কার সৃষ্ট হইয়া আছে, ইহার প্রভাবে মানুষ নিজের আপন-জনকে কাম-ভোগের উপলক্ষ্য-রূপে ব্যবহার করিতে পারে না। আপন-জন কেহ কামৈষণার লক্ষ্য হইয়া

উঠিতে থাকিলে মানুষের মনের ভিতর ঘোরতর ধিক্কার উঠিতে থাকে, রক্তের কণিকাগুলি পর্যন্ত যেন প্রতিবাদ করিয়া ওঠে। কিন্তু সংস্কারের এই বিরোধিতা কেবল আপন-জনের বেলায়। কিশোর-কিশোরীর পারস্পরিক আকর্ষণে কোনো সংস্কার কোনো বাধার সৃষ্টি করে না, যুবক-যুবতীর বিলাসেও অন্তরের দিক হইতে আপত্তি ওঠে না। কারণ, কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী পরস্পরের স্বজন নহে, আত্মীয় নহে। তাহারা পরস্পরের নিকটতম প্রিয়তম হইতে পারে, তথাপি স্বজন নহে। শৈশবে যাহাকে স্বজন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, সেই স্বজন। শৈশবের আপন-জন বলিতে মাতা, পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতি। কেন একজন স্বজন, আর একজন কেনই বা শিশু-মনে স্বজন বলিয়া গৃহীত হয় না, তাহার নির্দিষ্ট কোনো কারণ বোধ হয় নাই। তবে, মাতা-পিতাকে স্বজন ভাবিবার জৈব প্রয়োজন আছে এবং তাঁহাদের ধারণায় যাহারা শিশুর স্বজন, তাহারাই শিশুর মনে স্বজন হইয়া দাঁড়ায়। শিশু-মনে স্বজনের ধারণা-সৃষ্টিতে মাতাপিতার প্রভাব মূলতঃ দায়ী বলিয়া অনুমান করা যায়। সে যাহাই হউক, শিশু-চিত্তে ভ্রাতা-ভগিনী তাহার একান্ত আপনার জন, সে ক্ষেত্রে কামাচরণের কোনো সম্ভাবনা দেখা দিলেই মানুষের এক সুপ্রাচীন সংস্কার মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। অথচ বাহিরে সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কাম-কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া শিশুর মনে যদি কাম-পঙ্ক ঘুলাইয়া ওঠে, তাহা হইলে তাহার অন্তরে কোনো গভীর বাধা জাগিবে না। এই কারণে শিশুর কাম-ধারণার নিরাপদ্ ও বিশুদ্ধ ক্ষেত্র ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ।

১২। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বক্তব্যটি একটু হুঁশিয়ারির কথা মাত্র। মা ও শিশু, ইহার অধিক বিশুদ্ধ সম্বন্ধ জগতে অনুভব করা যায় না। সেই শুদ্ধতম সম্বন্ধও কখনো কখনো স্থূল উত্তেজনার আভাস জাগ্রত করে। শিশুর দেহ লইয়া মায়ের আদরে সংযম না থাকিলে মাতৃ-চিত্তেও কামের কালো ছায়া আসিয়া পড়ে। ভ্রাতা-ভগিনীর ক্ষেত্রেও ইহার সম্ভাবনা থাকা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। কাম-কৌতূহলের প্রতি মাতা-পিতার সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে শিশুদের মনে জানার আনন্দ অপেক্ষা বিকৃত উত্তেজনার আধিক্য ঘটিতে পারে। মাতা-পিতার কর্তব্য হইল শিশুর আচরণের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া। তাঁহাদের নিজেদের অনুভূতি বলিয়া দিবে শিশুরা সরলভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, না, তাহাদের মনে অনভিপ্রেত উত্তেজনার সৃ

হইতেছে। মাতা-পিতার স্বতঃসিদ্ধ অনুভব ব্যতীত কোনো পদ্ধতির দ্বারা শিশুদের কামোত্তেজনার সূচনা বুঝিতে পারা যায় না। মাতা-পিতার কৌশল বলিতে তেমন কিছু নাই। দুইটি প্রশস্ত পথ মাতাপিতার নিকট উন্মুক্ত—একটি জ্ঞানের পথ, অপরটি শিশুকে অন্যত্র আকৃষ্ট করার পথ। শিশু যাহা জানিতে চাহে, তাহা বলিয়া দেওয়াটাই সত্য পথ। শিশুর নিকট অকারণ গোপনতা ঠিক নহে, ইহাতে শিশুর কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পায়। শিশু তাহার জন্মরহস্য শুনিতে চাহিলে অতি সাধারণভাবে তাহার মূলটুকু বলা সম্ভব। এই বলাটুকুতে লজ্জার কিছু নাই, সংকোচের কিছু নাই। কোনো ভীতি বা তীব্র আবেগ উৎপাদন না করিয়া শিশুর আবির্ভাব-রহস্য শিশুর উপযুক্তভাবে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিলে শিশুর পক্ষে মঙ্গলই হয়। জন্ম-রহস্যই হউক, বা নারী-পুরুষের দেহ-রহস্যই হউক, শিশুর কৌতূহল অনুসারে জ্ঞান দান করাই ভালো। আর যদি দেখা যায়, শিশু কোন কামবিষয়ে একটু অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহা হইলে তাহাকে আদর করিয়া একটু আকস্মিকভাবেই অন্য কোনো দৃশ্যে বা ঘটনায় আকৃষ্ট করা সুবিধাজনক। মাতা-পিতার দিক হইতে অনাবেগে কাম-জ্ঞান দান করা এবং শিশুর মন কাম-রহিত বিষয়ে নিয়োজিত করা ব্যতীত বেশী কিছু করিবার নাই। এ কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে সরল কৌতূহলের কাম-বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা কম; মাতা-পিতা সতর্ক থাকিবেন, কিন্তু অতি-সতর্কতা কখনো ভালো ফল দেয় না।

১৩। পরিশেষে একটি বিষয়ে পুনরুক্তি করিতে হইতেছে। শিশুর পক্ষে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ মূল্যবান। ইহার সার্থকতা কেবলমাত্র গৃহের শিশুগুলির উপর নির্ভর করে না। মাতা-পিতার পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সংযত প্রেমাচরণ গৃহে যে বিশুদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে তাহারই যোগে শিশুদের মধ্যে স্নেহাচরণ সংযম ঐক্য প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারাই পরিবেশের মূল সুর, ভাই-ভগিনীগুলি তাহার ঝঙ্কার। সংসারের মধ্যে অর্থাভাব, অতৃপ্ত কাম, অধিকসংখ্যক সন্তান-সন্ততি, স্নেহের অভাব, অথবা স্নেহ-প্রকাশের দৈন্য বা বিকৃতি প্রভৃতি নানা কারণে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়। শিশুর পক্ষে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ সার্থক হইয়া উঠে, ইহার দায়িত্ব প্রধানতঃ শিশুর মাতা-পিতার।

## আলোচনা-সূত্র

১। শিশুকে বৃহত্তর সমাজের জন্য প্রস্তুত করিতে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ কতখানি সাহায্য করে আলোচনা করুন।

২। শিশুর রুচি ও আচরণ-গঠনে দাদা-দিদিরা কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করে? কিরূপ অবস্থায় দাদা-দিদিরা সহায় না হইয়া অন্তরায় হইয়া ওঠে?

৩। দিদি ও তাহার ছোট্ট ভাইটির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ সৃষ্ট হইতে পারে? দিদির উপর ও ছোট্ট ভাইটির উপর ইহার প্রভাব কিরূপ?

৪। দাদা-দিদিদের সহিত শিশুর 'লড়াই' প্রায়ই হয়, কিন্তু তাহাতে শিশু-চিত্তে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম। কেন?

৫। কোন্ ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা ন্যূনতম?

৬। ভ্রাতা-ভগিনীদের পরিবেশে শিশুর কাম-কৌতূহল কী ভাবে উদ্‌গত হয়? এই দিক দিয়া পিতার ও মাতার দায়িত্ব কী?

৭। ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের পরিবেশ অপেক্ষা কাম-শিক্ষায় অধিকতর সাহায্য করে এবং নিরাপদ। কেন?

৮। শিশুর সাধারণ কৌতূহল ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের নিকট আপত্তি-জনক বলিয়া মনে হয়। আপত্তি করা উচিত কি? আপত্তিকর কৌতূহল হইতে শিশুকে কী ভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে?

৯। শিশু তাহার জন্ম-ইতিহাস জানিতে চাহিলে বয়স্করা কী ভাবে উত্তর দিবেন?

১০। শিশু-চিত্তে বৃহৎ পরিবারের বহু ভ্রাতা-ভগিনীদের পরিবেশ কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ভালো ও মন্দ উভয় দিক আলোচনা করুন।

# পিতামহ-পিতামহী

১। আলোচ্য প্রসঙ্গের নিদর্শন ও উপযোগিতা প্রাচ্যদেশে ( চীনে বা ভারতবর্ষে ) যতটা, পাশ্চাত্যে তেমন নয়। এ দেশে পরিবারের গঠনে যে বিশিষ্টতা আছে তাহারই বশে শিশুর উপরে বিশেষ কতকগুলি প্রভাব পড়ে, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার তুলনা মিলিবে না বলা চলে। আমাদের সংসারে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বাঁচিয়া থাকিলে সেটি শিশুর এবং শিশুর মাতা-পিতারও বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া সকলে মনে করে। বেশ খানিকটা বয়স হইয়া গেলে ( ষাট, সত্তর বা তাহারও বেশি ) এবং তাঁহাদের পুত্র-কন্যা দায়িত্বসম্পন্ন ও কার্যক্ষম হওয়ার পরে, সংসারে তাঁহারা যে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন বা সাহায্য করিবেন, সে আশা কেহ করেন না। সুস্থ স্বাভাবিক গৃহপরিবেশে তাঁহারা নিজেরাও সেরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা সংসারের প্রতিদিনের কর্ম হইতে, গ্লানি হইতে, দূরে থাকিবেন, কতকটা ঠাকুরের মতোই, ঐহিক ভাবনা চিন্তা চেষ্টা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সংসারের মঙ্গল ইচ্ছা করিবেন, সংসারের অভিমুখে দেবতার ও নিজেদের আশীর্বাদ আকর্ষণ করিবেন ও বর্ষণ করিবেন—এদেশীয় আদর্শ সংসারে ইহাই সকলে আশা করে, আকাঙ্ক্ষা করে।

২। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার চিত্র যাহা আমাদের মনের সমুখে ভাসিয়া ওঠে, তাহাতে সংসারের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নাই, যোগ আছে কেবল নাতি-নাতিনীদের সঙ্গে। তাঁহারা জীবনের প্রান্তে আসিয়া যেন এক নূতন হালকা সংসার পাতিয়াছেন। সেখানে নানা বয়সের শিশুরা রহিয়াছে, তাহাদের পুতুলের সংসার সাজাইতেছে, আর তাঁহারা মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত খেলার সাথী হইয়া জীবনের শেষ খেলা সমাপ্ত করিতেছেন। নির্লিপ্ত, হাস্যময়, অথচ দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় গভীর।

৩। শিশুরা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার হালকা সংসারে আসিয়া হালকা হয়। এক দিকে কর্মব্যস্ত মাতা অপর দিকে গুরু-গম্ভীর পিতা, আবার অনতিদূরে শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়মে বাঁধা শিক্ষা-পদ্ধতি। শিশুর প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ঠাকুরদা-ঠাকুরমার আশ্রয়টিই সর্বপ্রধান আকর্ষণ এবং স্বাধীনতার স্থান। শিশুরা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সুযোগ পাইলে যখন তখন তাহাদের কর্তব্য হইতে

পলাইয়া আসে। মাতা-পিতারা বেশ জানেন যে, চতুর শিশু সময় বুঝিয়া দাহু-দিদিমার নিকট উপস্থিত হয়, দাহু-দিদিমা সস্নেহে তাহাদের কোলে তুলিয়া লন, শিশু হাসি-হাসি মুখে অসহায় মাতা-পিতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া লয় এবং তখনকার মতো শিক্ষা বা শাসন-পর্বের উপর যবনিকা-পতন ঘটে।

৪। নাতি-নাতিনীদের সহিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমার এইপ্রকার প্রশ্রয়ের ব্যবহার সুপরিচিত। ইহার ভালো দিক আছে, কুফলও আছে। ইহা সংসারে যেমন আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারে, অশান্তি ও মনঃপীড়ার অবস্থাকেও তেমনি জটিল করিয়া তুলতে পারে।

৫। বুড়া ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রশ্রয়-দানের ফল কিরূপ হইবে, তাহা নির্ভর করে কয়েকটি অবস্থার উপর। প্রথম, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মনের দিক। ইহা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথম হইলেও প্রধান নহে। ঠাকুরদা এখন সংসারের কর্তব্য যথাসাধ্য শেষ করিয়া খানিকটা নির্লিপ্ত হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর ন্যায় একেবারে নির্লিপ্ত হইয়া যাওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নহে, ঠাকুরদাও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন। তবে তাঁহার চিত্র-সৃষ্টি করিতে গেলে তাঁহাকে মায়া-মোহের বাহিরে কল্পনা করা চলে। ঠাকুরদার নিকট এখন সংসারের প্রতিদিনকার জীবনধারা অনেকটা দূরে পড়িয়া থাকে, কারণ, তাঁহার মন অনেকটা নির্লিপ্ত বলিয়া তিনি সংসারের সুখ-দুঃখ মায়া-মোহ বাসনা-বিড়ম্বনা প্রভৃতির সহিত জড়িত নহেন। সংসারের একান্ত বর্তমানটিও যেন তাঁহার পিছনে ফেলিয়া আসা 'অতীত', যেন দূরের কোন্ দৃশ্য। এক সময় তিনিই এই দৃশ্যের প্রধান ব্যক্তি বা বিষয় ছিলেন, এখন তাঁহার মন অনেক দূরে। এ কথা সকলেই জানেন, যে দৃশ্য দূর হইতে অতি মনোরম, নিকটে গেলে তাহা অনেকাংশে সাধারণ হইয়া পড়ে। দূর হইতে যে-সকল বেমানান অসুন্দর অংশ চোখে পড়ে না, (এবং চোখে পড়ে না বলিয়াই দূরের দৃশ্যকে অসুন্দর করিয়া তুলিতে পারে না) সেই সকল খুঁটিনাটি নিকটের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া ওঠে এবং দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। দূর হইতে চাহিলে বহুদূরবিস্তৃত ভূমিকা মাত্র পাওয়া যায়; বৃহৎ ভূমিকায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি মিলিয়া মিশিয়া একটি সুদৃশ্যেরই রচনা করে, অংশগুলি যতই বেমানান হউক-না কেন, তাহারা তখন আর টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়ে না—তাই সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া বুঝা যায় না। নিকট হইতে দেখিলে, ঐ টুকরা টুকরা অংশগুলিই

দেখিতে পাওয়া যায়, বৃহৎ ভূমিকাটি একেবারে চোখে পড়ে না। নয়ন-গোচর দৃশ্য সম্পর্কে যা, মানুষের জীবন সম্পর্কেও তাহাই সত্য। জীবনকে যখন অতি নিকট হইতে দেখি, তখন প্রতিদিনকার অভাব, অভিযোগ, অপ্রীতি, চেষ্টার ব্যর্থতা ও মনের অ-সুখ আমাদের মনের সম্মুখে প্রধান হইয়া উঠিতে থাকে। তখন জীবনটাকে কেবল পীড়ার ক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। আবার সেই জীবনেরই কোনো অংশ অতিক্রম করিয়া গেলে ফেলিয়া-আসা জীবনটাকে ভালোই লাগে, তুলনায় বর্তমানকেই বড় অরুচিকর মনে হইতে থাকে। যখন ঠাকুরদা নিজে শিশু ছিলেন, তখন কত আবদার, কত কান্না, কত ব্যর্থতা শৈশবকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তখন তাঁহার শৈশব তাঁহার কাছে ভালো লাগিত না; মনে মনে কামনা ও কল্পনা করিতেন কবে 'দাদার চেয়ে অনেক বড় হব'—এমন-কি, 'বাবার মতোই বড়ো হব'। তাহার পর সত্য সত্যই দাদা অপেক্ষা বড় হইলেন, বাবার মতোই হইলেন, সংসারের ভার লইলেন। তাঁহারও সংসারে শিশুর আগমন হইল। বাবা হইয়া ভালো লাগিল না, তখন নিষ্ফল কামনা দেখা দিল, যদি আবার শিশু হওয়া যাইত। ঠাকুরদা এখন পিতার কর্তব্যও শেষ করিয়াছেন। এখন তাঁহার মনে পড়িতেছে লীলাময় শৈশব সুন্দর, স্ফুটনোন্মুখ কৈশোর সুন্দর, প্রেম-পীড়িত যৌবন সুন্দর, সুখ-দুঃখ খ্যাতি-অখ্যাতির দোলায় দোদুল্যমান প্রৌঢ়ত্বও সুন্দর। ঠাকুরদার এইরূপ দৃষ্টিতে শিশু নাতি-নাতিনীর কোনো আচরণই অপরাধ বলিয়া ধরা পড়ে না। শিশু যখন মায়ের রান্নাঘরে গিয়া দুধের বাটিটা অসাবধানতা-বশতঃ উল্টাইয়া ফেলিয়া দাদুর নিকট পলাইয়া আসিয়াছে, মা তাহাকে ধরিবার জন্য দুধের হাতা লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন, তখনকার দৃশ্যটি দাদুর চোখে আনন্দের অশ্রু টানিয়া আনে; মা কী করিতেছেন, শিশু কী করিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিবার মন তাঁহার নাই। এ দিকে শিশু দাদুর কোলে বসিয়া হাসে; তাহার চোখ বলে 'এখন আর কী করিবে?' মা দুঃখ করেন, 'এই প্রশ্রয় পাইয়াই সব মাটি হইয়া গেল।' আর দাদু ভাবেন 'কী নির্বোধ!'

৬। ঠাকুরদার (এবং ঠাকুরমার) এই সুদূর-দৃষ্টি খুলিয়া থাকিলে শিশু প্রশ্রয় পায়, সে প্রশ্রয়ে তাহার অন্তর বিস্তৃত হয়। বাহিরের আচরণে শিশু অসভ্য অবাধ্য হইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা অতি সামান্য। সত্য সত্য অমঙ্গল বার আশঙ্কা ঘটে তখন, যখন ঠাকুরদার সহিত মায়ের বা পিতার গভীর

অমিল থাকে। শিশু, মাতা-পিতা, দাদু-দিদিমা, সকলের মধ্যে যদি একটি সহজ সরল ঐক্য থাকে, তাহা হইলে শিশুর জীবনের ছোট ছোট 'অপরাধ' এবং তাহাতে দাদুর সস্নেহ ক্ষমা বা সকৌতুক প্রশ্রয় তেমন কোনো ক্ষতি-সাধন করে না। অপরাধ ও প্রশ্রয়ের সমস্ত ব্যাপারটি হাসির হিল্লোলে ও আনন্দের প্রবাহে নিতান্ত হালকা হইয়া যায়। শিশুর অন্তরে পৌঁছায় ঐ আনন্দের ধ্বনি, আনন্দেরই স্মৃতি তাহার অভিজ্ঞতায় ধরা থাকে। অপরাধের দুষ্ট চিহ্ন বা বাপ-মায়ের সম্পর্কে অবাধ্যতার স্পর্ধা, ইহার কোনোটিই শিশুর অন্তরে স্থান পায় না। বাহ্য অভ্যাসে যে সামান্য ত্রুটি মাঝে মাঝে দেখা যায় তাহা অন্তরের খুশির বেগে আপনা-আপনিই অপসৃত হয়।

৭। গৃহে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা যদি ঠিক তাঁহাদের উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে গৃহ-পরিবেশে একটি মহৎ উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা তাঁহাদের উদার ক্ষমাশীল মনের প্রভাবে গৃহে একটি শান্ত উচ্চভাব আনিয়া দিতে পারেন। গৃহকর্তা এবং গৃহিণী উভয়েই আপনাদের অগোচরে শান্তি ও উদারতার প্রভাবটি নিজেদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্যে গ্রহণ করেন। সংসারে কত দিকে কত সঙ্কীর্ণতা, বিরোধ, টানাটানি, কাড়াকাড়ি। শিশুর পিতামাতাকে প্রতিদিনই এইগুলির মধ্যে থাকিতে হয় এবং সাধ্যমত নিজেদের মনকে রক্ষা করিতে হয়। ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই কঠিন আত্মরক্ষার জন্য যদি একটি শান্ত, উচ্চ, উদার প্রভাব তাঁহাদের মনে অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চার করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় না। তাঁহারা হিংসা দ্বেষ মিথ্যাচার প্রভৃতি পাপ হইতে নিজেদের সংসারকে অনেকটা বাঁচাইতে পারেন ; শিশুর নিকট গৃহ-পরিবেশ অনেকটা নির্মল ও শান্ত থাকে। সঙ্গীতের সুর গায়কের ইচ্ছা-অনুসারে খেয়ালী বিহঙ্গের ন্যায় যেন উড়িয়া বেড়াইতে থাকে, কিন্তু গায়কের ইচ্ছাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কাছে তানপুরার প্রভাবটুকু প্রয়োজন। তানপুরা সঙ্গীত সৃষ্টি করে না, ইহা সুরের প্রকৃতিকে যথাস্থানে ধরিয়া রাখে মাত্র। উপমা যতই অসম্পূর্ণ হউক, তথাপি বলিতে ইচ্ছা করে, গৃহে পিতামহ-পিতামহীর অবস্থিতি শিশুর মাতা-পিতার মনের কাছে জীবনের মূল সুরটি যেন অবিরত বাজাইতে থাকে ; মাতা-পিতা যতই দ্বন্দ্ব-দ্বেষের মধ্যে গিয়া পড়ুন-না কেন, পিতামহ-পিতামহীর উদার নিরপেক্ষ ক্ষমা-মধুর মনের অলক্ষ্য প্রভাব তাঁহাদিগকে বিশেষ একটি আদর্শ হইতে,

স্বাভাবিকতা হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় না। শিশুও সেই সন্তোষসংযত পরিবেশে আত্মগঠন করিবার সুযোগ পায়।

৮। গৃহের পরিবেশকে নির্মল ও শান্ত করিয়া রাখিতে পিতামহ-পিতামহীর দান সত্য হয়, যখন তাঁহাদের মন সংসারের ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে থাকে, বহু অভিজ্ঞতার ফলে স্বভাবে ক্ষমাগুণ স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা যদি জীবনের প্রান্তে আসিয়াও উচ্চস্তরে মনকে তুলিয়া ধরিতে না পারেন, ঐহিকতা হইতে অনেকটা মুক্ত হইতে না পারেন, তাঁহাদের এই দ্বিতীয় শৈশবে একপ্রকার বিশোধিত গভীর প্রসন্ন শিশুস্বভাব অর্জন না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের প্রভাব মঙ্গল-সাধনে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, মাতা-পিতার প্রতিদিবসের কার্যে তাঁহাদের প্রভাব মহত্ত্বের নিঃশব্দ প্রেরণা যোগাইবে না, গৃহের মধ্যে ব্যর্থ মান-অভিমানের ও অসন্তোষের অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করিবে এবং শিশু তাঁহাদের নিকট যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহার চরিত্র-গঠনে বাধা দিবে এবং মানসিক গঠনে ক্ষতি-সাধন করিবে। আশৈশব জীবনের সুন্দর শুভ পরিণতির ফলেই ঠাকুরদার ( তেমনি ঠাকুরমার ) প্রভাব কল্যাণ প্রসব করিবে এবং সংসারের মধ্যে হাসি-খুশির একটি সুন্দর স্বাভাবিক ছন্দ রচিয়া তুলিতে পারিবে।

৯। মাতা-পিতার মধ্যে মতের অমিল থাকিতে পারে ; সেই অমিল সামান্য ও অগভীর হইলে শিশু-চিত্তের তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সেই মতবিরোধ তাঁহাদের অন্তরের অপ্রীতি প্রকাশ করিতে থাকিলে, তাহা শিশুর মনে পীড়া সৃষ্টি করে এবং তাহার সুষম আত্মবিকাশে বাধা দেয়। সেই সব সম্ভাবনাই মাতা-পিতার সহিত পিতামহ-পিতামহীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আছে। মাতা-পিতার মতামত ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মতামতের সহিত সকল বিষয়ে মিলিতে পারে না। কারণ, কালের গতির সহিত সমাজের, গৃহের, ব্যক্তির অবস্থা এবং বিচার বিবেচনা ধারণা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন মত বর্তমানে সম্পূর্ণ সমর্থন পায় না। পিতামহ-পিতামহীর মন যে কালের পরিবর্তনের সহিত সকল দিকে পরিবর্তিত হইবে, সে কথা বলা যায় না। তাঁহাদের মনে পুরাতনের ধারণা অভ্যাস কিছু-না-কিছু থাকিবেই, কারণ তাঁহারা সংসারে ও সমাজে এখন আর ঘনিষ্ঠ যোগ রাখেন না বলিয়া সমাজ ও সংসারের পরিবর্তন তাঁহাদের প্রাচীনতাকে একেবারে আধুনিক করিতে পারে

না। তাঁহাদের মনে যেটুকু অনাধুনিক ভাবধারা ও অভ্যাস থাকে, তাহা আধুনিক মাতা-পিতার পক্ষে একটু অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা হইতে মায়ের ও পিতার মতের পার্থক্য থাকিলে শিশুর মনের অসুবিধা হইবার কথা। শিশু মাতা-পিতার বিরুদ্ধে যাইতে চাহে না—তাঁহাদিগকে ভালবাসে বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধতা পছন্দ করে না। আবার কখনো কখনো সাহসে কুলায় না বলিয়া বিরুদ্ধাচরণ করে না। শিশুর সামান্য অবাধ্যতায় মাতা-পিতার প্রতি গভীর বিরোধ আছে অনুমান করা ঠিক নহে; অন্তরের গভীর বৈরভাব মাতা-পিতার প্রতি অবাধ্য হওয়ার মধ্যে যে প্রকাশ পায় না, তাহা নহে। কিন্তু তাহার ক্ষেত্র কম এবং প্রভাবও কম। শিশুর অবাধ্যতা সাধারণতঃ তাহার ক্রম-বর্ধমান স্বাবলম্বনের পরিচয় মাত্র, ইহা তাহার মাতৃ-পিতৃ-নিরপেক্ষতার পরীক্ষা এবং কম-বেশি স্বাতন্ত্র্য-সুখের আস্বাদন। অতএব বলা যাইতে পারে, স্বভাবতঃ শিশু তাহার মাতা-পিতার মতামতের বিরুদ্ধতা চাহে না। অপরদিকে ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মতামতকেও সে অবজ্ঞা করিয়া উৎসাহ বা সুখ পায় না। তাহার মাতা-পিতা মতের অনেক অমিল থাকা সত্ত্বেও ঠাকুরদা-ঠাকুরমাকে সম্মান করেন; শিশুও তাঁহাদিগকে ভালবাসে। এরূপ দো-টানার মধ্যে শিশুর বিপদ হয়। মাতা-পিতা যদি ঠাকুরদা-ঠাকুরমাকে গ্রাহ্যের ভিতর না আনেন, তাহা হইলে অবশ্য পৃথক কথা, শিশু সহজেই ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মত উপেক্ষা করিবে বা তাঁহাদের প্রতি উদাসীন থাকিবে। শিশুর জ্ঞানে মতামতের সূক্ষ্ম বিচার কিছু থাকে না; সে মোটামুটি মাতা-পিতার এবং দাদু-দিদিমার ভাবটুকু একরকম করিয়া অনুভব করে এবং 'ইহা করিয়ো না' 'উহা করা উচিত' এই প্রকার সোজা নির্দেশগুলি বুঝিতে পারে। শিশু মাতা-পিতা ও ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মধ্যে যে অনৈক্য অনুভব করে তাহাতে তেমন সূক্ষ্মতা নাই, তাহা একটি সামাগ্রিক ভাবধারা।

১০। মাতা-পিতা ও দাদু-দিদিমার মধ্যে মতের পার্থক্য কোনো গভীর বিরুদ্ধতার সহিত যুক্ত থাকিলে ক্রমশ তাহা অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। পিতা এককালে শিশু ছিলেন এবং পিতামহ এককালে গৃহকর্তা ছিলেন। পিতার শৈশবে হয়তো তাঁহার পিতার প্রতি বৈরিতার সৃষ্টি হইয়াছিল; অথবা ঠাকুরদা তাঁহার নিজের যৌবনের সন্তানকে পিতৃ-আদরে লইতে পারেন নাই, হয়তো তাঁহার অন্তরে সন্তান-বর্জনের গূঢ় কামনা পীড়া দিতেছিল। এই-সকল বিরুদ্ধভাব অনেক বৎসর আগের বিষয় হইলেও আজিও নিষ্ক্রিয়

হয় নাই। আজিও তাহা সামান্য সামান্য পার্থক্যের ছুতা পাইয়া বোধে ও ব্যবহারে তীব্রতার, রূঢ়তার সৃষ্টি করিতেছে। পিতার মনে শৈশবের পিতৃ-বৈরিতা রহিয়াছে; ঠাকুরদার মনের গহনে সন্তান-বিমুখতা রহিয়াছে। ইহার ফল অনুমান করা কঠিন নহে। ঠাকুরদার এতটুকু বিরোধিতা পিতা (এবং মাতা) সহ্য করিতে পারেন না। শিশুকে পিতার রুচি-অনুসারেই চালিতে হইবে; পিতার অভিমতের সামান্য এধার-ওধার করিলে বা তুচ্ছ কোনো বিষয়ে ঠাকুরদার মতানুসারে চলিলে পিতা ক্রুদ্ধ হন, শিশু পীড়িত হয়, সংসারে অশান্তি ও অনিশ্চয়তার বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে। ঠাকুরদাও যখন শিশুকে 'প্রশ্রয়' দেন তখন বিশাল হৃদয়ের ক্ষমা ও কবিসুলভ সদানন্দভাব অপেক্ষা গূঢ় পুত্র-বৈরিতার প্রভাব অধিক থাকে। এই শ্রেণীর 'প্রশ্রয়'-দান বাস্তবে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, ক্রমশই শিশুর মনে মাতা-পিতার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের অভ্যাস সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহাতে শিশুর অমঙ্গল ও আত্মগঠনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়; কারণ, তাহার মনে সংশয় শঙ্কা পীড়া বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইয়া তাহার বিকাশ ও বৃদ্ধির ছন্দ নষ্ট করে।

১১। কোনো গূঢ় বৈরিতা বা অনৈক্য মাতা-পিতা ও দাদু-দিদিমার মধ্যে না থাকিলে মতামতের অমিল তীব্র হইতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে স্নেহ সহানুভূতি থাকিলে পরস্পরের মতামতকে বুঝিবার ও মানিবার একটি পথ পাওয়া সহজ হয় এবং বহু অমিল মিলেও পরিণতি পাইতে পারে। যেটুকু বাকি থাকে তাহাও আনন্দের বেগে হালকা হইয়া উঠে, তাহাতে শিশুর মনে অনভিপ্রেত কিছু পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে।

১২। এই প্রসঙ্গে শিশুর মা ও ঠাকুরমার সম্বন্ধটি মনে পড়ে। আমাদের মন যেন বাস্তবে কিছু খুঁজিতে গিয়া ব্যর্থ হয়, তখনই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি আদর্শ পিতামহী নিতান্তই বিরল হন, আমরা গৃহে আদর্শ পিতামহীর কল্পনা করিয়া লই। কল্পনার পিতামহী কামস্পৃহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও পরিণতির পর বিশুদ্ধ কামরহিত দৃষ্টিতে সকলকে বিচার করেন; তাঁহার মনের কোণে কোনাপ্রকার অতৃপ্ত কামনার পীড়া নাই। অভাবের এবং কামনার ধন না পাওয়ার স্মৃতি মনকে এখন আর বিচলিত করে না। কাহারও অস্বাভাবিক দাবি নাই, অপরের সুখে বা কামনায় তাঁহার কোনো ঈর্ষা নাই। কল্পনার এই ঠাকুরমা হয়তো নিতান্তই কল্পনার বিষয়, বাস্তব জগতে তাঁহাদের সংখ্যা বেশি নয়। বাস্তবে দেখা যায়, প্রায়ই ঠাকুরমার মনের

গহনে অতৃপ্ত কামনার পীড়া লাগিয়া রহিয়াছে, নিজের পুত্রবধূর ভাগ্যের প্রতি গোপন ঈর্ষা বর্তমান, পুত্রের সম্পর্কে তাঁহার এতদিনের অধিকার এক তিলও ত্যাগ করিতে তাঁহার মর্মান্তিক পীড়া ও একান্ত অনিচ্ছা। মনোবিশ্লেষণে মাতা-পুত্রের মধ্যে একটু কামের স্পর্শ বরাবরই থাকে বলিয়া মনোবিদ্‌গণের বিশ্বাস। মাতা পুত্রকে যে স্নেহ দান করেন, তাহাতে তাঁহার কামসুখে একটি প্রচ্ছন্ন ধারা বর্তমান। ইহা দেহাতীত সুখ বলিয়া মনে হইলেও কিছু-না-কিছু কামের প্রভাব মাতা-পুত্রের মধ্যে থাকে—ইহাই মনোবিশ্লেষকের ধারণা। পুত্র যখন বড় হইয়া বধূকে গৃহে আনিয়া নূতন কামসম্বন্ধ পাতাইতে থাকে, মায়ের চিত্তে তখন কোথা হইতে যেন প্রতিবাদের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার গূঢ় অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে। পুত্রের দেহগত ভোগে মাতা আপত্তি করিতে পারেন না, সেই কারণে পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের মনোযোগ দেওয়াকে বাধা দিতে থাকেন। বধূর প্রতি পুত্রের মনোযোগ ও ভালবাসা তাঁহার প্রাপ্য সম্মান ও মনোযোগের বিরোধিতা করে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে থাকে, তিনি অন্তরে পীড়া অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার অন্তরের পীড়া পুত্রবধূর উপর কর্কশ ব্যবহারে, পুত্রের সহিত খুঁটিনাটি অনৈক্যে এবং শিশু-নাতি-নাতনীকে অনর্থক প্রশ্রয়-দানে প্রকাশ পায়। মায়ের সহিত ঠাকুরমার অপ্রীতিটুকু শিশু ঠিক বুঝিয়া লয়। ঠাকুরমা তাহাকে যথেষ্ট আদর করিলেও শিশুর অন্তরে মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্ষয় হইয়া যায় না। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া শিশুচিত্তে দ্বন্দ্ব, একটু বা কপটতা, সৃষ্ট হয়; তাহার আত্মগঠনের বাধা ঘটিতে থাকে।

১৩। শিশুর বিকাশের জন্য আদর্শ ঠাকুরদা-ঠাকুরমার আনন্দ-আশ্রয় যে পরিমাণ শুভ প্রভাব দান করিতে পারে, তাঁহাদের মানসিক অতৃপ্তি ও অপরিণতি, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী এবং গূঢ় বিরোধিতা থাকিলে তেমনি ক্ষতিও করিতে পারে। যোগ্য পিতা-মাতা হইতে গেলে যেমন তপস্যার প্রয়োজন, আদর্শ দাদু-দিদিমা হইয়া উঠাও তেমনি সুদীর্ঘ জীবনের সার্থক পরিণতির অপেক্ষা রাখে। কেবলমাত্র জৈব চেষ্টার পরিণামে, দেহের বয়স ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, উল্লিখিত কোনো আদর্শেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

## আলোচনা-সূত্র

১। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা নাতি-নাতিনীদের যে 'প্রশ্রয়' দেন, তাহার সুফল ও কুফল দুই দিকই আছে। দৃষ্টান্ত দিন।

২। এইরূপ প্রশ্রয় অনেক সময় গৃহের মঙ্গল সাধন করে। কি অবস্থায় মঙ্গল হইতে পারে, আলোচনা করুন।

৩। নাতি-নাতিনীদের উপর ঠাকুরদার প্রভাব যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহার মধ্যে পিতা ও ঠাকুরদার গূঢ় সম্বন্ধ একটি। আলোচনা করুন।

৪। ঠাকুরদা ঠাকুরমার পক্ষে নাতি-নাতিনীদের 'অপরাধ' লঘু করিয়া দেখা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কিভাবে এরূপ ঘটে, তাহার বর্ণনা দিন।

৫। সার্থক ঠাকুরদা-ঠাকুরমা হইতে গেলে যৌবনকাল হইতেই সাধনার প্রয়োজন। কি অর্থে ইহা সত্য, তাহা আলোচনা করুন।

৬। অনেক গৃহেই দেখা যায়, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা নাতি-নাতিনীদের এমন অন্যায় প্রশ্রয় দেন যে, শিশুদের ক্ষতি হয়। ইহার কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব, আলোচনা করুন।

৭। যে গৃহে ঠাকুরদার ঠাকুরমার সম্মান ও প্রভাব স্বাভাবিক এবং সকলের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য, সে গৃহে শিশুরা 'অন্যায়' প্রশ্রয় পায় না। আলোচনা করুন।

৮। পিতার সহিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মতের মিল কি সকল ক্ষেত্রেই, শতকরা এক শত ক্ষেত্রেই, সম্ভব? সকল ক্ষেত্রে মতের মিল না ঘটিলে কি ঠাকুরদার উপস্থিতি সংসারে ক্ষতিকর? আলোচনা করুন।

৯। পিতার সহিত ঠাকুরদার মতের অমিল ঘটিবার বাহ্য কারণ ও উপলক্ষ্য খুবই তুচ্ছ হইলেও অনেক সময় দেখা যায় নাতি-নাতিনীদের লইয়া গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ কি?

১০। বধূ ও শ্বশ্রূ ইঁহাদের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি বিরাজ করে। ইহার কি কারণ অনুমান করেন?

১১। মা ও ঠাকুরমা, ইঁহাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ না করিলে শিশু-চিত্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়। কেন?

১২। যে ঠাকুরমা যৌবনে পরিতৃপ্ত, তাঁহার পক্ষে আদর্শ ঠাকুরমা হইয়া ওঠা স্বাভাবিক। ইহা কতদূর সত্য?

১৩। আর্থিক সচ্ছলতা থাকিলে ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ব্যবহার অনেকটা সার্থক হয়। ইহা কতদূর সত্য?

১৪। পিতার আর্থিক অক্ষমতা, ঠাকুরদার অর্থ-শক্তি—সংসারে এই অবস্থা বর্তমান থাকিলে শিশু-চিত্তের বিকাশ কিরূপ হইবে অনুমান করেন?

১৫। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা ও পিতামহ-পিতামহীর স্থান—আলোচনা করুন।

১৬। বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও পিতামহ-পিতামহীর প্রভাব আলোচনা করুন।

# বিশেষিত পরিবেশ

## সাধারণ কথা

১। শিশু নিজেকে গঠন করে, ইহা সত্য। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পিতামহ-পিতামহী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি শিশুর আত্মবিকাশে সাহায্য করেন এবং পরিচালিত করেন, ইহাও সত্য। তথাপি পরিবেশের মধ্যস্থতা না পাইলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেন না। পরিবেশের অন্তর্গত তাঁহারা ও তাঁহাদের আচার ও আচরণের ভিতর দিয়া তাঁহাদের অন্তরের প্রকাশ শিশুর পরিবেশেরই অন্তর্গত। শিশুর আত্মগঠনে সাহায্য করিতে এবং তাহাকে অভিপ্রেত দিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে অনুকূল পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ আবশ্যক। শিশুর অন্তর যেদিকে বড় হইয়া উঠুক কামনা করা যায়, সেই দিকে তাহাকে সাহায্য করিতে হইলে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন। যেমন চাহিতেছি তেমনটি হইয়া উঠুক, এই ইচ্ছা ও চেষ্টা সার্থক করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ পরিবেশ-সৃষ্টির বিষয় জানা চাই।

২। শিশুর আত্মগঠনের সময় তাহার অন্তরে ও বাহ্য আচরণে মাঝে মাঝে এমন অনেক-কিছুর পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা আমরা ভালো বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা এই-সকল ত্রুটি হইতে শিশুকে মুক্ত দেখিতে চাই এবং শিশু এইগুলি অতিক্রম করিয়া নূতনভাবে নিজেকে বিকশিত করিতেছে দেখিলে সুখী হই। অপর দিকে শিশুর অন্তরের প্রকাশে এবং বাহিরের আচরণে কিছু আকাঙ্ক্ষা-অনুরূপ ভালো দেখিলে ইচ্ছা হয় সেই ভালোটুকুকে যথাসাধ্য সাহায্য করি। শিশুর জীবনে এই প্রকার ভালো-মন্দের উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। আলোচনায় ইতস্ততঃ উল্লিখিত সু এবং কু'র দৃষ্টান্তগুলি একত্র করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলে পরিবেশকে তদনুসারে বিশেষ বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও রচনা করা সহজ হয়। সেই উদ্দেশ্যেই শিশুর জীবনের বিশেষ বিশেষ শুভ ও অশুভ সম্ভাবনা সংক্ষেপে পুনরুল্লিখিত হইতেছে এবং অভিপ্রেত আদর্শ পরিবেশের ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে। পুনরুক্তি সাধারণতঃ দূষণীয় হইলেও, ছড়ানো বিষয়কে ধারণায় গুছাইয়া লইতে গেলে তাহারও প্রয়োজন আছে।

## ঈর্ষা

৩। বয়স্কদের আচরণে ঈর্ষার প্রকাশ ঘটিলে তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে হয় অর্থের ব্যাপারে বা কামের ব্যাপারে। ঈর্ষার এই দুইটিই প্রধান কারণ, হয়তো এই দুইটি কারণের বাহিরে আর কোনো কারণ নাই। বহু ক্ষেত্রে বহুপ্রকার ছদ্মবেশে অর্থ বা কাম-ঘটিত বাসনা বা উভয়ই আত্মগোপন করিয়া থাকে, এবং সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে উহাই বয়স্ক জীবনের ঈর্ষার কারণ বলিয়া ধরা পড়ে।

৪। শিশুর ঈর্ষা অর্থের কারণে হয় না এবং কামও ঠিক ইহার কারণ বলা চলে না। শিশু অর্থ চেনে না, জন্ম হইতে অর্থসন্ধানী কোনো প্রবৃত্তি লইয়া আসে না। তাহার অর্থ-জ্ঞান পরিবেশেরই দান। দারিদ্র্যের পীড়নে বা অর্থ-সর্বস্ব পরিবেশে শিশু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অর্থের মর্যাদা বুঝিতে শিখে। তথাপি শিশু অর্থের কারণে ঈর্ষা-বোধ করে না বলাই চলে। মাতা-পিতার অনুকরণে সে অনেক সময় এমন-সব কথা বলে বা এমন-সব আচরণ করে যে, মনে হয় বুঝি তাহার অন্তর অর্থলোভ-জনিত ঈর্ষায় খুব পীড়িত। আসলে তাহার অন্তরে ঐরূপ ঈর্ষা স্থান পায় না, ঈর্ষার 'প্রকাশ'টুকু নিতান্তই বাহিরের অনুকরণ মাত্র। অসাধারণ ক্ষেত্রে শিশুর অর্থলোভ-ঘটিত ঈর্ষা থাকিতে পারে, ইহার সংখ্যা অত্যল্প।

৫। শিশুর কামজ ঈর্ষা নাই বলিলে একেবারে ঠিক ঠিক বলা হয় না, আছে বলিলেও অতিরঞ্জন হয়। শিশুর কাম-ক্ষুধা কাম-শ্রেণীর হইলেও কামের বিকাশ অন্য স্তরে। ইহাকে কাম-ক্ষুধা না বলিয়া স্নেহ-ক্ষুধা বলা যায়। শিশুর ঈর্ষার কারণ স্নেহ-ক্ষুধা হইতে পারে। এমন-কি 'হইতে পারে' না বলিয়া স্নেহ-ক্ষুধাই তাহার ঈর্ষার কারণ, স্নেহ-লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার ঈর্ষার কারণ, ইহাই বলা উচিত। জন্ম হইতেই স্নেহ-ক্ষুধার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, শিশুর স্নেহ-ক্ষুধা জন্মগত নহে বলিয়াও অনেকের থারণা আছে। সে যাহাই হউক, শিশুর স্নেহ-ক্ষুধাকে আমরা অত্যন্ত প্রবল দেখিতে পাই। শিশুর সাধারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রতি তেমন লক্ষ্য থাকে না, এমন কি, সময় সময় স্নেহ-বোধ জাগ্রত করিয়া দিলে শিশুর দেহগত ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়া শান্ত হয়। বয়স্ক জীবনেও দেখা যায় দেহের পীড়ার সময় স্নেহভাষণ কিছুক্ষণের জন্য পীড়া ভুলাইয়া দেয়। শিশু যে-কোনো পীড়ায়

মাতৃস্পর্শের জন্য কাঁদে, তাহার একটি বড় কারণ স্নেহ-ক্ষুধা। মাতৃস্পর্শে তাহার স্নেহানুভব ঘটে বলিয়া তাহার ক্লেশ আংশিক কমিয়া যায়। ইহা নিছক অনুমান হয়তো নহে। অতি শৈশবে শিশুর ইচ্ছা যত ভাবে যত দিকে প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে মাতৃ-স্নেহ পাইবার ইচ্ছাটাই প্রধান ও প্রবল।

৬। শিশু বয়োবৃদ্ধির সহিত নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকে, তাহার ইচ্ছার ক্ষেত্র ক্রমশঃই বিস্তৃত হইয়া যায় এবং তাহার স্নেহ-দাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিশু প্রথম প্রথম খেলনা চিনিত না, সে খেলনা চিনিতে শিখে। শিশু চাহিতে জানিত না, ক্রমশ সে ভাবে ভঙ্গিতে ভাষায় চাহিতে থাকে। চাহিতে চাহিতে সে তাহার ইচ্ছার বস্তু লইয়া অপরের সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবু ঈর্ষা তখনো তাহার অন্তরে জাগে নাই। চাহিবার, লড়াই করিবার উপলক্ষ্য দিন দিন বাড়িতে থাকে, তবুও ঈর্ষা নাই। মা শিশুর প্রথম স্নেহদাত্রী, অপরের স্নেহ শিশু প্রথমে ধারণায় আনিতে পারে না। মা হইতে পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, সঙ্গী-সাথী, প্রতিবেশী সকলের স্নেহস্পর্শ লাভ করিতে থাকে এবং সকলকেই আপন খেয়াল অনুসারে শিশু স্নেহদাতা বলিয়া অনুভব করে। ক্রমশঃ ঈর্ষার সূচনা দেখা দিল। শিশু এতদিনে খাদ্য চিনিয়াছে, হয়তো একটু-আধটু অর্থও চিনিতে পারিয়াছে এবং এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া হয়তো ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিশুর নিকট খাদ্য খেলনা পোশাক প্রভৃতির মূল্য প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর। একটি মূল্য ব্যবহারিক, সে ব্যবহার করিয়া নূতন নূতন অভিজ্ঞতার দ্বারা সুখলাভ করে। দ্বিতীয় মূল্য, সে এইগুলি পাইয়া, অধিকার করিয়া, যেমন-তেমন ব্যবহার করিয়া, নিজেকে মাতৃ-নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে থাকে। এইগুলিকে স্নেহের প্রতীকরূপে অনুভব করে—ইহাই উপহার-সামগ্রীর তৃতীয় মূল্য। যিনি যত বেশি দ্রব্যাদি দিতেছেন, তিনি যেন ততই বেশি স্নেহ করেন। যে ব্যক্তি শিশুকে দ্রব্যাদি দেয় না, শিশুর প্রতি তাহাকে হাসি-খেলা-আদর প্রভৃতির দ্বারা স্নেহ প্রকাশ করিতে হয়। শিশু কখন যে কোন্ দ্রব্যটিকে বা কোন্ ব্যক্তির কোন্ আচরণটিকে স্নেহের প্রতীকরূপে অনুভব করিবে, তাহার কিছু ঠিক নাই। কোন্ বস্তু বা কোন্ ব্যবহারকে কোন্ দিক দিয়া সে মূল্য দিবে না, তাহারও ঠিক নাই। ইহা শিশুর খেয়াল। শিশু যখন কোনো কিছুর জন্য লড়াই করে, তাহা না পাইলে তখন তাহার ক্রোধ হয়, কাঁদে;

কিন্তু ঈর্ষা হয় না। লড়াইয়ের বস্তুটি যদি স্নেহের প্রতীক-রূপে শিশু অনুভব করে এবং সেই লড়াই যদি স্নেহ-অধিকার বজায় রাখিবার জন্য হয়, তাহা হইলে ঈর্ষা জন্মিতে পারে। স্নেহের প্রতীক হারাইয়া যাওয়া শিশুর মনে স্নেহ হারাইয়া যাওয়ার মত পীড়াদায়ক। 'প্রতীক' শব্দটি বয়স্কদের মনের উপযুক্ত। শিশুরা প্রতীকের দ্বারা সূক্ষ্ম চিন্তা বা অনুভূতির সোপান সৃষ্টি করিয়া মূল বিষয়ে পৌঁছায় না। তাহারা প্রতীক ও সমস্ত ব্যাপারটি এক করিয়া ফেলে। মাতৃস্পর্শে তাহার সমগ্র মায়ের প্রতিরূপ যেমন জাগ্রত হয়, মায়ের দেওয়া খেলনা লইয়া যখন যে স্নেহ-দ্বন্দ্ব আরম্ভ করে, তাহার চিত্তে সেইরূপ সমগ্র মাতৃস্নেহই অনুভূত হয়। খেলনা ছাড়িয়া দিলে যেখানে মায়ের স্নেহ হারাইতে হয়, সেখানে খেলনা ছাড়া কী করিয়া সম্ভব? বাধ্য হইয়া মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলে ঈর্ষা হইবারই কথা। মাতৃস্নেহের বেলায় যেরূপ, ক্রমশ অপরের স্নেহের বেলাতেও সেইরূপ। শৈশবে এই স্নেহের ঈর্ষাই ঈর্ষা, অন্য সকল পীড়া সাময়িক ক্রোধ দুঃখ ইত্যাদি।

৭। স্নেহদাতার স্নেহ সম্বন্ধে শিশু যদি নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে ঈর্ষার কথা নাই। স্নেহের বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সন্দেহ দেখা দিলে শিশু-চিত্তে ঈর্ষার সৃষ্টি হইতে পারে; যে শিশু বা যে ব্যক্তি স্নেহ-দাতার অধিক স্নেহ দখল করিয়া বসে, শিশু বা সেই ব্যক্তি বঞ্চিত শিশুর নিকট ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহের পক্ষপাতিত্ব সন্দেহ করিলে, তবে ঈর্ষা জন্মে; শৈশবে ইহাই ঈর্ষার প্রবলতম বা একমাত্র কারণ। একবার ঈর্ষা জন্মিয়া গেলে ইহা ক্রমশ অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। তখন কারণ না থাকিলেও কারণ আছে অনুভূত হয়। এতটুকু হাসি, এতটুকু কাছে বসা, এতটুকু উদ্বেগ ঈর্ষাপীড়িত মনে নূতন ঈর্ষার সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা কি শিশু, কি বয়স্ক ব্যক্তি, সকলের সম্পর্কই সত্য।

৮। বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্তরে স্নেহ-সাম্য প্রায়ই থাকে না। প্রতিবেশীর খোকাটি ফর্সা হইলেও চিরকাল 'খোকাটা কটা'। নিজের খোকা কালো হইলেও 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ'। স্নেহের ও আদরের সমতা সাধারণ পাঁচ জনের মধ্যে না থাকিতে পারে। বিভিন্ন শিশু-সন্তান সম্পর্কে মাতা-পিতার স্নেহ-সাম্য না থাকা অনেকটা স্বধর্মচ্যুতির ন্যায় দুঃখজনক। কার্যতঃ তবু দেখা যায়, মাতাপিতার কায়মনোবাক্যের ভাবে ভঙ্গীতে আচরণে বহু সন্তান-সন্ততির প্রত্যেকটিতে সমান স্নেহ থাকে না। আর্থিক অবস্থা, প্রথা, সংস্কার,

আপনার মনের গূঢ় অসামঞ্জস্য প্রভৃতি বহুবিধ কারণে স্নেহের বৈষম্য ঘটিতে পারে। কেহ জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অধিক ভালবাসেন, কেহ কনিষ্ঠকে; কাহারও নিকট কন্যা অবাঞ্ছিত, কাহারও নিকট পুত্র অপেক্ষা কন্যাই ভালো। কথায়-বার্তায়, প্রতিদিনকার ব্যবহারে অন্তরের স্নেহ-পক্ষপাত ও কার্পণ্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

৯। বাহিরের আচরণের কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে; সাধারণতঃ এইগুলি অবলম্বন করিয়াই স্নেহ, অল্প বা অধিক হউক, প্রকাশ পায়। স্পর্শ করা, কোলে লওয়া, মিষ্ট বাক্য বলা, শিশু যাহা বলে তাহা পালন করা, এগুলি আদরের বিশেষ প্রকাশ বা সার্থক কৌশল। ইহার সহিত মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, চিত্তাকর্ষক খেলনা, পছন্দসই জামা-কাপড় প্রভৃতি উপায় এবং উপকরণগুলি আছে। যাহাকে ভালো লাগে, তাহার সহিত একটু অধিক কথাবার্তা বলা, একটু সান্নিধ্যে আসা, একটু অধিক মনোযোগ দেওয়া মনের স্নেহাধিক্যের ইঙ্গিত দেয়। সম্মুখে বা আড়ালে সুখ্যাতি করিতে এমন-কি একজনের নিন্দা করিয়া প্রিয়জনের প্রশংসা করিতেও দেখা যায়। প্রিয় শিশুটির জন্য অপর শিশুকে ফাই-ফরমাশ খাটানোর অভ্যাসও অনেকের আছে। আদর, উপহার, মনোযোগ, প্রশংসা, একজনের নিন্দার দ্বারা আর-এক জনকে খ্যাতি দেওয়া, এক জনের জন্য অপর জনকে পরিশ্রম করানো—এগুলি দৈনন্দিন ব্যাপার। এ-সকল বিষয়ে অল্পতা বা আধিক্য ঘটিলে স্নেহের দৈন্য বা অতিরিক্ততা বোঝায়। শিশু হইলেও শিশু এই-সব অসাম্য দেখিয়া স্নেহের অসাম্য বুঝিতে পারে। তখন বঞ্চিত শিশুর অন্তঃকরণে ঈর্ষার সূচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। অন্তরে শিশু ঈর্ষার পীড়া বোধ করিতে থাকিলে তাহার আচরণে কয়েকটি লক্ষণ ক্রমশ দেখা দেয়। সকল লক্ষণ যে তাহার আচরণে ফুটিয়া উঠিবে তাহা নহে। তবে একটি-না-একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবেই। একদিনেই ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না, একদিনেই আচরণে ঈর্ষার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে না। কিন্তু ঈর্ষার ক্ষত শিশু-মনে একবার সৃষ্ট হইলেই দিন দিন এই-সব লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া ওঠা সুনিশ্চিত। লক্ষণগুলি সাধারণতঃ এই :—

(১) শিশু যাহার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে, সেই ঈর্ষার পাত্রকে অপদস্থ অপ্রস্তুত ও পীড়িত করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে। বয়স্ক ব্যক্তিদের সাহায্যে তাহার এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে চেষ্টা করে এবং

বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যাচরণও করিতে পারে। শিশু তাহার ঐটুকু জীবনে কেমন করিয়া যে নানাপ্রকার কৌশল আবিষ্কার করে তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। অবশ্য, শৈশবের শেষের দিকেই এই আচরণ দৃষ্ট হয়।

(২) ঈর্ষার পাত্রের সম্মুখে বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট নিজেকে বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা আর-এক শ্রেণীর আচরণ। অকারণ নিজের গুণপনা-প্রদর্শন অথবা তাহাও ব্যর্থ হইলে অল্পবয়সী শিশুর উপযুক্ত আচরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অহেতুক হামাগুড়ি দেওয়া, লাফানো চেঁচানো প্রভৃতি শিশুর বয়সোচিত না হইলেও শিশু এইগুলিকে কৌশলরূপে ব্যবহার করে। ইহা শৈশবের মধ্য-বয়সে অধিক দেখা যায়।

(৩) ঈর্ষার বশে শিশু স্বার্থপরতার আভাস দিতে থাকে। নিতান্ত শিশুর নিকট স্বার্থপরতার ধারণা থাকে না; অপর পক্ষে একটু বয়স হইলে, শিশু স্বাভাবিকভাবেই অন্যের সহিত সামান্য সামান্য সাহায্যের লেন-দেন করিতে পারে। ঈর্ষা-পীড়িত মনে এই সামাজিক গুণটি সহজে ফুটিতে চাহে না। কেবলমাত্র ঈর্ষার পাত্রের সম্পর্কেই যে শিশু অসামাজিকতা প্রদর্শন করে, এমন নয়। ইহা ক্রমশ তাহার অভ্যাসে দাঁড়ায় এবং বহুজনের ক্ষেত্রেই শিশুর স্বার্থপরতা দেখা যায়।

(৪) শিশুর অকারণে আক্রমণ করার ঝোঁক ঈর্ষার জন্য সৃষ্ট হইতে পারে। বিশেষ কিছু কারণ না ঘটিতেই শিশু তাহার ঈর্ষার পাত্রের উপর বা তাহার সমর্থকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সাধ্যমতে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ঈর্ষার সাময়িক তৃপ্তি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে এইরূপ আক্রমণ করার অভ্যাস গঠিত হইয়া যায়। তখন যে-কোন শিশুকে আক্রমণ করিবার জন্য সে যেন সদাসর্বদা প্রস্তুত হইয়াই থাকে। শারীরিক আক্রমণের সুবিধা না হইলে নিন্দাবাদ ও গালাগালির আশ্রয় গ্রহণ করে।

(৫) ঈর্ষার দ্বারা শিশুর অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে, এরূপ অবস্থার প্রধান লক্ষণ শিশুর সমাজ-বিমুখতা। অনেক সময় ঈর্ষার পাত্রকে নিচু করিতে না পারিলে অথবা তাহার অপসারণ সম্ভব না হইলে শিশু নিজেকে বাহিরের সঙ্গী-সাথী খেলা-ধূলা হইতে সরাইয়া রাখে। তাহার মনে বাহিরের প্রতি উৎসাহ থাকে না, তাহার মানসিক বিস্তৃতি অতি সামান্যই হয়। শিশুর অন্তর্মুখী অবস্থা কালক্রমে নানারূপ মানসিক রোগে দাঁড়াইতেও পারে। ঈর্ষার দ্বারা

সৃষ্ট মানসিক পীড়া কতকগুলি দেহগত ত্রুটি অবলম্বন করিতে পারে। শিশুর যে বয়সে মলমূত্র-ত্যাগে আত্মকর্তৃত্ব স্বাভাবিক, সে বয়সে নিদ্রার মধ্যেও তাহার এরূপ কর্তৃত্ব অটুট থাকে। যদি কোন শিশু স্বাভাবিক ক্ষমতা-লাভ সত্ত্বেও নিদ্রার সামান্য আবেশেই ইহা হারাইয়া ফেলে এবং অসাড়ে বিছানা নষ্ট করিয়া বসে, তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিশুর মন অংশত অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই লক্ষণ দেহের উপর কর্তৃত্বের আংশিক হ্রাসে দেখা যাইতেছে। শিশু জানেও না তাহার মনের গহনে কী হইয়াছে; সে শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিদ্রাকালে দৈহিক বেগ ধারণ করিতে পারে না। অনেক সময় উদরাময়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা শিথিল হইয়া আসে।

(৬) পিতা মাতা বেশি সময় একত্র থাকেন বা বিশ্রাম ভোগ করেন—শিশু ইহা চায় না। মা তাহার পিতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আচরণ করিলে শিশুর মনে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। শিশু নানা ছল-ছুতা খুঁজিতে থাকে—একবার বলে ক্ষুধা পাইয়াছে, অথচ খাদ্য দিলে পড়িয়া থাকে; একবার বলে তৃষ্ণা পাইয়াছে, জল কাছে থাকিলেও স্পর্শ করে না; বারে বারে মল-মূত্রের বেগ অনুভব করে, মাকে পিতার নিকট হইতে উঠিয়া আসিতে হয়। দুই তিন বৎসরের শিশুও এত কৌশল অবলম্বন করিতে পারে। তাহার উদ্দেশ্য মাকে পিতার নিকট হইতে নিজের নিকটে আনয়ন করা। ইহা ঈর্ষারই রূপান্তর।

:১। শিশুর আচরণে বহুপ্রকার লক্ষণের মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি নানারূপে নানাভাবে মিশিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। মাতা-পিতার এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে রাখা কর্তব্য যে, তাঁহাদের হৃদ্গত ও আচরণ-গত স্নেহ-বৈষম্যই শিশুর এরূপ ঈর্ষার জন্য দায়ী। আদর, উপহার, মনোযোগ, নিন্দা, প্রশংসা প্রভৃতির মধ্যস্থতায় অন্তরের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। যত্ন ও আন্তরিকতা-সহকারে প্রতিদিনের আচরণে অপক্ষপাত স্নেহব্যক্তি অভ্যাস করা কর্তব্য। আচরণে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করা কোনো কারণেই সমর্থনযোগ্য নহে, এমন-কি ঈর্ষা-পীড়িত শিশুকে সান্ত্বনা দিবার জন্যও নয়। মাতা-পিতার কর্তব্য বড় কঠিন, তাঁহাদিগের অল্প অসতর্কতা ও পক্ষপাতিত্বের ফলেই শিশুর নিদারুণ মনঃপীড়া ও সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। মাতা-পিতার পারস্পরিক আচরণে অতি সাধারণ

শোভন ও সংযত ঘনিষ্ঠতার অতিরিক্ত কোনো ভাব প্রকাশ পাওয়া শিশুর পক্ষে কল্যাণকর নহে।

## ভয়

১২। অনেকের বিশ্বাস—ভয় পাওয়া জন্মগত ব্যাপার, ইহা প্রকৃতির দেওয়া আত্মরক্ষার একটি ভালো কৌশল। শিশু জন্মমাত্র ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করে কিনা দেখিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করা হইতেছে। সেই সকল পরীক্ষা হইতে নিঃসংশয়ে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে, অতি অল্প বয়সেই শিশু ভয় পাইতে পারে এবং ভয়ের উপলক্ষ্য নির্দিষ্ট কিছু নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত ভয়ের উদ্দীপকের সংখ্যা বাড়িতে পারে। ভয়কে জয় করা যায়, ভয়কে জয় করিয়াই সাহস প্রকাশ করিতে হয়, উহাতেই বীরত্ব। শোনা যায় যিনি বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহারও ভয়ের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার সহিত ভীরু ব্যক্তির প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি ভয়কে জয় করিয়া চলেন, আর ভীরু ব্যক্তি ভয় হইতে দূরে দূরে থাকিতে চায়। শিশু বীরও নহে, ভীরুও নহে। সে 'হইয়া-ওঠা'র অবস্থায় আছে। শৈশব দেখিয়া কাহারও সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা উচিত নহে—সে ভীরু হইবে না বীর হইবে। তাহার পরিবেশ-অনুসারে তাহার ভীরুতা বা সাহস প্রাধান্য লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, শিশুর আপন বৈশিষ্ট্য-অনুসারে তাহার আত্মগঠন সম্পন্ন হইবে; পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের এমন কোনো মন্ত্র নাই যাহার দ্বারা তাহার নিজস্ব সম্ভাবনা উড়াইয়া দিতে পারা যায়; তথাপি এ কথা বলা চলে যে, কোনো শিশুকেই শৈশব হইতে ভীরু বা সাহসী বলিয়া স্থির ধারণা করা উচিত নহে।

১৩। শিশু কিসে ভয় পায়, আর কিসে ভয় পায় না স্থির করা অসম্ভব। এখন যাহা দেখিলে তাহার ভয় হয় না পরক্ষণেই তাহা ভীতির কারণ হইয়া উঠিতে পারে; এখন যাহা ভয়ের উদ্রেক করে, পরে তাহাকে খেলার অঙ্গ করিয়া লইতে শিশুর বাধে না। ভয়ের কারণ যেমন নির্দিষ্ট নাই ভীতির উদ্দীপকের সংখ্যাও তেমনি অনিশ্চিত। অসংখ্য সম্ভাব্য কারণের মধ্যে সাধারণতঃ কয়েকটি অবস্থা শিশু-চিত্তে ভয়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।

১৪। অপরিচিতের ভয় শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। শুধু শিশুর পক্ষে কেন, সকল বয়সেই অপরিচিতের ভয় অল্পাধিক দেখা যায়। বয়স্ক জীবনেও পুরাতন হইতে একেবারে নূতনে আসিতে হইলে ভয় করে। নূতন অবস্থায়

বা নূতন পরিবেশেও পুরাতন জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার, বা অভ্যাসের ক্ষেত্র রহিয়াছে অনুভব করিলে ভয় কমিয়া যায়; নতুবা যাহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া ঠেকে তাহাতে ভয় হয়ই। নূতনের ভয়ও আছে, আবার আকর্ষণও আছে। আকর্ষণের জন্যই মন নূতন নূতন ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় এবং নূতন নূতন ভাবে বিকশিত হয়। নূতনের আকর্ষণ না থাকিলে মন অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু অগ্রগতির জন্য পুরাতন অভিজ্ঞতার যোগাযোগটুকু চাই। নূতন ক্ষেত্রে পুরাতন ও পরিচিত কিছু আছে কিনা মন তাহা দেখিয়া লয়, তাহার পর সে চলে। শিশুর মনও পুরাতন ধারণা, পুরাতন অভিজ্ঞতার দ্বারা নূতনের দিকে অগ্রসর হয়; নূতন তাহাকে আকর্ষণ করে, আবার ভয়েরও সৃষ্টি করে। নূতন কিছু দেখিতে, নূতন স্থানে যাইতে শিশু ভালবাসে। কিন্তু মায়ের পুরাতন কোলটুকু তাহার প্রয়োজন, মায়ের কোলে থাকিয়া নূতনের অভিজ্ঞতা গ্রহণ তাহার পক্ষে মনোমত ও স্বাভাবিক।

১৫। বয়স্ক মনের ন্যায় শিশু মনও নূতন-কিছু ব্যাপারের সম্মুখীন হইলে তাহার মধ্যে পুরাতন অভিজ্ঞতা-অনুসারে পরিচিত কিছু আছে কিনা খুঁজিতে থাকে। মন খানিকটা বুদ্ধির ব্যবহার করে, শিশুর নিকট অনুভব করাটাই প্রধান। শিশু যদি নূতন কিছু দেখিয়া অনুভব করে যে, ইহার মধ্যে কিছু কিছু ইতিমধ্যেই তাহার জানা হইয়াছে, সমস্তটাই নূতন নয়, তাহা হইলে সে সেইটির প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং সেইটিকে লইয়া নানা-প্রকার নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে। কখনো কখনো ইহার বিপরীতও ঘটিতে পারে; শিশু নূতন কিছু দেখিয়া পুরাতন অপ্রীতিকর স্মৃতি-বশে ভয় পাইতে পারে এবং পলায়নের চেষ্টা করিতে পারে। শিশুর অন্তরে হয়তো কোনো কারণে বিড়াল-ভীতি রহিয়াছে—সে বিড়াল দেখিলে ভীষণ ভয় পায়। মনের এই ভয় লইয়া সে যদি শুঁয়োপোকা দেখিতে পায় তাহা হইলে হয়তো শুঁয়োপোকার লোমের মধ্যে সে বিড়ালের লোমের পরিচয় পাইবে, তাহার বিড়াল-লোমের অনুভূতিতে বিড়ালের সমগ্র ভীতি-দায়ক রূপটি তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিবে; সে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিবে। ভয়ের অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতির সহিত শুঁয়োপোকার লোম এক হইয়া গিয়া এই ভয়ের সৃষ্টি করিবে। কোনো ভয়ের স্মৃতি যদি শুঁয়োপোকার দর্শনে জাগ্রত না হইত, তাহা হইলে শিশু একটু একটু ভয় পাইলেও অগ্রসর হইয়া আসিত এবং শুঁয়োপোকা লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিত। যে শিশু শুঁয়ো-

পোকা দেখিয়া ভয় পায়, সে হয়তো সর্প দেখিলে অগ্রসর হইয়া আসে ; কারণ সর্পের দেহে সে এমন কিছুই অনুভব করে না যাহার দ্বারা তাহার বিড়াল-স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। শিশুর মনের কোণে কখন কোন ভয়ের স্মৃতি লুকানো থাকে তাহার হিসাব রাখা মাতা-পিতার পক্ষেও অসম্ভব এবং কখন কি দেখিয়া ঐরূপ স্মৃতি উত্তেজিত হইবে তাহারও ঠিক নাই। সেই কারণে অপরিচিত কিছুর সম্মুখীন হইলে, কার্যতঃ, ভয় পাইয়া শিশু উল্টা দিকে ছুটিবে অথবা একটু ভয়ের অনুভূতি সত্ত্বেও অগ্রসর হইয়া অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইবে বলা যায় না। যে-কোনো সম্ভাবনাই থাকুক, শিশুকে স্বেচ্ছায় তাহার সাধ্যমত অপরিচিত অবস্থায় যাইতে দেওয়া ভালো। কখনো তাড়াহুড়া করিয়া 'আমার শিশু কি নির্ভীক' ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, শিশুকে অপরিচিতের মুখে ঠেলিয়া দিতে নাই। নূতনের ভয়-ভয় ভাবটুকু শিশু আপনা-আপনিই কাটাইয়া উঠিবে। মাতা-পিতা সঙ্গে থাকিয়া নূতন অবস্থায় লইয়া যাইতে পারেন। ভয়ের স্মৃতি হইতে সাধ্যমত মুক্তি দিবার জন্য মা অথবা পিতা শিশুকে কোলে লইয়া একটু একটু করিয়া সহাইয়া সহাইয়া নূতন ভীতি-উদ্দীপক অবস্থার সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দিতে পারেন। শিশু যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসার স্থল বলিয়া মনে করে তাঁহারই স্পর্শে বা কোলে থাকিয়া ভয়কে সে জয় করিবে। সাধারণতঃ মাতা-পিতাই শিশুর শ্রেষ্ঠ ভরসার স্থল।

১৬। আকস্মিক ঘটনার সহিত শিশু দ্রুত উপযোজন করিতে পারে না। সে ভয় পায়। মনে যাহার আভাস পর্যন্ত শিশু পায় নাই, সেইরূপ কিছু হঠাৎ ঘটিতে থাকিলে শিশুর পক্ষে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তাহার অভিজ্ঞতা কতটুকু, তাহার দেহ ও মনের উপযোজন-ক্ষমতাই বা কতটুকু। পিতা-মাতার পক্ষে যে-সকল ঘটনা তেমন আকস্মিক নহে শিশুর পক্ষে তাহা অত্যন্ত আকস্মিক হইতে পারে। এমন-কি, গৃহে হঠাৎ লোকজন আসিলে, হৈচৈ আরম্ভ হইলে, শিশু ভীত হইয়া পড়ে, মায়ের কোলে উঠিয়া পড়িতে চায়। এই সময় মায়ের কোল হইতে বঞ্চিত করিলে শিশুর ক্ষতি করা হয়। যে-কোন আকস্মিক ঘটনার সম্মুখে শিশুকে তাহার ইচ্ছা অনুসারে মাতৃ-পিতৃ-আশ্রয়ের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। অতি আকস্মিক ঘটনার নিকট শিশুকে লইয়া যাওয়ার কোনো সার্থকতা নাই, বরং ইহাতে শিশু-চিত্তে অকারণ ভয় জন্মিবারও সম্ভাবনা থাকে। নিতান্তই যদি আকস্মিক ঘটনার

সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে শিশুকে ঘটনার উগ্র বিষয়গুলি লইয়া গল্প বলিয়া পূর্ব হইতেই যথাসাধ্য প্রস্তুত করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত। শিশুকে সর্বপ্রথম রেল-স্টেশনের অভিজ্ঞতা দিতে গেলে এইরূপ প্রস্তুতি ভালো—স্টেশনের ভিড়, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, হৈচৈ, রেলগাড়ির হু হু শব্দে স্টেশনে আসা, ইঞ্জিনের তীব্র বাঁশি প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই গল্প বলিয়া রাখা ভালো। কোনরূপ ভয়ের আবেগ সৃষ্টি করা এই মানসিক প্রস্তুতির অন্তরায়। মাতা-পিতা শিশুকে যেভাবে গল্প বলিয়া আকস্মিক অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিবেন তাহাতে একটুকুও ভয়ের আবেগ যোগ করা চলিবে না।

১৭। শিশু মনে মনে নিজেকে অসহায় ও নিরপত্তাভ্রষ্ট বোধ করিতে থাকিলে তাহার স্বভাব ভীরু হইয়া পড়ে। শৈশবের এই অসহায় অনৈশ্চিত্যের ভাব যে-সকল কারণে ঘটিতে পারে তাহার মধ্যে মাতা-পিতার দাম্পত্য জীবনের তীব্র অশান্তি, কলহের চিৎকার, দারিদ্র্য, স্নেহ-দৈন্য, গৃহে ঘন ঘন আকস্মিক পরিবর্তন, এইগুলিই অতি সাধারণ এবং অতি প্রধান। ইহার সহিত, 'শিশুর বিপদ ঘটিতে পারে'—মাতা-পিতার কথাবার্তায় পদে পদে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ, পদে পদে শিশুকে 'ইহা করিতে নাই' 'উহা করিতে নাই' এই-জাতীয় উপদেশ এবং ভর্ৎসনা, গৃহের বাহিরের সহিত মিশিতে না দেওয়া, এগুলিও শিশুর পক্ষে মারাত্মক। মাতা-পিতার আচরণে এগুলি থাকিলে শিশু স্বভাব-ভীরু হইয়া যাইবে।

১৮। শিশুকে বিভীষিকাময় গল্প শুনানোর অভ্যাস অনেকের আছে। শিশুকে ভূতের ভয়ের গল্প বলিয়া বা ভয় দেখাইয়া অনেকে মজা অনুভব করেন। ইহা শিশুর পক্ষে মারাত্মক। শিশু যে কেবল সেই গল্পটিতেই ভয় পাইবে বা যাহা দেখাইয়া শিশুকে ভয় দেওয়া হইয়াছিল তাহাতেই মাত্র ভীত হইবে, তাহা নহে। শিশু ঐ একটি-দুইটি গল্প শুনিয়া বা একবার-দুইবার ভয় পাইয়া বহু ক্ষেত্রেই ভয়ের পীড়া ভোগ করিতে থাকিবে। শিশুর স্বাভাবিক বিচরণের ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। শিশু অনেক সময় মায়ের কোলে শুইয়া ভয় পাইতে ভালবাসে। মা তাঁহার কোলে শিশুকে আশ্রয় দিয়া একটু-আধটু গল্প বলিতে পারেন, শিশু একটু-আধটু ভয় পাইতে থাকিলে তাহার মন্দ লাগে না। সে ভয় পাওয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে চাহে, দেখিতে চাহে ভয়-ভয় ভাবটুকু কেমন লাগে। ইহা তাহার একপ্রকার সুখভোগ, ইহা তাহাকে পীড়িত করে না। কিন্তু

মায়ের গল্প বলায় ভয়ের সীমা থাকা প্রয়োজন, তাহা না হইলে ভয়টুকু শিশু উপভোগ করিতে পাইবে না, ভয়ে ভীত হইবে, পীড়িত হইবে।

১৯। অবস্থাবিশেষে আকস্মিক ভয় হইতে শিশুর মনে এমন গভীর ক্ষত হইতে পারে যে, বড়ো বয়স যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি হইলেও সেই ভয় থাকিয়া যায়। একবার একটি বালিকা আপন মনে একাকী খেলা করিতেছিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে দুইটি ক্ষিপ্ত বিড়াল মারামারি করিতে করিতে বালিকাটির গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শিশু একেবারে বাক্যাহত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই বিড়াল দুইটি অদৃশ্য হইল এবং তাহার মা আসিয়া গেলেন। শিশুর সেই ভয় মনে এমনই আঘাত করিল যে, সে দিনকতক পীড়িত হইয়া পড়িল। আশ্চর্যের বিষয় সেই বালিকাটি বড়ো হইয়া সন্তানের মা হইয়াছে, তথাপি তাহার বিড়াল-ভীতি আছে। কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার বিড়াল-ভীতি একটি মানসিক রোগের মতো ছিল। ক্রমশ নানা অবস্থার মধ্যে এই ভয় এখন কমিয়াছে, একেবারে যায় নাই। তীব্র কাল্পনিক ভীতিপ্রদর্শন করিলেও এইরূপ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে।

২০। শিশুর অন্তরে গোপন মাতৃবৈরিতা বা পিতৃবৈরিতা থাকিলে কখনো কখনো শিশু কোনো কোনো সজীব নির্জীব পদার্থ দেখিয়া অদ্ভুত-ভাবে ভয় পাইতে পারে। কি দেখিয়া ভয় পাইবে তাহার কোনো সূত্র নাই। শিশুর গোপন মনের ইঙ্গিতে যে-কোনো কিছু ভয়ের উদ্দীপক হইয়া শিশুকে পীড়া দিতে পারে। ইতিপূর্বে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। মাতা-পিতার দিক হইতে পারস্পরিক প্রীতি ও সংযত আচরণ থাকা চাই এবং শিশুর সংকটে ও অন্য সময়ে তাহাকে সস্নেহ স্পর্শদান আবশ্যক।

২১। অন্তর্নিহিত গোপন কারণে আরো বহুপ্রকার ভীতির সৃষ্টি হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে শিশুর অন্তঃপীড়া দুর্বিষহ হইয়া উঠে সেই ক্ষেত্রেই এই-সকল বিচিত্র ভীতির প্রকাশ হয়।

২২। শিশুর ভয় পাওয়ার কারণ কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে ভয় দূর করিবার জন্য পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ বা উপযুক্ত পরিবেশ-রচনা সম্ভব নহে। যাহাতে শিশু ভয়ের পীড়া পাইতে পারে, মাতা-পিতা (এবং অন্যান্য সকলে) এরূপ পরিবেশ বর্জন করিবেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও অনুমানই যথেষ্ট হইবে। তবে, ভয়ের ক্ষত হইতে শিশুকে অব্যাহতি দিতে গিয়া হয়তো

সকল সময় তাঁহাদের ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে না। যে ক্ষেত্রে শিশু ভয়ের কারণে ক্রমশঃই অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে, সে ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া মনোবৈদ্যের পরামর্শ লওয়াই বাঞ্ছনীয়। তথাপি, কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিলে পিতা-মাতা শিশুকে অনেক দূর সাহায্য করিতে পারিবেন :—

(১) শিশু যাহাকে পাইলে সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসা পায় তাহার স্পর্শে শিশুকে রাখিয়া ভয়ের সম্মুখে যাওয়া চলে।

(২) ভয়কে জয় করিবার প্রত্যেক চেষ্টায় শিশু যেন সকলের উৎসাহ ও প্রশংসা বোধ করিতে পায়। সংযত ও আন্তরিক উৎসাহই শিশুকে সাহস দেয়, অতিরিক্ত উৎসাহ ভালো নহে।

(৩) একটু-আধটু যুক্তির প্রভাব অনেক সময় শিশুকে ভয় দূর করিতে সাহায্য করে। শিশুর ভয় যে নিতান্ত অমূলক, তাহা যুক্তির দ্বারা কখনো কখনো বোঝানো যাইতে পারে।

(৪) পিতা-মাতা শিশুর ভয় অমূলক প্রমাণ করিবার জন্য অন্য কোনো শিশুকে পাঠাইতে পারেন বা নিজেরা ভয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন। কাহারও কিছু ক্ষতি হয় নাই, ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য।

(৫) পিতা-মাতা শিশুর ভয়ের বিষয়টি ধীরভাবে মনোযোগ দিয়া শুনিবেন। তাহার পর হাল্কাভাবে প্রশ্নোত্তর করিয়া সকৌতুক প্রসন্ন হাসি দিয়া, শিশুর ভয়টি যে নিতান্ত 'শিশুসুলভ' এই ভাবটি প্রকাশ করিবেন।

(৬) কোনো কোনো ক্ষেত্রে, 'ইহা তোমার বয়সে ঠিক নহে' এরূপ সংক্ষিপ্ত মৃদু ভৎর্সনাও কাজে লাগে।

(৭) ভয় দূর করিবার জন্য কখনো শাস্তির ভয় দেখানো উচিত নহে।

(৮) ভয় দূর করিতে গেলে শিশু অধিক ভয় পাইতেছে দেখিলে মাতা-পিতার দিক হইতে জোর করা বা তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

(৯) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য—সংযত স্নেহ-প্রকাশ এবং নির্ভীক পরিবেশ যাহাতে আপনা-আপনি সৃষ্ট হয় এরূপ ব্যবস্থা।

(১০) একেবারেই ভয় দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া, ক্রমশ ক্রমশ সহাইয়া ভয় দূর করা ভালো।

### ক্রোধ

২৩। শোনা যায় ক্রোধের ন্যায় শত্রু জীবনে খুব কমই আছে, কিন্তু এই শত্রুকে আমরা অতি শৈশব হইতেই আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। অতি শৈশবেই ক্রোধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবে ক্রোধ-সংযমের অভ্যাস সামান্যই থাকে, অতি শৈশবে সংযমের প্রশ্নই ওঠে না। তথাপি শৈশবে ক্রোধের কারণ অনুমান করা এবং তদনুসারে সতর্ক হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্রোধ হইতে শৈশবের ক্রোধ এই দিয়া দিয়া পৃথক।

২৪। অতি শিশু নিজের হাত-পায়ের উপর কর্তৃত্ব ভোগ করিবার জন্য যখন-তখন হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে। তাহার হাত-পা ছোঁড়া বয়স্কদের নিকট স্নেহোদ্দীপক, শিশুর নিকট ইহা কর্তৃত্বের চর্চা। ইহা তাহার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, ইহা তাহার ভালো লাগে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত তাহাই ভালো লাগে; যাহা ভালো লাগে তাহাই স্বতঃস্ফূর্তি। স্বতঃস্ফূর্তিতে বা ভালো লাগায় বাধা পড়িলে ক্রোধ হয়। শিশুর জীবনে নীতিজ্ঞান নাই। 'যাহা ভালো লাগে তাহা সকল সময়ে করা উচিত নয়', 'কেহ বাধা দিলে ক্রোধ করা অনুচিত'—এ জাতীয় ধারণা শৈশবে গঠিত হওয়া কষ্টকর, অতি শৈশবের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যায়। শিশু তাহার কর্তৃত্বে বা ভালো লাগায় বাধা পাইলেই ক্রুদ্ধ হয়। কাহার উপর ক্রোধ তাহার ধারণা নাই, কেন ক্রোধ তাহাও জানা নাই। কিন্তু বাধা পাইলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। নিজেরই হাত-পা ছোঁড়ার জন্য তাহার জামা হাতে জড়াইয়া গিয়াছে এবং হাত নাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শিশু তাহা বোঝে না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া ওঠে। নিজেই নিজের পা কাঁথার তলায় আটকাইয়া ফেলিয়াছে, অমনি ক্রোধ এবং ক্রন্দন ফাটিয়া পড়িল। যাহা ভালো লাগে তাহাতে বাধা পড়িতেছে, সেই জন্য ক্রোধ।

২৫। কখনো কখনো দেখা যায় শিশু মুঠি করিয়া ধরিতে গিয়া আপনার মাথার চুল ধরিয়া ফেলে। মুঠি সরাইতে গিয়া চুলে টান লাগে, দেহে পীড়া পায়, পীড়া ভালো লাগে না। ভালো লাগে না বলিয়া ক্রোধ হয়। শিশু নিজের চুল টানিয়া ধরিয়া যে কাঁদিতে থাকে, তাহাতে কেবল ব্যথা নাই, ক্রোধও আছে।

২৬। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর এই ভালো লাগার এবং ভালো না লাগার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে থাকে। নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর অনুকরণ

ও শিক্ষার প্রভাবে ভালো লাগা না-লাগার উপলক্ষ্য বহুপ্রকার হয়। শিশু একটু বড় হইলেই এত দিকে ভালো লাগার প্রমাণ দেয় এবং এত ব্যাপারে ভালো না লাগার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে, সব যেন হিসাবে ধরা যায় না। বয়সের সহিত কেবল ভালো লাগা আর না-লাগা বিচিত্র হয় তাহা নহে। বাধা অনুভব করার দিকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। শিশুর প্রথম জীবনে বাধা বলিতে শারীরিক বাধা বোঝায়—শিশু যাহা করিতে যাইতেছে, হয়তো আগুন ধরিতে যাইতেছে, তাহাতে মাতা-পিতা উপদেশ দিয়া বাধা দেন না, কারণ শিশু উপদেশের বাধা বুঝিতে পারে না; তাহাকে বাধা দিতে হইলে হাত-দুইটি চাপিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহাকে সবসুদ্ধ কোলে উঠাইয়া লইতে হইবে। শিশু এই হাত চাপিয়া ধরাটা বোঝে, কোলে উঠাইয়া লওয়াটা বাধা বলিয়া অনুভব করিতে পারে। তাহার পর শিশু যতই বড় হইতে থাকে, তাহাকে বাধা দেওয়ার পদ্ধতিও অনেকপ্রকার হইয়া যায়। ভালো লাগার বস্তুটি সরাইয়া লইলে শিশুকে বাধা দেওয়া হইতে পারে, শিশুর ক্রোধ হইতে পারে। ভয় দেখাইয়া, শাস্তির ভয় দেখাইয়া, মৌখিক নিষেধ করিয়া, শিশু যাহা চাহিতেছে তাহার পরিবর্তে অন্য-কিছু দিয়া, নিন্দা করিয়া, অসন্তোষ বা দুঃখের দোহাই দিয়া, আরো কত রকমে শিশুর ভালো লাগায় বাধা সৃষ্টি করা যায়। শিশু ইহার প্রত্যেকটিতে অল্লাধিক ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত আত্ম-সংবরণের অভ্যাস গঠিত হইলে ক্রোধের প্রকাশ্য অবশ্য সংযত হইবে। শিশু আরো বড়ো হইলে তাহার ক্রোধ-প্রকাশের পদ্ধতিও বহু প্রকারে পরিণত হয়—কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করে, কখনো গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকে, আবার কখনো আহার ত্যাগ করে। ইহা তো মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত। ইহা ব্যতীত আরো অনেক প্রকার ছদ্মপথ আছে; সেগুলির সাহায্যে ক্রোধ ঠিকই প্রকাশ হয়, কিন্তু উপরে ক্রোধের লক্ষণ থাকে না। এই পদ্ধতিগুলি শিশুর একচেটিয়া নহে, শিশু বড় হইয়া বয়স্ক জীবনেও এগুলি ব্যবহার করিতে পারে—পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে। এমন-কি রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রায় সবগুলিরই প্রয়োগ দেখা যায় না কি?

২৭। সে যাহাই হউক, শিশু আত্ম-বিকাশের লক্ষণ হিসাবে, আপন ভালো লাগা না-লাগা প্রকাশ করিতে থাকে, বিচিত্রভাবে আপন

ভালো লাগার ক্রিয়ায় বাধা অনুভব করিতে পারে এবং বিচিত্র পথে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে ; আবার অন্ন ক্ষেত্রে ক্রোধ সংবরণ করিয়া সংযমের পরিচয় দেয়। ইহার সহিত ক্রমশ ক্রোধের অন্যান্য কারণ দেখা দিতে থাকে। ইহাদের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দেখা যায়, কতকগুলি একটু বড় হইলে প্রকাশ পায়। নিজেকে ভালবাসা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। অতি শৈশবে ইহার প্রমাণ হয়তো পাওয়া যায় না, তথাপি অল্প বয়স হইতেই শিশু নিজেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং চিরজীবনই এই আত্মপ্রেম নানাভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার প্রতি মুহূর্তের আচরণকে প্রভাবান্বিত করে। একটু ভাবিলেই আমরা আমাদের প্রচ্ছন্ন আত্ম-প্রেমকে ধরিয়া ফেলিতে পারি। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা যে নিজের মুখখানিকে যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া তুলিতে চাই, তাহার অন্যতম কারণ আমাদের নিজেদের প্রতি গভীরতম ভালবাসা। অন্তরের এই গভীরতম আত্মপ্রেম নানা নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আছে—কখনো বলি 'প্রাণের মায়া', কখনো তাহাকে অহংকার অভিমান আত্মসম্মান প্রভৃতি নাম দিই। যে নামই আমরা দিই-না কেন, আমাদের আত্মপ্রেম ইহার মধ্যে একটু না একটু লুকাইয়া থাকেই। বয়স্ক জীবনে ইহা অতি স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় ; শৈশবেও ইহা অস্পষ্ট নহে। শৈশবের আত্মপ্রেমেই শিশুর প্রশংসা শুনিবার ইচ্ছাকেই প্রবল করিয়া তোলে। শিশু যখন ঈর্ষাপরায়ণ হয় তখন তাহার ঈর্ষার মধ্যে আত্মপ্রেম লুকাইয়া থাকে। নিজের সুখ্যাতিতে সুখ, নিজের নিন্দা শুনিলে ক্রোধ ও দুঃখ ; যাহাকে ভালবাসি তাহার সুখ্যাতিতে সুখ এবং তাহার নিন্দায় ক্রোধ ; যে ঈর্ষার পাত্র তাহার খ্যাতিতে দুঃখ ও ক্রোধ এবং নিন্দায় সুখ। এগুলি বয়স্ক জীবনের অতি পরিচিত ব্যাপার। শৈশবের প্রারম্ভে এগুলি দেখা না গেলেও, শৈশবের মাঝামাঝি হইতেই ক্রোধের এবং সুখের এই কারণগুলি স্পষ্ট হইতে থাকে।

২৮। মাতা-পিতা শিক্ষক-শিক্ষিকা পাড়া-প্রতিবেশী সকলকেই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, শিশুকে ক্রুদ্ধ করিয়া কোনো শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। শাসনের ভয়ে শিশু তাহার ক্রোধ প্রকাশ করিতে না পারিলে শিশুর অন্তর বৈরভাবাপন্ন হইয়া থাকে, বাহিরে তাহার আচরণ বেশ সুবোধ বালকের ন্যায় হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ ক্রোধের উদ্রেক হইলে শিশুর মন শিক্ষা-বিমুখ হইয়া পড়ে, বাহ্য অভ্যাস ভালো হইলেও অন্তরের পরিণতি উল্টাপথে ঘটিতে

থাকে। সুতরাং শিশুর ক্রোধ যাহাতে সৃষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুকে ক্রোধ-ভোগ হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। কারণ, শিশু যাহা চাহে তাহাই করিতে দেওয়া সকল সময় চলে না, উচিতও নহে। সেই-সকল ক্ষেত্রে শিশু ক্রুদ্ধ হইবে। ক্রুদ্ধ হইলেও উপায় নাই, তার বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য তাহার ক্রোধ সহ্য করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে, অন্য কিছু দিয়া বা অন্য কোনো দিকে আকৃষ্ট করিয়া শিশুকে অনভিপ্রেত ঝোঁক হইতে রক্ষা করা ভালো। তবে, কোনো কারণেই শিশুর ক্রোধের সময় প্রত্যক্ষভাবে কিছু শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা অনুচিত। বরং শিশুকে আপন ইচ্ছা অনুসারে একা-একা ক্রোধ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া চলিতে পারে; তাহাকে ভুলাইবার উপায় যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার ক্রোধের দিকে চাহিতেও নাই, সে যেন একা-একা ক্রোধ-ভোগ করে। তাহার ক্রোধ দেখিয়া মাতা-পিতার ক্রোধ বোধ করা ক্ষতিকর।

২৯। ক্রোধ উপশম করিবার জন্য শিশুর ক্রোধের কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মাতা-পিতা ধৈর্যশীল হইলে, স্নেহ-কোমল মন লইয়া শিশুর ক্রোধের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিলে, ব্যর্থ হইতে হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর ক্রোধ এবং তাহার কারণ এত স্পষ্ট থাকে যে, মাতা-পিতার অনুমানই যথেষ্ট হয়, কোনো বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সাজাইয়া লিখিলে ক্রোধের কারণ প্রধানতঃ সাতটি বলিয়া মনে হয়—

(১) শিশুর ভালো-লাগায় বাধা পাওয়া ;
(২) ভালো না লাগিলেও কাজে নিযুক্ত হওয়া।
(৩) ঈর্ষা। ঈর্ষার পাত্রের প্রশংসা।
(৪) আত্মনিন্দা।
(৫) প্রিয়জনের নিন্দা।
(৬) বিদ্রূপ।
(৭) দেহের ও মনের ক্লান্তি।

৩০। এইগুলি মনে রাখা কঠিন নহে, এবং শিশুকে এই-সকল ক্রোধ-জনক অবস্থা হইতে রক্ষা করাও কঠিন নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, শিশুর সম্মুখে তাহার ঈর্ষার পাত্রের প্রশংসা করার কোনো প্রয়োজনই থাকে না; শিশুর নিন্দাবাদ করাও শিশুকে শিক্ষাদানের শুভ পন্থা নহে, বিদ্রূপ করা এক প্রকার নিষ্ঠুরতা এবং নীচতা ছাড়া আর কিছুই নহে। শিশু যাহাকে

ভালবাসে বা শিশু যে বস্তু ভালবাসে তাহার নিন্দা করার অভিপ্রায় শিশুকে পীড়া দেওয়া ব্যতীত আর কি হইতে পারে; ইহাও তো নিষ্ঠুরতা। দেহের ও মনের ক্লান্তি ঘটিলে শিশুরও ক্রোধ হইতে পারে; শিশুর ক্রোধের কোনো কারণ না থাকিলেও শিশু যে কোনো ছুতায় ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে। নিদ্রাতুর শিশুর ক্রোধ-কাতর মেজাজের কথা সকলেরই জানা আছে।

৩১। সর্বোপরি শিশু ক্রোধের কৌশল ও অভ্যাস গঠন করে অনুকরণের দ্বারা। পরিবেশে ক্রোধের ঘন ঘন প্রকাশ দেখিতে থাকিলে শিশুও ক্রোধ-প্রকাশের অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। পরিবেশ শান্ত সংযত ক্রোধপীড়া-হীন হইলে স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর ক্রোধের কৌশল নিতান্ত শিশু-সুলভ এবং অস্থায়ী হইয়া যায়—দৈনন্দিন জীবনে ক্রোধকে অভিপ্রায়-সিদ্ধির কৌশল বলিয়া গ্রহণ করিতে শেখে না। অবশ্য নিক্রোধ শিশু সম্ভব নহে। তথাপি শিশু স্বভাব-ক্রোধী না হইয়াও স্বচ্ছন্দে বড় হইয়া উঠিতে পারে, যদি তাহার পরিবেশে ক্রোধের লক্ষণ বিরল হয়।

## মিথ্যাচরণ

৩২। শিশু অধিকাংশ গৃহেই অল্প বয়সে মিথ্যা বলিতে ও মিথ্যার আচরণ করিতে শিখে। শৈশবের মিথ্যাচরণ মাতাপিতার বা অভিভাবকের চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। তাঁহারা শিশুকে সকল মিথ্যাভ্যাসের জন্য দায়ী করেন। ভাবেন তাঁহাদের সকল চেষ্টা সত্বেও শিশু মিথ্যাচারী হইয়া উঠিতেছে, অতএব শিশু নিজেই মন্দ।

৩৩। জন্ম হইতে শিশু সত্য-মিথ্যার কোনো ধারণা বহন করিয়া আনে না। সত্য-মিথ্যার ধারণা শিশুর শিক্ষারই ফল, পরিবেশের সহিত যোগা-যোগেই তাহার আত্ম-গঠন। পরিবেশে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাহার প্রভাবে শিশু মিথ্যাচরণে নিজেকে প্রকাশ করে এবং মিথ্যাচরণের দ্বারা নিজেকে চালাইয়া লয়, আত্ম-গঠন করে। জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গের পরিবেশে শিশুর সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে শিক্ষার সম্ভাবনা নাই, জড় পরিবেশের দ্বারাও শিশু সত্য-মিথ্যা শিক্ষা করে না। ব্যক্তি-পরিবেশের যোগেই শিশুর সত্য-মিথ্যার ধারণা সৃষ্ট হইতে পারে এবং মিথ্যাচরণের অভ্যাস গঠিত হইতে পারে। ব্যক্তি-পরিবেশের মধ্যে যাঁহারা নিকটতম এবং যাঁহাদের সহিত প্রায়ই যোগ ঘটে, তাঁহাদের সংস্পর্শেই শিশুর মিথ্যার ধারণা এবং মিথ্যা

আচরণ সৃষ্ট হইতে পারে। নচেৎ শিশু আপনা-আপনি মিথ্যা শিক্ষা করে না, ইহা তাহার স্বভাব নহে; সত্যই স্বাভাবিক, মিথ্যা স্বভাব হইতে বিচ্যুতি মাত্র।

৩৪। মাতা-পিতা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা অনেক সময়ই মিথ্যা অবলম্বন করেন, শিশুর সম্মুখেই কখনো কখনো স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলেন, মিথ্যা আচরণ করেন। ব্যক্তি-পরিবেশে মিথ্যার অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ লাভ করিতে থাকিলে শিশুর চরিত্রে মিথ্যা আশ্রয় গ্রহণ করে। অভিভাবকেরা মিথ্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া যান, তাঁহাদের মিথ্যাচরণের মাঝখানে শিশু আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মিথ্যাকে এ কথা—ও কথা দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন; অথবা ঠারে-ঠোরে মিথ্যার কাজটুকু সারিয়া লন। ঠারে-ঠোরে কথা বলিয়া, আচরণকে একটু কপট সত্যের আবরণ দিয়া শিশুর সম্মুখে কাজ চালাইয়া লওয়ার বিপদ আছে। শিশু স্বভাবতঃই বয়স্কদের কথাবার্তা চাল-চলন বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করে। যখন তাহার সম্মুখে বয়স্করা স্পষ্টভাবে আচরণ করেন তখন শিশুর মনে একপ্রকার স্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণা জন্মিতে থাকে। কিন্তু বয়স্ক-আচরণে অস্পষ্টতা গোপনতা আভাস-ইঙ্গিতের কৌশল থাকিলে শিশু অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত বা ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ করিতে পারে! মাতা-পিতা কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন, তাহা ঠিক বোঝা যাইতেছে না বলিয়া শিশু যে বুঝিবার চেষ্টা ত্যাগ করিবে তাহা নহে। শিশু নিজের মতো করিয়া বুঝিয়া লইবে। শিশু আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকটা বুঝিয়া লয় এবং বহু ক্ষেত্রে একটু বেশী করিয়াই বোঝে। মাতা-পিতা প্রভৃতির আভাসে-ইঙ্গিতে মিথ্যাচরণ শিশুর মনে এক রকম করিয়া ধরা পড়ে; হয়তো যতটা এবং যে দিকে মিথ্যার অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও ভিন্ন দিকে মিথ্যার অনুমান করিয়া লয়। এই কারণে শিশুর সম্মুখে মিথ্যার আভাস-ইঙ্গিতও যথেষ্ট ক্ষতিকর হইতে পারে।

৩৫। মাতা-পিতা তাঁহাদের ক্ষুদ্র শিশুটিকে সহজাত বুদ্ধিমত্তার সম্মান দিতে রাজী হন না, ভাবেন শিশু আর কি বুঝিবে। এই ধারণার বশবর্তী হওয়ায় তাঁহারা শিশুর সম্মুখে যথেষ্ট সতর্ক থাকেন না। অনেক সময় শিশু প্রশ্ন করিয়া মাতা-পিতাকে বড় অসুবিধায় ফেলে। বিশেষ করিয়া শিশু জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বা দেহ-বৈশিষ্ট্য লইয়া যখন প্রশ্ন করে, তখন মাতা-পিতা

মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শিশু নানা স্থান হইতে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মাতা-পিতার দেওয়া জন্ম-ব্যাখ্যা বা দেহ-ব্যা ্যা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং কামশ্রেণীর প্রশ্নোত্তর যে গোপন করিতে হয় তাহা বেশ ভাল ভাবেই শিখিয়া লয়। ইহা ব্যতীত মাতা-পিতা সব জানিয়া শুনিয়াও শিশুর সম্মুখে মিথ্যাচরণ করিয়া বসেন। অভ্যাসে বা স্বভাবে মিথ্যা পাকা হইয়া গেলে কত দিন আর সতর্ক থাকা সম্ভব। এখন সতর্ক থাকিলেও পরে যে-কোনো মুহূর্তে অসতর্ক হইয়া পড়িতে পারেন, আজকের সতর্কতা দেখিলে কালও যে সতর্ক থাকিবেন সে কথা বলা যায় না। এই কারণে শিশুর মিথ্যার অভিজ্ঞতা মাতাপিতার চেষ্টা সত্বেও ঘটিতে থাকে। মাতা-পিতার অভ্যাসে মিথ্যার প্রভাব স্থায়ী হওয়ার প্রধান কারণ সংসারের অভাব এবং অতৃপ্ত কামনা। অভাব এবং কামনার অতৃপ্তি হইতেই ছল-চাতুরি ও মিথ্যার অসংখ্য কৌশল প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম নিজের মনের অনিচ্ছা সত্বেও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, অবশেষে বারেবারে মিথ্যাভাষণ মিথ্যাচরণ করিতে করিতে ঐরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। অনেকের আবার মিথ্যার অভ্যাস এতদূর পর্যন্ত পাকা হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা অপ্রয়োজনেও, কেবল মিথ্যা-আচরণের সুখেই মিথ্যাচরণ করে। ইহাদের পক্ষে শিশুর সম্মুখে সতর্ক থাকিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই আবশ্যক বা সম্ভব বোধ হয় না। মাতা-পিতা সংস্কার-বশে অনেক সময় মিথ্যাচরণ করেন। তাঁহাদের সংস্কার একপ্রকার আচরণে বাধ্য করে, যুক্তি অন্যপ্রকার আচরণকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করে, এমন-কি বিশ্বাসও সংস্কারের অনুরূপ থাকে না। ইহার ফলে দৈনন্দিন আচরণে মাতা-পিতার অসামঞ্জস্য ঘটে, মিথ্যা প্রকাশ পায়। শিশুকে কিছু না বলিলেও সে বুঝিয়া লয় মিথ্যা কোথায় কিভাবে রহিয়াছে।

৩৬। শিশু যে কেবল মাতা-পিতার বা বয়স্ক ব্যক্তির পরিবেশ হইতেই মিথ্যাচরণ শিক্ষা করে তাহা নহে। সঙ্গী-সাথী সমবয়সীরাও অল্পাধিক মিথ্যার শিক্ষায় পরস্পরকে প্রভাবিত করে। যে শিশুর মিথ্যায় মাত্র হাতে-খড়ি হইয়াছে, সে তাহার সঙ্গী-সাথীদের সাহায্যে দ্রুত আরও বহুবিধ পাঠ আয়ত্ত করিয়া লয়। মাতা-পিতার অনুমানের বাহিরে থাকিয়া শিশু মিথ্যায় অভ্যস্ত হইতে থাকে।

৩৭। নিতান্ত অনুকরণ করিয়া শিশু মিথ্যাচরণ করিতে পারে। মিথ্যার

লাভ-ক্ষতির ধারণা তখনো থাকে না, থাকে কেবল নিছক অনুকরণ। ইহার সহিত আমোদ বা মজা পাইবার জন্যও মিথ্যাভাষণ থাকিতে পারে। কখনো কখনো মিথ্যাচরণ করিলে কি হয় তাহা দেখিবার ইচ্ছায় শিশু মিথ্যা বলে ও মিথ্যা করে। এই শ্রেণীর মিথ্যা ঠিক মিথ্যাচরণ নহে, ইহার পশ্চাতে কোনো লাভের কামনা বা অসামাজিক বুদ্ধি কাজ করে না। ইহা শিশু-সুলভ খেলা মাত্র। কিন্তু ক্রমশ লাভের অভিজ্ঞতা আসিয়া যায়। শিশুর কিছু কামনা রহিয়াছে, সে কিছু পাইতে বলিতে বা করিতে চাহে, অথচ মাতা-পিতা বা অপর কাহারও নিষেধ বা অনিচ্ছা থাকায় তাহার কামনা তৃপ্ত হইতেছে না। একদিকে তাহার নিজের ইচ্ছা, অপরদিকে অভিভাবকদের অনিচ্ছা ও শাস্তির সম্ভাবনা। শাস্তির ভয় থাকায় সামনাসামনি অভিভাবকদের অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করিতে পারে না, অথচ ইচ্ছাকে সংযত করিবার মতো অভ্যাসও হয়তো গঠিত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে মিথ্যার অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করিবার লোভ শিশুর হইবেই। (কেবল শিশু কেন, বয়স্করাও তো এইরূপ করিয়া থাকেন এবং করিয়া থাকেন বলিয়াই শিশুরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।) সঙ্গী-সাথীরাও অনেক সময় শিশুর ইচ্ছামত আচরণের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন শিশু সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিথ্যাচরণ করিয়া আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করে। মাতা-পিতা প্রভৃতির প্রতি অতি গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকিলে শিশু নিজের ইচ্ছার বেগ সংযত করিতে পারে এবং অভিভাবকদের অনিচ্ছাকে যথোচিত সম্মান দেখাইতে সমর্থ হয়। ভালবাসা ও বিশ্বাসের পরিবেশে মিথ্যা-চরণের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, শাসনের পরিবেশে মিথ্যাই শিশুর আত্মবিকাশের অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। শাসন ও বৈরভাব থাকিলে শিশু কোনো উদ্দেশ্য না থাকিলেও, নিজের কোনো কামনা তৃপ্ত করিবার প্রয়োজন না হইলেও, পিতা-মাতার বা শিক্ষক-অভিভাবক প্রভৃতির নিষেধ লঙ্ঘন করিবার জন্যই মিথ্যাচরণ করে। পিতা-মাতা নিষেধ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের নিষেধ লঙ্ঘন করিতে হইবে। নিষেধ অমান্য করায় হয়তো শিশুর কোনো লাভ নাই, কোনো অতৃপ্ত ইচ্ছা তৃপ্ত হইবার নাই, তথাপি নিষেধ লঙ্ঘন করার একটা ঝোঁক শিশুর মনে আসিতে পারে। এই ঝোঁকের বশে সে অভিভাবকদের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া বসিতে পারে। কিন্তু ধরা পড়িয়া শাস্তি-ভোগের ভয় আছে, অতএব সে মিথ্যার কৌশলকে ব্যবহার

করে। সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রেও এইরূপ হইতে পারে। কখনো কখনো ঈর্ষার প্রভাবে শিশু নিজেকে অপরের নিকট বড় করিবার জন্য এবং ঈর্ষার পাত্রকে ছোট করিবার জন্য মিথ্যা বলিতে ও করিতে পারে। অপরের নিকট প্রশংসা বা আদর পাইবার জন্যও অনেক সময়ে শিশু মিথ্যা বলে। চুরি করাও একপ্রকার মিথ্যাচরণ। ইহারও একাধিক কারণ আছে। ঈর্ষার বশে অনেক শিশু চুরি করে; যে ঈর্ষার পাত্র সে কোনো বিশেষ বস্তু লইয়া সুখ পাইতেছে, ইহা ঈর্ষা-পীড়িত মনে শিশু কেমন করিয়া সহ্য করে? সেই বস্তুটি সরাইয়া ফেলাই ঈর্ষার পীড়ার উপশমের একটি উপায়। অতএব শিশু সেই বস্তুটি অপহরণ করে অথবা নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা চুরি সন্দেহ নাই। কারণ কেবল ঈর্ষা। আবার, অভাববশতঃ কোনো কোনো সংসারে না-বলিয়া-লওয়ার একপ্রকার অভ্যাস গঠিত হইতে দেখা যায়। না বলিয়া লওয়ার বস্তুগুলি নিতান্ত তুচ্ছ; কলাটা-মূলাটার অধিক নহে। অভিভাবকেরা এগুলি এভাবে লওয়া চুরি করা বলিয়া মনেই করেন না। কিন্তু ইহা শিশুর অভ্যাসে চুরির সূচনা করে। অভাবের জন্য চুরির অভ্যাস গঠিত না হইলেও শিশুর সাময়িক অভাববোধ হইলে দুই-একবার অপহরণ করিয়া বসা অসম্ভব নহে; অপর কাহারও কোনো জিনিস রহিয়াছে, শিশুর খুব ভালো লাগিয়াছে, শিশু উহা পাইতে চাহে, অথচ পাইবার সুযোগ-সুবিধা নাই; তখন উহা চুরি করিবার ইচ্ছা দেখা দিতে পারে। কাহারও কাহারও মতে শিশু নানাপ্রকার জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর মালিকানার সুখ ভোগ করে। তখন সংগ্রহ করিবার ঝোঁকে সে কোনো কোনো বস্তু চুরি করিতে পারে। শিশু মাতা-পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলে, বা নিরাপদ কোনো আশ্রয় নাই বিবেচনা করিয়া শিশুর মন পীড়িত হইতে থাকিলে, চুরির অভ্যাস সৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। ইহা ব্যতীত মনের অত্যন্ত গোপন কামনা গোপনে গোপনে মনকে পীড়া দিতে থাকিলে, শিশুর অন্তরের গভীরে বৈরিতা থাকিলে, অনেক সময় শিশু চুরি করিতে থাকে। মনের গোপন কারণে, অর্থাৎ শিশু যখন তাহার নিজের মনের গোপন কারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত থাকে না, তখন চুরির পশ্চাতে কোনো লাভ-ক্ষতির হিসাব স্পষ্ট থাকে না। চুরি করাটা কেমন যেন একটা ঘটিয়া-যাওয়া ব্যাপার। অনুকরণ করিয়া চুরি করার সর্ব-পরিচিত দৃষ্টান্ত, পরীক্ষার সময় চুরি করা। ইহার সহিত খ্যাতির প্রত্যাশা, নিন্দা হইতে আত্মরক্ষা,

শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য যতই থাক্, কোনো শিশু আপনা-আপনি বুদ্ধি খাটাইয়া পরীক্ষায় প্রবঞ্চনা করিবার কৌশল প্রথম আবিষ্কার করিতে পারে না। অন্য অভিজ্ঞ শিশু কর্তৃক পথ-প্রদর্শন আবশ্যক। পরীক্ষা-ব্যাপারে চুরি করায় একবার 'হাতে-খড়ি' হইয়া গেলে তাহার পর বুদ্ধিজীবী শিশু ঐদিকে অপরাপর কৌশল আবিষ্কার করে। পরীক্ষায় প্রবঞ্চনা বস্তু-অপহরণ হইতে পৃথক ধরনের মিথ্যাচরণ, কিন্তু ইহা যে মিথ্যাচরণ এবং ইহার ক্ষেত্রও যে দিনের পর দিন বিস্তৃত হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩৮। প্রত্যেক শিশুই, অল্পাধিক কল্পনার বশে মিথ্যাচরণ করে; মিথ্যা বলে, মিথ্যা করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাচরণ নহে, কারণ শিশু মিথ্যা বলিবার জন্য মিথ্যা বলে না। কল্পনার সৃষ্টি এমনই যে শিশুর সত্য-মিথ্যার কোনো জ্ঞানই থাকে না। শিশু যখন কল্পনার বশে কিছু বলে তখন তাহার বলায় কল্পনার নেশা লাগিয়া থাকে; সেই কারণে তাহার সমস্ত বলা বাহির হইতে বিচার করিলে মিথ্যাভাষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। অথচ শিশুর নিকট সেই সময়টুকুর জন্য মিথ্যাভাষণের কোনো উদ্দেশ্য নাই বা শিশু কল্পনার নেশায় জানিতেও পারে না যে, সে মিথ্যা বলিতেছে। শিশু হয়তো কুকুর দেখিলে ভয় পায়; যে দিকে কোনো কুকুর দেখিতে পায় সে দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়াও দেখে না এমনই হয়তো তাহার 'সাহস'। কিন্তু শিশু কুকুরকে ভয় পাওয়াটা লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করে। তখন সে আর কি করিবে, সত্য সত্য লাঠি দিয়া তাড়াইয়া দিবার সাহস নাই। অতএব বাধ্য হইয়া সে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে কল্পনার দ্বারা দেখিতে পায় সে নির্ভয়ে লাঠি লইয়া অগ্রসর হইতেছে এবং কুকুরটি ভয়ে ল্যাজ গুটাইয়া পলাইয়া যাইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ কল্পনা, সত্যের কোথাও কিছু নাই। শিশু যখন তাহার পিতাকে বা সঙ্গী-সাথীকে বর্ণনা দিতে থাকে সে কেমন করিয়া কুকুরটিকে তাড়া করিয়াছিল এবং কুকুরটি কেমন করিয়া পলাইয়াছিল তখন তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ কল্পনা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। তথাপি, ইহা মিথ্যাচরণ নহে, ইহাতে কোনো পাপ নাই।

৩৯। এই প্রসঙ্গে শিশুদের কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের বিষয়টি আরো একটু বিশদ্ করিয়া দেখিলে ভালো হয়। মনের মধ্যে শিশুদের (এবং সকলের) অনেক কামনা থাকে যাহার পরিতৃপ্তি বাস্তব জীবনে সম্ভব নহে। অনেক

কামনা এমনই যে সেগুলি কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া বলাই চলে না, সেগুলি মনে মনে গোপন রাখিতে হয়। আবার কতকগুলি গোপন কামনা এতই গোপন যে, সেগুলি নিজের মনে ভাবা বা নিজের মনে আনা যায় না; সেগুলি অত্যন্ত লজ্জাজনক বা পীড়াদায়ক। শিশুরও এইপ্রকার অতি-গোপন কামনা থাকিতে পারে যেগুলি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। মনের এই-সকল অতৃপ্ত কামনা, গোপন এবং অতি গোপন কামনা, বাস্তব জীবনে ব্যর্থ হইয়া কল্পনার পথ অন্বেষণ করে; শিশু নিছক কল্পনায় তাহার কামনা পরিতৃপ্ত করে। শিশু যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখে। ইহা দিবাস্বপ্ন হইলেও ঠিক স্বপ্ন নহে, ইহা স্বপ্নের ন্যায় অসম্ভব অদ্ভুত ছেঁড়া টুকরা ছবির অবাস্তব জোড়াতাড়া দেওয়া প্রলাপ নহে। দিবাস্বপ্ন একপ্রকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পিত কাল্পনিক জীবন; সাময়িক হইলেও তাহা বাস্তবের প্রতিচ্ছবির ন্যায় সংগত, সংহত। সকল শিশুই অল্পাধিক দিবাস্বপ্ন উপভোগ করে। তাহাদের দিবাস্বপ্নগুলি বৈশিষ্ট্য-অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিলে সুবিধা হইবে।

(১) শিশু একটি বয়সে সঙ্গী-সাথীদের সহিত খেলাধুলা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে। সঙ্গী-সাথীদের প্রতি শিশুর আকর্ষণ সেই বয়সে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং শৈশবের বহুদিন পর্যন্ত সমবয়সী বন্ধুদের প্রতি মনের টান বেশ ভালো ভাবেই থাকিয়া যায়। শিশুর মনে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গ-কামনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত তীব্র হইতে পারে। এই-সকল ক্ষেত্রে শিশু সঙ্গী-সাথীদের সহিত মেলা-মেশা করিতে না পাইলে মনে পীড়া অনুভব করিতে পারে। তাহার মনের বন্ধু-কামনা বাস্তব জীবনে হয়তো অতৃপ্ত থাকিয়াই যায়। ইহার ফলে অতৃপ্ত কামনার পীড়নে শিশু অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার কল্পনায় একাধিক খেলার সাথী সৃষ্ট হয় এবং শিশু সেই ষোল আনা কল্পিত সাথীদের সহিত খেলা-ধূলা করিতে থাকে। কখনো কখনো শিশুর কল্পনা এত প্রখর হয় যে, শিশু সাময়িকভাবে বাহ্য অবস্থা ভুলিয়া গিয়া পাগলের ন্যায় আচরণ করিতে থাকে—আপন মনে বকে, হাসে, দৌড়ায়, যেন সে সত্য সত্য বন্ধু-বান্ধবদের সহিত খেলা করিতেছে।

শিশু দেখিতে পায় মাতা-পিতা বা দাদা-দিদিরা নিজেদের খুশিমত ভৃত্যদের বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বালক-বালিকাদের নানাপ্রকার নির্দেশ

দিতেছেন এবং তাঁহাদের নির্দেশগুলি অপরের দ্বারা অল্পাধিক পালিত হইতেছে। শিশুকেও তাহার মাতা-পিতা দাদা-দিদিদের আদেশ পালন করিতে হইতেছে। কিন্তু শিশুর ইচ্ছামত কাজ করিবার মতো হয়তো কেহ নাই—বয়স্করা তাহার কথা তো কানেই লন না, সঙ্গী-সাথীরাও হয়তো তাহার ইচ্ছামত কিছু করে না। ইহাতে শিশুর ব্যর্থতা-বোধ জাগে। সে এমন সব সঙ্গী-সাথীর কল্পনা করে যাহারা তাহার আদেশ-ইচ্ছা অকাতরে পালন করিয়া যাইতেছে। কল্পিত সঙ্গী-সাথী ছাড়া আর উপায় কি! যে শিশু সাধারণভাবে তাহার কাজে ও খেলায় ব্যর্থ হয়, অধিক কল্পনাপ্রবণ হইবার সম্ভাবনা তাহারই অধিক।

অপরের দখলে ভারী সুন্দর একটি বস্তু রহিয়াছে, উহা শিশুর মন ভুলাইয়াছে; শিশুর উহা নাই, অথচ সে পাইতে চায়। পাইবারও উপায় নাই। শিশুর অদৃষ্টে যদি এইরূপ অতৃপ্ত কামনার দুর্ভোগ ঘটে তাহা হইলে সে বাধ্য হইয়াই কল্পনার সাহায্য লয়। কল্পনায় সমস্ত পৃথিবীর মালিক হওয়া তেমন কঠিন নয়। শিশু তাহার কামনা তৃপ্ত করিতে দ্বিধা করে না।

খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইলেও অনেক সময় শিশু কল্পনায় আহার করে এবং কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আহারকালীন দেহভঙ্গী করিতে থাকে।

এইগুলি ব্যতীত আরো অনেক প্রকার দিবাস্বপ্ন দেখা যায়। শিশুর বৈশিষ্ট্য-অনুসারে দিবাস্বপ্নের অল্প বা অধিক তীব্রতা ও অন্য প্রকার-ভেদ ঘটে।

(২) বয়স্কদের অনেক কাজে শিশুরা চমৎকৃত বোধ করিতে পারে; তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহারা নিজেরাও বড়দের ন্যায় সেই-সব অত্যাশ্চর্য কার্য করে। কিন্তু বাস্তবে তাহার স্বল্প ক্ষমতায় উহা সম্ভব নহে। তখন নিরঙ্কুশ কল্পনা চলে। সেই কারণেই দেখা যায় শিশু কখনো এরোপ্লেন চালাইতেছে, কখনো ইঞ্জিন নির্মাণ করিতেছে, কখনো ডাক্তার হইয়া সকলকে ইন্‌জেক্‌সন দিয়া বেড়াইতেছে। আরো কত-কি যে করিতেছে ও হইতেছে তাহার হিসাব নাই। আবার অনেক সময় নিজেই এরোপ্লেন, ইঞ্জিন হইয়া পড়ে। কল্পনার কি অদ্ভুত শক্তি!

(৩) মায়ের প্রতি শিশুর গভীর ভালবাসা থাকিলে সে মাকে সেবা করিতে, খুশী করিতে চাহে। দৈনন্দিন জীবনে সে তো মাকে খুশী করেই—মাকে আদর করে, মায়ের ইচ্ছা পালন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু খুব

বড় রকম সুখ দিতে গেলে শিশুর কল্পনা ছাড়া উপায় কি। এমন-কি সে মায়ের সাঙ্ঘাতিক বিপদ্ কল্পনা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, কারণ সে যে কল্পনায় মাকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষণ একটা-কিছু করিতে চাহে—তাহা না পারিলে যেন মাকে খুব বেশী রকম খুশী করা সম্ভব হয় না; পিতা সম্পর্কেও এরূপ কল্পনা অসম্ভব নহে। ইহা তো শিশুর জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখা।

(৪) মাতা বা পিতার প্রতি বৈরভাব থাকিলে শিশু ইহার বিপরীত কল্পনা করিতে পারে। কল্পনায় রাক্ষস-রাক্ষসীর সহিত পিতাকে বা মাকে এক করিয়া ফেলে এবং নিজে বীর-রূপে কল্পনায় তাহাদিগকে ধ্বংস করে। যাহাদের বিরুদ্ধে একটুও কিছু করা বাস্তবে অসম্ভব, উহাদেরই ধ্বংস সম্ভব হয় দিবা-স্বপ্নে বা রাক্ষস-রাক্ষসী-বধের গল্প শ্রবণে।

(৫) শিশু কখনো মা হয়, কখনো বাবা হয়, কখনো বা দাদু-দিদিমা শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। কল্পনার সাহায্যে সাময়িকভাবে ইহাদের সহিত একাত্ম হইয়া যায়। পুতুলের সংসার পাতিয়া তাহাতে মাতা-পিতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকার মহলা দিতে থাকে। কল্পনার প্রভাবে শিশু তখন আর যেন শিশু থাকে না, কিছুক্ষণের জন্যও সে বয়স্ক হইয়া পড়ে।

(৬) স্নেহের ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিক, খ্যাতি-প্রশংসার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি সর্বসাধারণ। শিশু-জীবনেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শিশু এদিক দিয়া বঞ্চিত হইলেও প্রশংসার উপযুক্ত বহু কাজ কল্পনায় করিতে থাকে, এমন-কি অসাধ্য-সাধনও করে। কল্পনার এই অসাধ্য-সাধন কাহাকেও সুখী করিবার জন্য নহে, প্রশংসার তৃপ্তি পাইবার জন্য।

(৭) কোনো কোনো শিশু জাঁকজমকের দ্বারা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আকৃষ্ট হয়। অদৃষ্টে হয়তো জাঁকজমক করিয়া দিন কাটাইবার সুযোগ ঘটে না। তখন ওই শিশু কল্পনা করে সে রাজা হইয়াছে বা ওইরূপ একটা-কিছু হইয়াছে, বেশ ঝক্‌ঝকে পোশাক পরিয়াছে, লোকজন তাহার চারিপাশে সাড়ম্বরে ঘোরাফেরা করিতেছে। ইহা খুব উত্তেজনাময় কল্পনা। খুব ছোট বয়সে এইরূপ দিবাস্বপ্ন বড় একটা ঘটে না।

(৮) শিশুর মন সতেজ ও স্বাভাবিক থাকিলে একবার না একবার বীরত্বের দ্বারা মুগ্ধ হয় বা কোনো চরিত্রের প্রভাবে কিছুটা অভিভূত হইয়া

পড়ে। তাহার মন সেই বীরের বা প্রভাবশালী চরিত্রের প্রতি মুগ্ধ ভাবটুকু নানাভাবে প্রকাশ করিতে চায়। শিশুর আকর্ষণ ও মোহ যদি তীব্র হয় তাহা হইলে সে কল্পনায় খুব সেবাপরায়ণ হইয়া উঠে, সকল আদেশ পালন করিতে থাকে এবং বিবিধ উপায়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

৪০। দিবাস্বপ্নের রূপ বিচিত্র হইলেও তাহারা নানাভাবে মিশিয়া থাকিতে পারে। শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশের যোগে তাহার কামনার অবস্থা-অনুসারে দিবাস্বপ্ন সৃষ্ট হয়। বালক ও বালিকার মধ্যে কল্পনার পার্থক্য ঘটে—সাধারণতঃ বালকের কল্পনায় নারী বা বালিকা এবং বালিকার কল্পনায় বালক বা পুরুষের প্রাধান্য থাকে। শিশুর বয়সের উপর দিবাস্বপ্নের বিষয়বস্তু অনেকখানি নির্ভর করে।

৪১। দিবাস্বপ্ন সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি হইলেও ইহার দ্বারা শিশুর বাস্তব জীবনে একাধিক দিকে লাভ হয়। শিশু তাহার দিবাস্বপ্নে নিজে যে অংশ গ্রহণ করে, তদনুসারে তাহার গভীর অনুভূতি লাভ হয়—সে যখন মা হইয়া কাহাকেও ঘুম পাড়ায় বা শাসন করে, তখন সে মনে মনে মায়ের গভীর ভাব ও রসটুকু উপলব্ধি করিতে থাকে। দাদু হইয়া, শিক্ষক হইয়া, ডাক্তার হইয়া, ইঞ্জিন হইয়া, সে বিভিন্ন দিকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা কেবলমাত্র দেখিয়া-শুনিয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। শিশু বাস্তব জীবনে বহুপ্রকার পরীক্ষা করিয়া বহু দিকে অভিজ্ঞতা পাইতে চায়, ইহা শিশুর স্বভাব। কিন্তু বাস্তব জীবনে সত্য সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ক্ষেত্র অল্প। কল্পনায় কোথাও আটক নাই, শিশু যদৃচ্ছা পরীক্ষার রস অনুভব করিতে পারে। মনের অপূর্ণ কামনার গোপন ও অর্ধ-গোপন ইচ্ছা দিবাস্বপ্নের দ্বারা চরিতার্থ হয়, অতৃপ্তির পীড়া অনেক পরিমাণে কল্পনার পথে লঘু হইয়া যায় এবং মনকে অনেক পরিমাণে সুস্থ করে। দিবাস্বপ্নের খেলায় একটি সংগতি, একটি বাঁধুনি থাকে; ইহার ফলে শিশু দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়া পূর্বাপর-সামঞ্জস্যপূর্ণ খেলা সৃষ্টি করিতে পারে—'বীরপুরুষ' যখন তাহার মাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কল্পনা করে, তখন তাহার সমগ্র কল্পনার মধ্যে মোটামুটি একটি স্বাভাবিকতা থাকে, ঘটনাগুলি পরপর ঠিকভাবে কল্পিত হয়, শিশুমন ছোট-খাটো পরিকল্পনা রচনা করিতে শিখে। শিশু যখন পুতুলের সংসার লইয়া বসে, তখন সে অনেকক্ষণ মন দিয়া বাস্তব জীবনের অনুরূপ কার্য সাধন করে। ইহাতে বাস্তব জীবনের লাভ অনেকখানি। অবশ্য, দিবাস্বপ্নের প্রভাব যদি

এমনই হয় যে তাহার দ্বারা শিশুর সময়ের অনেকখানি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে শিশুর লাভের অপেক্ষা ক্ষতির দিকটা অধিক হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন শৈশবের পক্ষেও অস্বাভাবিক। শিশু অধিকক্ষণ দিবাস্বপ্নের মধ্যে ভুলিয়া রহিয়াছে দেখিলে অনুমান করা যায় যে, তাহার মনে অস্বাস্থ্যকর কোনো পীড়া রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

৪২। মিথ্যাচরণের আলোচনায় কয়েক মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া আসা যাক। যেখানে শিশু সত্য-সত্যই মিথ্যাচরণ করিতেছে সেখানে মিথ্যাচরণের কারণগুলি অনুমান করিতে হইবে। এ-সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে এবং মনে প্রীতি ও সহানুভূতি থাকিলে অনুমান ভুল হইবার কারণও কম। অতঃপর কারণ অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে; মিথ্যাচরণের সুযোগ যথাসাধ্য সংকীর্ণ করিতে হইবে এবং অন্তরে ক্ষমা ও স্নেহের কোমলতা রক্ষা করিতে হইবে। যে পরিবেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের মিথ্যার আশ্রয় লইতে দেখা যায় না এবং যেখানে শিশুকে জোর-জবরদস্তি করিয়া সত্যবাদী করিবার জন্য শাসনের ব্যবহার নাই, সেখানে শিশু মিথ্যাচারী হইবে না ধরা যাইতে পারে। পরিবেশে অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ না থাকাই বাঞ্ছনীয়; কারণ, অপূর্ণ কামনা মাতাপিতা বা অন্য স্বজনকে পীড়া দিতে থাকিলে তাঁহাদের আলাপে-আলোচনায় ইচ্ছা-পূরণের উপযোগী নানাপ্রকার অপকৌশলের কথা আসিয়াই পড়ে। ইহাতে শিশু অপকৌশল ও মিথ্যাচরণ শেখে।

## তোৎলামি

৪৩। অনেক শিশু তোৎলামি করে। ইচ্ছা করিয়া খেলার ছলে তোৎলামি করে তাহা নহে। না তোৎলাইয়া কথা বলিতে পারে না বলিয়াই শিশু (বা বয়স্ক ব্যক্তি) তোৎলায়। ইহা শিশুর অস্বাভাবিক অবস্থা। ইহার জন্য কোনো দেহগত কারণ বা মানসিক পীড়া দায়ী। তোৎলামি লইয়া গবেষণা করিবার এবং পরীক্ষা করিবার অনেকটুকুই বাকি রহিয়াছে, বর্তমানে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা অত্যল্প। দেহগত কারণের মধ্যে মস্তিষ্কের মধ্যে বিশেষ কোনো ত্রুটি থাকিতে পারে। বিশ্বাস, মস্তিষ্কে বচন-কেন্দ্র আছে, ইহাই বাক্‌শক্তির প্রধান উৎসস্থান;

বিশ্বাস, বচন-কেন্দ্রের দ্বারাই বাক্‌শক্তি নিয়মিত ও পরিচালিত হয়। যদি শিশুর মস্তিষ্কের ভিতর বচন-কেন্দ্রে কোনো ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে তোৎলামির সৃষ্টি হইতে পারে। বচন-কেন্দ্রের ত্রুটি শিশুর জন্মগত ত্রুটি হইতে পারে, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মস্তকে ক্ষতিকর চাপ পড়িলে অনেক সময় বচন-কেন্দ্র আহত হয়। জিহ্বার অথবা কর্ণেন্দ্রিয়ের অপরিণতি বা বৈকল্য থাকিলে তোৎলামি ঘটে না, অন্যপ্রকার বাগ্‌-বৈকল্য দেখা দেয়। তোৎলামির কারণ বচন-কেন্দ্রের অপরিণতি বা ত্রুটি। এই ত্রুটির সাহত মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনো সম্পর্ক নাই, ইহা মস্তিক-বিকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। দৈহিক কারণ ব্যতীত মানসিক কারণ থাকিতে পারে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক কারণ বর্তমান। বহুপ্রকার মানসিক পীড়ার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শৈশবে নিরাপত্তা-বোধের অভাব এবং সদা-সর্বদা অনিশ্চিত অবস্থার আশঙ্কা শিশুর মনে যে পীড়া উৎপাদন করে, তাহা হইতে ক্রমে এমন এক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যাহার পরিণাম—তোৎলামি। অতি-সতর্ক অভিভাবকের সন্তান-বৈর, মাতা-পিতার বিরক্তিকর পীড়াদায়ক ব্যবহার, শিশুকে উত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলে। ইহার ফলে শিশুর মনের অত্যন্ত গোপন দেশে যে পীড়ার সৃষ্টি হয় তাহাই বাহিরে তোৎলামি-রূপে অনেক সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে। পদে পদে শিশুকে কর্কশভাবে বাধা দিলে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটিতে পারে এবং তোৎলামি দেখা দেওয়াও বিচিত্র নহে। কোনো কোনো শিশু বাম হাতে বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করে, তাহার ডান হাত (বা ডান দিক) বাম দিকের তুলনায় অনিপুণ অবস্থায় থাকে। ইহা একটু অস্বাভাবিক বোধ হওয়ায় মাতা-পিতা চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং নানা কৌশলে, এমন-কি জোর-জুলুম করিয়া, শিশুকে 'ডান-পটু' করিবার চেষ্টা করেন। দু-একটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বাম-পটু শিশুকে জোর করিয়া ডান-পটু করিতে গেলে শিশুর তোৎলামি দেখা দেয়। অবশ্য, ইহা বিরল ঘটনা। দু-একটি পরিবারে তোৎলামি যেন একটি বংশগত ত্রুটি বলিয়া বোধ হয়—সকলেই শৈশবে তোৎলাইতে থাকে, আবার বড় হইলে তোৎলামি কমিয়া যায়। ইহার কারণ ঠিক অনুমান করা যায় না। তোৎলামি বংশানুক্রমিক বা কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি নহে, অন্তত এখন পর্যন্ত তাহাই আমাদের বিশ্বাস। তবে গৃহে বয়স্ক কাহাকেও তোৎলাইতে দেখিলে শিশু

'অন্ধ' অনুকরণ-বৃত্তির বশে খানিকটা তোৎলামির অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারে। ইহাও সচরাচর ঘটে না। সংসারে পিতাকে বা পিতার অনুরূপ কাহাকেও শিশু যদি অতিরিক্ত মাত্রায় ভয় করে তাহা হইলে পিতার বা পিতৃ-প্রতিভূ ব্যক্তির সম্মুখে সে তোৎলাইতে পারে। ইহা ঠিক তোৎলামি নহে, ভয়ের সম্মুখে স্নায়বিক দুর্বলতা মাত্র। পরিবারগত তোৎলামি এবং অতিরিক্ত ভয়ের সম্মুখে তোৎলামি সাধারণতঃ সাময়িক ব্যাপার, আপনা-আপনি ইহা সারিয়া যায়। পিতা-মাতা বা অভিভাবকের দিক হইতে শিশুর প্রতি সস্নেহ ব্যবহার, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতার সুযোগ-দান প্রভৃতি থাকিলে তোৎলামি না ঘটিবারই সম্ভাবনা। তথাপি যদি তোৎলামি দেখা দেয় তাহা হইলে মনোবৈদ্যের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। কখনো কখনো অল্প তোৎলা শিশুকে তাহার নিজেরই লেখা পত্র বা রচনা নিয়মিত পাঠ করিতে দিলে উপকার হয়। তোৎলামি লইয়া কখনো বিদ্রূপ করিতে নাই। শিশু তোৎলাইয়াও যতটুকু প্রকাশ করিয়াছে ততটুকুই সাধারণভাবে, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে যাহাতে সে উত্তর দান করিতে পারে সেইরূপ প্রশ্ন করা বা আলোচনা করা ভালো। কোনো কারণেই শিশু যেন উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। শিশু যেন কোনো প্রকারেই বুঝিতে না পারে যে তাহার তোৎলামির প্রতি কেহ মনোযোগ দিতেছে, অধিক মনোযোগে অধিক ক্ষতি হয়।

## বাম-পটুতা

৪৪। শিশুর বাম-পটুতার কথা উপরে বলা হইয়াছে। খুব ছোট বয়সে শিশু বাম হাতে একটু বেশী কাজ করে বলিয়া যদি মনে হয়, তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই; কারণ, অতি শৈশবের বাম-পটুতা অতি সাময়িক ব্যাপার। পরিবেশে সকলকে দেহের ডানদিকে একটু অধিক মাত্রায় নিপুণ হইতে দেখায় শিশু আপনা-আপনি দক্ষিণ অঙ্গের চর্চা বেশী করে এবং ক্রমশ যথোচিত নৈপুণ্য অর্জন করে। প্রথম প্রথম শিশু তাহার ডান দিকের প্রতি বিশেষ নজর না দিলেও ক্রমশ সে ডান দিকের পটুতা লাভ করে। কিন্তু তাহার সাময়িক বাম-পটুতা দেখিয়া মাতা-পিতা অধীর হইয়া পড়িলে শিশুর ক্ষতি হয়। দু-একটি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভিতরের কেন্দ্রগুলি সাধারণভাবে অবস্থিত না হওয়ায় শিশুর বাম অঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই পটু হয়; এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ

অঙ্গ পটু করিয়া তুলিতে যাওয়া ভুল। শিশুর অন্তরে গূঢ় পিতৃবৈর থাকিলে ক্রমশ দক্ষিণ অঙ্গ অপেক্ষা বাম-অঙ্গের প্রাধান্য দেখা দিতে পারে; যেন শিশুর পিতার প্রতি গোপন ক্রোধ ও হিংসা থাকায় পিতার ডান-পটুতা বর্জন করে, পিতা বাম-পটুতা সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই যেন তাঁহাকে পীড়া দিবার উদ্দেশ্যে সে বাম অঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। অবশ্য শিশু জানিয়া-শুনিয়া-ভাবিয়া এরূপ করে না, অথচ তাহারই মন গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করিয়া বসে। যাঁহারা মনের মধ্যে গোপন কারণ সন্ধান করিতে জানেন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

## অ-বয়সোচিত অভ্যাস

৪৫। মনের গোপন প্রদেশে বৈর, ঈর্ষা, অনিশ্চয়তা প্রভৃতির পীড়া থাকায় শিশু আপন বয়সোচিত আচরণ হইতে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের আচরণে নিজেকে নামাইয়া আনে। মলমূত্র-ত্যাগের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব যে বয়সে স্বাভাবিক সেই বয়সে হঠাৎ অতিশিশুর ন্যায় অসাড়ে বিছানা নোংরা করিয়া ফেলা অন্তরের গোপন পীড়ার পরিচয়। বড় শিশু যখন নিদ্রার ঘোরে শয্যা ভিজাইয়া ফেলে এবং নিজে বহু চেষ্টা করিয়াও এই কু-অভ্যাস হইতে মুক্তি পায় না, তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, মনোগত কোনো গূঢ় কারণ রহিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করা মনের গোপন পীড়ার আর একটি দৃষ্টান্ত। নিরাপদ বোধ না করিলে, মাতৃস্নেহে সন্দেহ দেখা দিলে, স্তন্যপানে গূঢ় অতৃপ্তি থাকিলে বা অপর কোনো কারণে অতিশিশু হইবার গূঢ় ইচ্ছা থাকিলে, শিশুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-লেহনের অভ্যাস দেখা যায়। ইহা ব্যতীত অকারণে চুরি করা, অকারণে ঝগড়া করা, কান্নাকাটি করা—এইগুলিও শৈশবের অন্তঃপীড়ার ফল। মাতাপিতার স্নেহে শিশু তৃপ্ত থাকিলে এগুলি সাধারণতঃ দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, শিশুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ইহার জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। একই অবস্থায় সকল শিশুরই যে একই অন্তঃপীড়া সৃষ্ট হইবে তাহার কোনো কারণ নাই এবং একই অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃ-প্রকাশ সকল শিশুর একরূপ হইবে তাহারও নিয়ম নাই। যে অবস্থায় একজন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-লেহনের অভ্যাস গঠন করে সেই অবস্থায় অপরজন বিছানা নোংরা করিতে পারে, আবার অন্য শিশু বামপটুতা প্রদর্শন করিতে থাকে। কোনো অসাধারণ শিশু অন্য কোনো অসাধারণ উপায়ে আপন মনঃপীড়া হইতে আপনাকে

উদ্ধার করিতেও পারে। পূর্ব হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না কোন্ কোন্ অবস্থাবশে কোন্ শিশু কী লক্ষণ প্রকাশ করিবে—অন্তত মনোবিদ্যার যতটা চর্চা হইয়াছে তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত এখনো সম্ভবপর নহে।

## অভ্যাস-গঠন অভ্যাস-বর্জন

৪৬। বয়স্ক-জীবনে মনের কথা ও বাহিরের আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। শৈশবের আচরণ এবং শৈশবের মন অনেকটা এক থাকে। সেই কারণে বাহিরের আচরণ বিচার করিয়া বয়স্কদের অন্তর অনুমান করা দুঃসাধ্য হইলেও শিশুর আচরণ হইতে শিশুর অন্তরবিকাশ অনুভব করা কঠিন নহে। এই কারণেই বোধ হয় মাতাপিতা শিশুর বাহ্য আচরণ শোভন ও মধুর করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অবশ্য, মাতা-পিতা মাত্রেই ব্যস্ত হইয়া উঠেন, এমন কথা বলিবার মতো সৌভাগ্য কোনো সমাজেরই নাই—অনেক মাতাপিতা শিশু সম্পর্কে যথাসাধ্য উদাসীন থাকেন, যেন শিশুর যাহা হইবার তাহা আপনা-আপনিই হয়, সাহায্য করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের নাই। আবার কোনো মাতা বা পিতা শিশুকে ভালো করিবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য শাস্তির ব্যবস্থা করেন, যেন শিশুর যত-কিছু মঙ্গল তাহা শাস্তির মধ্যেই নিহিত আছে। এই সকল উদাসীন বা দণ্ডপাণি পিতামাতার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা কর্তব্যভ্রষ্ট এবং সমাজের নিকট অপরাধী। যাঁহারা শিশুর মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিকট শিশুর সদভ্যাস গঠন একটি সমস্যা; শিশুর কোনো অশোভন অনভিপ্রেত অভ্যাস গঠিত হইয়া গেলে, তাহা দূর করা আরো কঠিন সমস্যা। এই সমস্যায় স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সংযত মাতা-পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে; জড়-জগতের অব্যর্থ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাদৃশ এ ক্ষেত্রে নাই; অতএব এই পরামর্শগুলি, ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিতে পারে এরূপ কতকগুলি ইঙ্গিতমাত্র।

(১) সর্বপ্রথম পরামর্শ—ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যস্ত হইবার কারণ থাকে না, ইহা মাতা-পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকার স্মরণে রাখা কর্তব্য। শিশুর প্রকৃতিতে এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা সে ক্রমাগত মন্দের দিকেই ঝাঁকিতে থাকিবে। অনুকূল পরিবেশে শিশু তাহার শত দিকে শত প্রকার আকর্ষণের মধ্যে সদভ্যাস গঠন করিতে পারে; সাময়িকভাবে

একটু-আধটু বেচাল দেখা দিলেও তাড়াহুড়া করিবার হেতু নাই। শিশু আপনা-আপনি তাহার পরিবেশের মূল প্রভাবে ফিরিয়া আসিবেই।

(২) শিশুর দেহ সুস্থ ও সবল হওয়া চাই এবং মন সদা-সর্বদা স্নেহপুষ্ট ও ক্রীড়া-চঞ্চল হওয়া প্রয়োজন। সদভ্যাস ও কঠিন অভ্যাস গঠনের জন্য শক্তির ও আনন্দের প্রয়োজন। কোনো কারণেই আনন্দের ও শক্তির উৎস সঙ্কীর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে।

(৩) শিশুর বয়স ও সামর্থ্য-অনুসারে অভ্যাস-গঠনের ব্যবস্থা করিতে হয়। অত্যন্ত কঠিন শিক্ষা দিতে গেলে শিশু ব্যর্থ হয় এবং ক্লান্ত হয়। বারে বারে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইতে থাকিলে অবশেষে সে শিক্ষা-বিমুখ হইয়া পড়ে। তাহার পক্ষে স্নেহের শত প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও অতি দুঃসাধ্য শিক্ষা অসম্পন্ন থাকিয়াই যায়; সাধারণভাবে একটা শিক্ষা-বিমুখতা আসিয়া পড়াও অসম্ভব নহে। যাহা অতি সহজ, শিশুর পক্ষে তাহাও বিরক্তিকর। শিশু এখন যতটুকু কঠিন শিক্ষা লাভ করিতেছে, প্রতিদিন সেইরূপ শিক্ষা দিতে থাকিলে শিশুর বিরক্তি বোধ হয়। এই কারণে অতি-কঠিন অভ্যাসের ব্যবস্থা যেমন অনভিপ্রেত, অতি-সহজেরও তেমনি বিশেষ আকর্ষণ নাই এবং একই পর্যায়ের অভ্যাস দীর্ঘকাল শিশুর পক্ষে অনর্থক। যতটুকু শিশু এখন পারিতেছে, ক্রমশ তদপেক্ষা একটু কঠিন ও কঠিনতর কর্তব্যের আহ্বান থাকিলে শিশুর অভ্যাস উন্নত হইতে পারে এবং মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের বৃদ্ধি হয়। একটু-কঠিন শিক্ষা সেইজন্য শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়। বয়স ও সামর্থ্য-অনুসারে সকল শিক্ষাকে ভাগ করিয়া দেওয়া মনোবিজ্ঞানেও সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয় নাই, ভবিষ্যতে হয়তো হইবে। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে মাতা-পিতাকে তাঁহাদের অনুমান-অনুভূতির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। শিশুর প্রতি মনোযোগ এবং সহানুভূতি থাকিলেই ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভুল হইবে।

(৪) পরিবেশের যোগে শৈশব-অভ্যাস-গঠনের এবং অন্তরে অন্তরে হইয়া-ওঠার কয়েকটি ধারা আছে। শিশু তাহার বয়সের নির্দিষ্ট স্তরে মাতা বা পিতার সহিত একাত্মতা বোধ করে, এক-আত্মা হইয়া গিয়া যেন সে মাতা বা পিতার মূল প্রকৃতিকে অনুভব করিতে থাকে এবং নিজের স্বভাবে তাহা শোষণ করিয়া নিজেকে নূতন করিয়া গড়িয়া লয়। ইহাই শিশুর অন্তরের এবং আংশিকভাবে বাহিরের দিক দিয়া অভ্যাস-গঠনের প্রাথমিক ধারা। শৈশবে ইহাই মৌলিক শিক্ষা, চিরজীবন এই শিক্ষাটিই তানপুরার মূল সুরের ন্যায়

অন্তরালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর স্বভাবে অপরের চিন্তা ধারণা অনুভূতি আচরণ প্রভৃতি অনুকরণ করিবার একটি প্রেরণা আছে। (ইহা চিরজীবনই থাকে, তবে বয়স্ক ব্যক্তিরা ব্যক্তিত্বের দম্ভ থাকায় অপরের অনুকরণ করিয়াও স্বীকার করিতে চাহেন না।) শিশু অধিকাংশ সময় না জানিয়া, না ভাবিয়া, এমন-কি সে যে কাহাকেও বা কোন কিছুকে অনুকরণ করিতেছে ইহা তিলমাত্র অনুভব না করিয়াই, অপরকে অনুকরণ করে। শিশুর এই প্রকার অননুভূত অনুকরণকে অনুক্রিয়া বলা চলে। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বজন-প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এমন-কি গল্পের বীর-চরিত্র, সকলই শিশুর নিকট অনুক্রিয়ার হেতু বা উপলক্ষ্য। শিশু তাঁহাদের অনুক্রিয়ার দ্বারা অন্তরের ও প্রধানতঃ বাহিরের অভ্যাস গঠন করে। ইহাকে দ্বিতীয় ধারা বিবেচনা করা যায়। শিশু যখন কাহারও প্রতি বা কোনো-কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া অনুকরণ করে, তাহার সেই শিশু-সুলভ অনুকরণকে অভ্যাসের তৃতীয় ধারা বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত পরিবেশের প্রভাবে বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া, অনুভব করিয়া, চেষ্টার ধারা যুক্ত হয়; শিশু অনুক্রিয়া ও অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাশক্তি প্রয়োগ করিয়া নানাপ্রকার অভ্যাস গঠন করে।

শৈশবে অভ্যাস-গঠন ব্যাপারের এই সহজ বিশ্লেষণ হইতে একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়—শিশুর একাত্মতা-সাধনের ও অনুক্রিয়া-অনুকরণের পরিবেশ উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যাঁহাদের স্বভাবকে শিশু আপন স্বভাবে শোষণ করিবে, সেই মাতা-পিতার দায়িত্ব যে কত অধিক, তাহা ব্যাখ্যা করা নিতান্ত বাহুল্য। শিশু যাহা কিছু অনুসরণ করিয়া আপনার অন্তরে এবং বাহিরের আচার-আচরণে অভ্যাস গঠন করিবে, তাহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্তব্য, ইহাও অনেকটা স্বতঃপ্রমাণ সূত্র। শিশু যাহাতে আজন্ম অভিপ্রেত পরিবেশে থাকিতে পারে তাহার আয়োজন করা ও সাধনা করাই শিশু-শিক্ষার মূল কথা।

(৫) গৃহে বা বিদ্যালয়ে সদভ্যাসের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত থাকাও বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে বর্তমানে বি. এ. বা এম. এ.. পাস করার পর শিক্ষা-সমাপ্তির অভ্যাসটিই প্রধান। শিশু এরূপ বি. এ., এম. এ. উত্তীর্ণ ব্যক্তির পরিবেশে শিক্ষার অভ্যাস সহজেই গঠন করিবে, এই কামনা ও বিশ্বাস আমাদের রহিয়াছে। কিন্তু যখন দেখা যায় বি. এ. বা এম. এ.-র সন্তান বা ভ্রাতা-

ভগিনী বা ছাত্র-ছাত্রীরাও তেমন সহজে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয় না এবং চেষ্টা করে না, তখন আমাদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, শিশুর উপরে পরিবেশের বিশেষ কোনো প্রভাব আছে কি না। অথচ সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বি. এ.-এম. এ.-র প্রভাব শিশুর শিক্ষার দিকে তেমন খাটিতেছে না, তাহার কারণ রহিয়াছে। বি. এ, এম. এ.-র শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত, শিশু এই সমাপ্তির আবহাওয়ায় বড় হইতে থাকিলে কী করিয়া নূতন নূতন অভ্যাস গঠন করিতে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিবে? শিক্ষা ব্যাপারে তাহার সম্মুখে অনুক্রিয়া-অনুকরণের উপলক্ষ্য কোথায়? যে পরিবেশে 'মূর্খ' (কিন্তু চরিত্রবান্) পিতা বা ভ্রাতা শিক্ষার জন্য চেষ্টা কারতেছেন, বা যে পরিবেশে বি. এ., এম. এ.-রা আরো-শিক্ষার সাধনা করিতেছেন, সেখানে শিশুর শিক্ষার আগ্রহ ও অভ্যাস সহজ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এই কারণেই প্রৌঢ়-পরিণত অভ্যাসের পরিবেশ বা 'রেডিমেড' পরিবেশই সব নয়, নিত্য-নূতন উদ্যম ও সাধনার প্রভাবই বিশাল, গভীর ও সুদূরগামী।

(৬) অনেকে শিশুকে কোনো দিকে উৎসাহিত করিবার জন্য কেবল উৎসাহই দেন না, উৎসাহ-দানের কৌশল হিসাবে অপরের খানিকটা নিন্দাও করিয়া থাকেন; কখনো কখনো আবার 'ঘুষ' দিবার ব্যবস্থাও করেন, বলেন 'এইটি তুমি শিখিতে পারিলে তোমায় অমুক জিনিসটি দিব'। উৎসাহদানের এইগুলি ভালো কৌশল নহে, বরং অপকৌশল বলা যাইতে পারে। শিশু যাহাকে ঈর্ষা করে বা যাহার প্রশংসায় শিশুর ঈর্ষা-বোধ হইতে পারে, তাহার সুখ্যাতি করিয়া শিশুকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টাও ভালো নহে।

(৭) কোনো অভীষ্ট শিক্ষা-গ্রহণে তেমন রুচি নাই অথবা কোনো অবাঞ্ছিত অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শিশুর মাতা-পিতা নানারূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শাস্তি বর্জন করেন না। শাস্তির দ্বারা সদভ্যাসে অনুপ্রেরিত করা সম্ভব নহে। শাস্তি সাধারণতঃ বাহিরের আচরণকেই পরিবর্তিত করিতে পারে, অন্তরের পরিবর্তন করিতে হইলে স্নেহের চাপ এবং অনুক্রিয়া-অনুকরণের উপযুক্ত সুযোগ দিতে হইবে। কোনো কোনো সময়ে শিশুর ঐকান্তিক ইচ্ছা-সত্ত্বেও সে অন্যান্য আকর্ষণ হইতে নিজেকে সংযত করিয়া সদভ্যাস-গঠনে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সেই-সকল সময়ে শিশুর সম্মুখে সদভ্যাস-গঠনের

সুযোগটুকু খোলা রাখিয়া অন্যান্য পথ রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। শিশু যে-সকল আকর্ষণ হইতে নিজেকে সরাইয়া আনিতে চাহে, সেই-সকল আকর্ষণকে নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য মাঝে মাঝে একটু শাস্তির আভাস দিলেও কাজ হয়—কাহারও কাহারও মতে এই অবস্থায় শাস্তি-দান শেষ-পর্যন্ত শিশুকে উৎসাহিতই করে। এই মতানুসারে শাস্তির দ্বারা অবাঞ্ছিত আকর্ষণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে পারিলে শিশুর পক্ষে সদভ্যাসে মনোযোগ ও শক্তি-প্রয়োগ সম্ভব হয় এবং শিশু তাহার কাম্য অভ্যাস গঠন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাহার এই আত্মপ্রসাদ শাস্তির পীড়াটুকু মুছিয়া দেয় ও তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করে। এই মত সকলের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার মূল্য অনেকে স্বীকার করিবেন। তথাপি যে-অভ্যাস বাঞ্ছিত সেই অভ্যাসের জন্য, সেই অভ্যাসের নাম করিয়া, কোনো শাস্তি দান করা আমাদের সমর্থনযোগ্য নহে। বাঞ্ছিত অভ্যাসের বাধা-স্বরূপ যে সকল আকর্ষণ রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেই দিকগুলি বন্ধ করিবার জন্য শাস্তিদান হয়তো চলিতে পারে।

শিশুকে কোনো-কিছু হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে, বা অনভিপ্রেত কোনো অভ্যাস দূর করিতে হইলে, সাধারণতঃ শিশুর প্রতি কোনো-না-কোনো প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। শিশু অবাঞ্ছিত আচরণ করিবার সময় যদি শাস্তি পায় তাহা হইলে তাহার মনে অবাঞ্ছিত আচরণ এবং শাস্তির পীড়ার মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ গ্রথিত হয়। পুনঃ পুনঃ অবাঞ্ছিত আচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শাস্তি পাইতে থাকিলে শিশুর মনে এমনই এক সংস্কার জন্মিয়া যায় যে, সেই প্রকার আচরণ করিবার ইচ্ছামাত্রই শাস্তির আশঙ্কা জাগ্রত হয়। অবশেষে অবাঞ্ছিত আচরণ আর দেখা যায় না এবং শাস্তির পীড়া তেমন মনে পড়ে না। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যে শাস্তির প্রভাবে শিশুর আচরণ ভালো হইয়া গিয়াছে। শাস্তিদানের পশ্চাতে এইরূপ একটি বিশ্বাস থাকে বলিয়াই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। শাস্তির দ্বারা বাহিরের আচরণই প্রধানতঃ পরিবর্তিত করা যায়, অন্তরকে স্পর্শ করা যায় না—তথাপি অনেকেই বিশ্বাস করেন যে শাস্তির প্রভাবেই হউক বা অন্য কোনো কারণেই হউক শিশু যদি অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে বেশ কিছুকাল মুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহার মনেরও সৎপরিবর্তন অবশ্যই ঘটে। অর্থাৎ, বাহিরে আচরণের পরিবর্তন ঘটাইয়া অন্তরকেও তদনুরূপ করিয়া তোলা বয়স্কজীবনে দুঃসাধ্য

হইলেও শৈশবে সহজ। এই বিশ্বাস থাকাতেই অনেকে শিশুর মঙ্গলের জন্য অবাঞ্ছিত আচরণের ক্ষেত্রে অল্পাধিক শাস্তির ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

শাস্তির ব্যবস্থা অনুমোদন করিলে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করা কর্তব্য। কোনো শাস্তি এমনভাবে দেওয়া উচিত নহে যাহাতে শিশুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। শিশু, শিশু বলিয়া যে আত্মবোধ হইতে রক্ষিত তাহা নহে। পরিবেশে মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির দৈনন্দিন আচরণে আত্মসম্মানের প্রকাশটুকু যদি স্পষ্ট হয়, তাহা হইলে অল্প বয়স হইতেই শিশুর আত্মসম্মান জাগ্রত হইতে থাকে। ইহার মূল্য অনেক, কোনো কারণেই ইহার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নহে। সাধারণতঃ বালকের সম্মুখে বালিকার এবং বালিকার সম্মুখে বালকের আত্মসম্মানবোধ একটু স্পর্শ-কাতর অবস্থায় থাকে। এই কারণে বালকের সম্মুখে বালিকাকে এবং বালিকার সম্মুখে বালককে শাস্তি দিতে গেলে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। আত্মসম্মানী শিশুকে অনেকের সম্মুখে শাস্তি না দিয়া আড়ালে পৃথক্‌ভাবে দণ্ডিত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো হয়। কখনও কোনো শিশুকে ঘন ঘন শাস্তি দিতে নাই, কারণ ঘন ঘন শাস্তি পাইতে থাকিলে শাস্তির প্রতি অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টি হইতে পারে, তখন আর শাস্তির পথে শিশুর অন্তর স্পর্শ করিবার কোনো উপায় থাকে না। শাস্তির বিভিন্ন পর্যায় আছে। আত্মসম্মানের বোধ অনুসারে বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যে শিশু পিতা-মাতার অসন্তোষ দেখিলেই লজ্জিত হয় তাহাকে প্রহার করা তো বর্বরতা ছাড়া কিছুই নয়, এমন-কি ভর্ৎসনা করাও চলে না। তাহার ক্ষেত্রে পিতামাতার দিক হইতে অসন্তোষের মৃদু প্রকাশই যথেষ্ট। আবার অনেক শিশু আছে যাহাদিগকে তীব্র ভর্ৎসনা না করিলে অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। সুতরাং শাস্তিদানের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকিতে পারে না। শিশুর বয়স যত বাড়িতে থাকে, তাহার আত্মসম্মানের বোধ ততই তীক্ষ্ণ হয়, এ-কথাটিও স্মরণে রাখা উচিত। আবার, অল্পবয়সী শিশুর ঝোঁক তীব্র থাকে, অতএব তাহাদের অপরাধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধ বলিয়া ধরিলে চলে না। মাতাপিতা শিশুর চরিত্রে যে আচরণের অভ্যাস গঠন করিতে চাহেন, কোনো কারণেই সেই কাজটিকেই শাসনের উপায় রূপে যেন ব্যবহার না করেন। যেমন, অনেক শিক্ষক ছাত্রকে গৃহ হইতে হাতের লেখা লিখিয়া আনিতে নির্দেশ দেন। শিশু হাতের লেখা

না আনিলে শিক্ষকমহাশয় তাহাকে শাস্তি-স্বরূপ অতিরিক্ত হাতের লেখার আদেশ দেন। এই পদ্ধতি ভুল। হাতের লেখায় নিপুণ করিতে গিয়া হাতের লেখাকেই শাস্তি-স্বরূপ ব্যবহার করিলে, হাতের লেখার প্রতি শিশুর কোনো আকর্ষণ গড়িয়া ওঠা সম্ভব হয় না।

একটি কথা আছে, 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'। অর্থাৎ, যিনি শিশুকে অন্তর দিয়া ভালোবাসেন কেবলমাত্র তাঁহারই শাস্তিদানের অধিকার থাকিতে পারে। ইহার কারণ আছে। শাস্তিদানের মূল উদ্দেশ্য, শিশুর মনে শাস্তি-পীড়ার সহিত অবাঞ্ছিত আচরণের অনুষঙ্গ স্থাপন করিয়া দেওয়া। তাহাতে, যখনই কোনো বর্জনীয় আচরণের ঝোঁক শিশুর দেখা দেয় তখনই শিশুর মনে পীড়ার স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। আচরণের সহিত পীড়ার সম্বন্ধ স্থাপন তখনই সম্ভব হয়, যখন শাস্তিদাতার অন্তরে শিশু-প্রীতি থাকে এবং যখন শিশু সেই ভালবাসা বুঝিতে পারে। শাস্তিদাতার ভালবাসা শিশু যদি বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সে শাস্তিদাতার সহিত শাস্তির পীড়ার সম্বন্ধ স্থাপন করে—শাস্তির পীড়া যেমন সে পছন্দ করে না, শাস্তিদাতাকেও তেমনই অপছন্দ করিতে থাকে। মাতা-পিতা ও শিক্ষকের ভালবাসা সম্পর্কে শিশু যদি নিঃসন্দেহ না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দেওয়া শাস্তির সহিত তাঁহারাই অপ্রিয় হইয়া ওঠেন। শাস্তি দিতে গিয়া তাঁহারা শিশুর উপর তাঁহাদের কল্যাণকর প্রভাবেরও অনেকখানি হারাইয়া বসেন। এইসকল কারণে, না ভাবিয়া-চিন্তিয়া শাস্তি দেওয়ার বিপদ আছে।

শ্রেষ্ঠ উপায় শাস্তি না দেওয়া। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপায় সকল সময় গ্রহণ করা সম্ভব হয় না; তাই শাস্তিদান কিরূপ হওয়া উচিত ভাবিয়া দেখিতে হয়। ছোট্ট শিশুকে কখনো কখনো ধরিয়া তুলিয়া লইয়া একটি ঘরে একাকী রাখিয়া দিলে শাস্তির কাজ হয়। অনেক সময় শিশুর অন্যায় ক্রন্দনের দিকে কোনোরূপ মনোযোগ না দিলেই শাস্তিদান করা হয়। কখনো কখনো কথাবার্তা বন্ধ করিয়া একপ্রকার সামাজিক বর্জনের ভাব ফুটাইলে শাস্তির সমতুল্য হয়। বলা বাহুল্য কোনো ক্ষেত্রেই মাত্রা অতিক্রম করিতে নাই, কোনো ক্ষেত্রেই যেন শিশু ভয়ে অসহায় বোধ না করিতে থাকে।

শাস্তিদানের অন্তরালে একটি মহান্ উদ্দেশ্য থাকা উচিত। শাস্তির উপলক্ষ্যও যথাসাধ্য হ্রাস করিয়া শিশুকে তাহার নিজের ত্রুটি সম্পর্কে

বুঝাইয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অতি-শিশু যুক্তি বুঝিতে পারে না বটে, তথাপি শৈশবে যৌক্তিক প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। শৈশবে শাস্তি অপেক্ষা আবেদন ও যুক্তির ফল অনেক ক্ষেত্রেই শুভ হয়।

(৮) শাস্তিদানই হউক আর আবেদন ও যুক্তির চেষ্টাই হউক, মাতা-পিতা প্রভৃতির দিক হইতে একপ্রকার দৃঢ়তার প্রকাশ থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের দিক হইতে খেয়াল-খুশি বা দ্বিধার ভাব থাকিলে শিশু তাহার সুযোগ গ্রহণ করে। একই আচরণে অভিভাবকদের আজ এক-রকম ও কাল অন্য-রকম ব্যবহার শিশুকে অনিশ্চিত করিয়া তোলে, কোনো নির্দিষ্ট অভ্যাস গঠনে শিশু বাধা পায়।

(৯) অনভিপ্রেত আচরণের ক্ষেত্র যথাসাধ্য সংকীর্ণ করিয়া লইতে হয়। কেবলমাত্র গৃহের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় না, পাড়া-প্রতিবেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা একযোগে সকলেরই চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

(১০) অবাঞ্ছিত আচরণের ক্ষেত্র যেমন সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হয়, তেমনই বহু দিকে বহু বাঞ্ছিত আকর্ষণেরও সৃষ্টি করিতে হয়। কোনো অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে শিশুকে অন্য কোনো ভালো দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়। কিন্তু পরিবেশে যথেষ্ট ভালো আকর্ষণ না থাকিলে শিশুর মন মন্দ দিক হইতে ঘুরাইবার উপায় থাকে না।

(১১) কাহারও কাহারও বিশ্বাস, কোনো সদভ্যাস আরম্ভ করিতে হইলে শিশুর মনে সেই অভ্যাসের অনুকূল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে উৎসাহদানের ছলে শিশুর উদ্দীপনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হয়। অভ্যাস-গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় আলস্যভরে কোনরূপ শৈথিল্য ঘটিতে দিতে নাই। উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা শিশুকে অভ্যাস-গঠনে নিরলস করিয়া রাখিতে হয়।

(১২) সকলের বড় কথা—মাতাপিতার ব্যক্তিত্ব। সদভ্যাস-গঠনে এবং অসদভ্যাস-বর্জনে সাহায্য করিতে তাঁহারা যত কৌশলই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের উপরেই সর্ব সফলতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। আর মাতাপিতার ব্যক্তিত্বে তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনার ফলচিহ্নিত, বাহির হইতে আরোপ করিবার বা আহরণ করিবার বস্তু নয়।

## রুচি-বিকাশ

৪৭। সুন্দর ও মধুরের প্রতি মানুষের এক আকর্ষণ আছে, ইহা মানবমনের চিরন্তন ব্যাপার। প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর যুগে অনুসন্ধান করিলেও সুন্দরের ও মধুরের অভিমুখে মানুষের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর মধ্যে মানুষের এই চিরন্তন প্রেরণাটি জাগ্রত আছে। খুব সহজেই শিশু সুন্দর ও মধুরের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্রভাবান্বিত হয়। কেমন করিয়া বলা যায় না, শিশু স্বাধীনতা পাইলেই সুন্দর ও মধুরের আহ্বানে সাড়া দেয়। পরিবেশের একটু আনুকূল্য পাইলেই শিশু নিজেই সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিতে থাকে। শিশুর রুচিকে বিকশিত করিতে গেলে, কোনো-একটি বিশেষ দিকে সুযোগ দিলে এবং উৎসাহ দিলেই যথেষ্ট হয় না—শিশু একটু গান করিতে শিখিল, একটু ছবি আঁকিতে পারিল, অথবা একটা ফুলগাছ বসাইল ইহা তাহার সুন্দর রুচির পূর্ণ পরিচয় নহে। শিশুর অন্তরে যদি সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের প্রেরণাটিকে জাগাইয়া তোলা যায় তাহার রুচি উদ্‌গত ও উন্নত হইতে থাকে। কোনো-একটি বিশেষ-বিষয়িণী রুচি সমগ্র অন্তরের রুচিমত্তার তুল্যমূল্য নহে। শিশুর রুচিকে সুন্দর ও মধুরের দিকে বিকশিত করিতে হইলে পরিবেশের বহু দিকে সেরূপ সুযোগ উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক, কেবল একটি-দুটি সুযোগই যথেষ্ট নহে। শিশুর চতুষ্পার্শ্বে মাতাপিতা এবং অপরাপর ব্যক্তি নানা উপলক্ষ্যে সুন্দর বা অসুন্দর, মধুর বা অমধুর বিষয় লইয়া নানারূপ মতামত প্রকাশ করেন। কখনো শিশুকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, কখনো বিনা উদ্দেশ্যেই নিজেদের মধ্যে কথোপকথন চলে। ব্যক্তি-পরিবেশে সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের আভাস-ইঙ্গিত অনুভব করিয়া এবং অনুসরণ করিয়া শিশু-মনের রুচি গড়িয়া ওঠে। বয়সের সহিত বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কল্পনা অনুভূতি প্রভৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে থাকে এবং তদনুসারে শিশুর রুচির ক্রমিক গঠন ও পরিণতি সম্পন্ন হয়।

৪৮। শিশুর পরিবেশে সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের যে একটিমাত্র আদর্শ ও ধারণা বর্তমান থাকে, তাহা নহে। সুন্দর-অসুন্দর, মধুর-অমধুর, ভালো-মন্দ লইয়া বহুবিধ ধারণা ও বহু তর্ক রহিয়াছে, শিশুকে ওইগুলির মধ্য হইতে নিজের রুচিকে গঠন করিতে হয়। পরিবেশে যেরূপ রুচি ও ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট ও প্রবল, শিশু-চরিত্রে তাহারই প্রভাব স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়। এমন যদি হয় যে শিশু কোনো দিকেই কোনো সুস্পষ্ট রুচির প্রাধান্য অনুভব করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার রুচিও শিথিল, অস্পষ্ট ও অস্থায়ী হইয়া পড়ে।

যে-ব্যক্তি শিশুর প্রিয় তাঁহার রুচি শিশুর মনে অধিক রেখাপাত করে এবং শিশু তাঁহার রুচির ভূমিকায় আপনার রুচিকে বিকশিত করে। অপ্রিয় ব্যক্তির রুচি হইতে শিশুর রুচি-গঠন ভিন্ন পথে হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। কোনো কোনো শিশু কোনো দিকে হয়তো স্বভাবতঃই বিশেষ সামর্থ্যের অধিকারী, তাহার পক্ষে বিশেষ সামর্থ্যের দিকেই নৈপুণ্য অর্জন করা সহজ হয়। মনে হয় শিশুর রুচি বুঝি সেইভাবেই উন্নত হইবে। কিন্তু বিশেষ দিকে নৈপুণ্যলাভ ও অন্তরের রুচির বিকাশ একই কথা নয় বলিয়া, বিশেষ সামর্থ্যের আনুকূল্য করিলেই যে সামগ্রিক রুচির বিকাশ হয়, এমন নয়। তবে, বিশেষ সামর্থ্য-অনুযায়ী সুযোগ দিলে শিশু উৎসাহ পায় এবং তখন বহু দিকে তাহার মনের রুচি উন্নত করা সহজ হয়।

৪৯। শিশুর রুচি-গঠনে ব্যক্তির দান সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু ব্যক্তি-পরিবেশের বাইরে যে পরিবেশ, যাহা চতুর্দিকে অসীমে বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব শিশুমনে অলক্ষ্যে কাজ করিয়া যায়। শিশুর আত্মবিকাশে, তাহার সুন্দর-মধুরের ধারণায়, সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের প্রেরণায়, বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব নিঃশব্দভাবে অথচ অব্যর্থভাবে সক্রিয়, এ কথা বলিলে কবিত্ব-উচ্ছ্বাসের ন্যায় শুনিতে লাগে। অথচ ভূতত্ত্বে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে মানুষের দেহের ও মনের উপর প্রকৃতির ক্রিয়ার বহু প্রমাণ স্বীকৃত হয়। আমরা আমাদের জীবনে এক দিকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করি, অপর দিকে শৈশব-রুচি-গঠনে উহাকেই কার্যতঃ অস্বীকার করি। ইহা আমাদের বিচারে অসঙ্গতির পরিচয় মাত্র।

৫০। শৈশবের পরিবেশে সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রাধান্য থাকা চাই—বহুজনের চেষ্টায় ও সাধনায় কোনো স্থান বা কোনো-কিছু সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিতেছে, শিশুর এইরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ হওয়া আবশ্যক; পরিবেশ সুন্দর ও মধুর হইয়া রহিয়াছে, তবে আর কিছুই করিবার নাই, এ-ভাব শৈশবের শিক্ষার পক্ষে ঠিক নহে। শিশু দেখিবে ও অনুভব করিবে যে চতুষ্পার্শ্বে সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের সাধনা চলিতেছে. তবেই শিশুর অন্তরের রুচি সমৃদ্ধ হইবে, তাহার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিটুকু লইয়া সেও সেই সাধনায় অংশ গ্রহণ করিবে। চতুর্দিকে সৌন্দর্য ও মাধুর্য ঝরিতে থাকিবে—বাক্যে, গতিতে, লিখনে, পঠনে, চিত্রে, নৃত্যে, সংগীতে, দেহ-সঞ্চালনে। শিশু মুহূর্তে সহস্র প্রকারে সুন্দর মধুরের ভাবটুকু শোষণ করিবে।

৫১। শৈশবের রুচি-গঠনে সাহায্য করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা ভালো—

(১) শিশুর সম্মুখে রুচি সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনায় মাতা পিতা এবং যাঁহারা শিশুর প্রিয় তাঁহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিবেন। সুন্দর ও মধুর যাহা-কিছু আছে তৎসম্পর্কে যথাসাধ্য কথাবার্তা চলিবে এবং সুন্দর ও শোভন সকল-কিছুর প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। মতামতের ভিতর অস্পষ্টতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বহু উপলক্ষ্যে বহুবার মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। মাতা পিতা ও প্রিয়জনের চরিত্রে সৌন্দর্যপ্রিয়তা স্বাভাবিক হইলে তবেই এরূপ শিক্ষা সহজ হয়।

(২) শিশুর নিকট-পরিবেশে সৌন্দর্য-রচনার আন্তরিক চেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়। মাতা-পিতা শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতির স্বভাবে সৌন্দর্য-রচনার ঝোঁক থাকিলে, আপনা-আপনি শিশুর পরিবেশটি সৃষ্টিশীল হইয়া পড়ে, সতত সৌন্দর্যে মাধুর্যে বিকাশমান প্রকাশমান বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং শিশুচিত্তে কল্যাণকর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(৩) পরিবেশের উপাদানগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সুন্দর হইবে, ইহা যেমন আবশ্যক, তেমনি সমস্ত উপাদান মিলাইয়া পরিবেশের মধ্যে একটি সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠা প্রয়োজন। বহুপ্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিসের স্তূপ গৃহের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকিলে শিশুর রুচি-বিকাশ আশানুরূপ হইবে না—টুকরা টুকরা সৌন্দর্যের ভিড় শিশুর পক্ষে তেমন উপযোগী নহে। কারণ, শিশু আপনা হইতে এই-সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখে না। সৌন্দর্যের সমস্ত টুকরা মিলিয়া যদি একটি সৌন্দর্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহা শিশুর বিকাশে আনুকূল্য করিতে পারে। রুটিন করিয়া একটু সংগীত, একটু চিত্রাঙ্কন, একটু নৃত্য প্রভৃতি দিলে শিশুর রুচির উন্নতি সামান্যই হয়; কিন্তু সংগীত, চিত্র, নৃত্য ইত্যাদি মিলাইয়া একটি স্বাভাবিক, সর্বাঙ্গীণ, সমগ্র ভাব সৃষ্ট হইলে, তাহার যোগে শিশুর রুচি উদ্‌গত হইতে পারে। ইহা হয়তো ঠিক ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো গেল না, কারণ, জীবনকে সব সময় ব্যাখ্যায় ধরা যায় না।

(৪) পরিবেশে সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের প্রভাব স্পষ্ট করিয়া তুলিতে ব্যয়বহুল আয়োজনের আবশ্যক হয় না। যতটুকু আছে তাহারই মধ্যে

কতখানি সুন্দর করিয়া তোলা যায়, সেই চেষ্টাই শিশুর মনকে গড়িতে থাকে; অল্পমূল্যের সুন্দর বস্তুটিও শিশুর বিকাশের পক্ষে অমূল্য।

(৫) মাতা পিতা এবং নিকটতম পরিবেশ সম্পর্কে যে-কথা বলা হইল, বিদ্যালয় এবং বাহিরের বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কেও সেই একই কথা।

(৬) শিশু নিজে যাহাতে সৌন্দর্য-সৃষ্টির চেষ্টা করিতে পারে যথাসাধ্য তাহার সুযোগ দিতে হইবে—শিশুকে আপন ইচ্ছামত আঁকিতে, সাজাইতে, গড়িতে দিতে হইবে। সৌন্দর্য-চর্চার সুযোগ যত দিকে দেওয়া সম্ভব দেওয়া চাই, বৈচিত্র্যের সুবিধা থাকাও আবশ্যক। বাদ্য, নৃত্য, সংগীত, বিচিত্র শিল্প-অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৭) সৌন্দর্য-রচনার প্রাথমিক চেষ্টায় শিশুকে সাহায্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; কারণ, শিশুর কল্পনা এতই প্রখর থাকে যে সে যাহা-কিছু করে তাহার মন সাধারণতঃ চমৎকৃত হয়। বয়স্কদের ঠিক-বেঠিকের বিচার শিশু করে না, বয়স্কদের নৈপুণ্যও শিশুরা মূল্যবান মনে করে না। সেইজন্য শৈশবের রচনাকার্যে বাহিরের নির্দেশ, উপদেশ, কলাকৌশল প্রভৃতি বাহুল্যমাত্র এবং কখনো কখনো ক্ষতিকর। তবে ১০।১১ বৎসর বয়স হইতে বড়োদের কিছু কিছু সাহায্য শিশুদিগকে উৎসাহ দান করিতে পারে। শিশু যে-সময় বয়স্কদের নৈপুণ্য লাভ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে সেই সময়েই বয়স্কদের দিক হইতে সাহায্য আসা উচিত। কোন্ বয়সে কোন্ দিকে কতখানি সাহায্য করিতে হইবে তাহা পূর্ব হইতে বলিয়া দেওয়া যায় না। শিশুর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে তবেই শিশুর প্রয়োজন অনুভব করা সম্ভব হয়।

(৮) শিশু যখন কিছু গড়িয়া তুলিতে চায় তখন তাহার গড়িবার উপাদানগুলি চিত্তাকর্ষক ও বিচিত্র হওয়া দরকার। শিশুর সামান্য চেষ্টাতেই যাহাতে উপাদানগুলি নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং তদুপযোগী উপাদান বাছিয়া লইতে হইবে। এই কারণে ছোট শিশুর পক্ষে বালি কাদামাটি বা ওই-জাতীয় বস্তু ভালো, কাঠের বা লোহার উপাদান ভালো নয়। সূক্ষ্ম সুতা ব্যবহার করিয়া কিছু বয়নের চেষ্টা শিশুর পক্ষে কঠিন, কিন্তু রঙিন মোটা সুতায় নানারূপ রঙিন চিত্র সহজেই ফুটিয়া উঠিতে পারে বলিয়া রঙিন মোটা সুতায় বয়ন শিশুর উপযোগী। এইগুলি উদাহরণ মাত্র, তাহার অধিক কিছু নহে। শৈশবে

খেলার ক্রমপরিণতির সহিত শিশুর সৌন্দর্য-রচনার উদ্যমের সামঞ্জস্য থাকা চাই।

(৯) সুন্দর ও মধুর কিছু দেখিলেই তাহার প্রতি শিশুর মন আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত শিশুর অন্তরের যোগ স্থাপন করা শিশুর চিত্ত-বিকাশের প্রধান ব্যবস্থা। বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা, ইহা জ্ঞানের দিক। প্রকৃতিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য অনুভব করা, ইহা আর-এক দিকের শিক্ষা; ইহাতেই প্রধানতঃ রুচির বিকাশ সাধিত হয়।

৫২। শিশুকে কোনো ছাঁচে ঢালিয়া 'মানুষ' করা যায় না, কোনো বিশেষ রুচির মধ্যে শিশুকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা উচিত নয়। সুন্দর ও মধুর পরিবেশের যোগে শিশু আপনার সামর্থ্য-অনুসারে রুচি গঠন করিবে—শিশুই নিজেকে গঠন করিবে, বাহিরের কেহ তাহাকে গঠন করিয়া দিবে না—ইহাই শিশুর হিতাকাজ্ক্ষী জনের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত।

## বাক্-শিক্ষা

৫৩। সুরুচির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় শিশুর কথা বলার অভ্যাসে। মধুর ও সার্থক ভাষা ব্যবহার করিলে ও গৃহে ও গৃহের বাহিরে যে কত আনন্দের সৃষ্টি হইতে পারে এবং কত পীড়া দূর হইতে পারে তাহা অল্প কথায় বোঝানো যায় না। শিশুর শিক্ষার ইহা একটি প্রধান অংশ। তথাপি শৈশবে বাক্‌শিক্ষার প্রতি প্রায় কিছুই মনোযোগ দেওয়া হয় না—গৃহেও না, বিদ্যালয়েও না। সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথাবার্তা শুনিয়া, শিশুর বাক্-শিক্ষা সম্পন্ন হইতে থাকে, এ-কথা নিশ্চয়। তৎসত্ত্বেও গৃহ-পরিবেশই শিশুর 'শোভন' বাক্যের অভ্যাস গঠন করিয়া দেয়, গৃহ-পরিবেশই ইহার প্রধান উৎস।

৫৪। শিশুর প্রথম ভাষা বোধ হয়—ক্রন্দন। তাহার পর মুখে শব্দযন্ত্রের দ্বারা অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন শব্দ করার সূচনা হয়, ইহা শিশুর একপ্রকার খেলা। ক্রমশ শিশু শব্দে বৈচিত্র্য আনিতে সক্ষম হয় এবং বিবিধ ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিবিধ শব্দ করিতে সমর্থ হয়। এতদিন পর্যন্ত মাতা পিতা বা অন্যান্য ব্যক্তি-পরিবেশের কিছু করিবার থাকে না। তাহার পর ভাষা শিশুর আয়ত্তে আসিতে থাকে এবং শিশুর নিকটস্থ ব্যক্তিদের দায়িত্ব স্পষ্ট হইতে থাকে।

৫৫। শিশুর পরিবেশে বস্তু ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক। বস্তু ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য হইতে শিশু অনেকগুলি বিশেষ্য (নাম) শ্রেণীর শব্দ শিক্ষা করে। বস্তু ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য যে-পরিবেশে অধিক সেই পরিবেশে শিশুর বিশেষ্য-সঞ্চয় অধিক হইবার সম্ভাবনা। শিশুকে গৃহের বাহিরে যতটা-সম্ভব বিচিত্র অভিজ্ঞতা দান করা এই কারণে অভিপ্রেত। শিশুর পরিবেশে বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলে এবং তাহার প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাহার ক্রিয়া-বাচক শব্দ সহজেই আয়ত্ত হয়। দিনের পর দিন জীবন-যাপন-প্রণালী একই প্রকার থাকিলে শিশুর বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক শব্দের ভাণ্ডার দ্রুত বাড়িতে পারে না। নিজে নিজে কিছু করিবার সুযোগ যদি শিশুর সংকীর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার শব্দ-সঞ্চয় আরও অল্প হইয়া পড়ে। পরিবেশে নানা শ্রেণীর বস্তু বা দৃশ্য থাকিলে এবং নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে বিশেষ্য ও ক্রিয়া-বাচক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গুণবাচক শব্দেরও সঞ্চয় বাড়িতে থাকে। পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরিবেশের গুণাগুণ-পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য লইয়া নানাভাবে আলোচনা করিতে পারিলে শিশুর শব্দ-ভাণ্ডার পুষ্ট হয়; ইহার সহিত শিশুকে নিজের মনে কাজ করিতে দিলে তাহার ভাষা আরও অর্থপূর্ণ হইয়া ওঠে। এইভাবেই শিশু সর্বনাম এবং অন্যান্য শ্রেণীর শব্দ আয়ত্ত করে। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে কোনো পরীক্ষা না হইলেও অনুমান করা যায় যে, বিশেষ্য ও ক্রিয়া-বাচক শব্দ এবং সাধারণ বিশেষণ ও সর্বনামের ব্যবহার-ব্যতীত ভাষার অপরদিকের উন্নতি অনেকাংশে শিশুর বুদ্ধি-শক্তির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তেমন না থাকিলে বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতির জটিল এবং সূক্ষ্ম ব্যবহার শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার কেবল বুদ্ধি-শক্তিই যে যথেষ্ট তাহা নহে; অনুভূতি কল্পনা ও ভালো-লাগার ব্যাপক মনোভাব বা মনোভূমিকা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নাম-শ্রেণীর ও ক্রিয়া-শ্রেণীর শব্দ অপেক্ষাকৃত অল্প-সামর্থ্য শিশুর পক্ষেও সম্ভব হয়। অবশ্য, এই অনুমান এখনও বহুব্যাপক পরীক্ষার দ্বারা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

৫৬। শিশুর মুখে যখন সত্যই একটু-আধটু ভাষা ফুটিতে থাকে তখন তাহা নিতান্ত টুক্‌রা-টুক্‌রা; সামান্য দুই-একটি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ দিয়াই তাহার ভাবপ্রকাশ চলিতে থাকে। অধিক কাল যাইতে না যাইতে শিশু সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, বাক্য ক্রমশ জটিল হইতে থাকে

এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত একটানা কিছুক্ষণ কথা বলিয়া যাওয়ার অভ্যাসও গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, ব্যক্তি-পরিবেশে কথাবার্তার ধরন অনুসারে শিশুর ভাষার প্রকৃতি নিরূপিত হয়। সঙ্গী-সাথীদের সহিত শিশুর কথাবার্তা চালাইবার সুযোগ একান্ত প্রয়োজন। কারণ, মাতা-পিতা বা বয়স্ক ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা বলা এবং সমবয়সীদের সহিত আলোচনা করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সমবয়সীদের মধ্যে অনেক বিষয়ের কথা চলিতে পারে যাহা মাতা-পিতাদের সহিত চলে না; সঙ্গীদের সহিত যে-ভাবে কথা বলা সম্ভব, বয়স্কদের উপস্থিতিতে তাহা সম্ভব নহে। শিশু তাহার সঙ্গী-সাথীদের সহিত ঝগড়া করিতে পারে আর গুরুজনের নিকট নীরবে ভর্ৎসনা পরিপাক করিতে হয়, বড়-জোর একটু অবাধ্য-উত্তর দেওয়া চলে, কিন্তু কোনো ক্রমেই বয়স্কদের সহিত ঝগড়া জমিতে পায় না। ঝগড়ার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া একটানা বাক্য-ব্যবহারের যেমন সুযোগ পাওয়া যায়, সচরাচর তেমন সুযোগ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। শিশু সমবয়সীদের সহিত ঝগড়া অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে পারে, নানাপ্রকার 'যুক্তি' প্রয়োগ করিতে শিখে, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্য কণ্ঠস্বরকে নানাভাবে পরিবর্তিত করিতে থাকে এবং একটানা বাক্য চালাইবার অভ্যাস লাভ করে। এই কারণে, শিশুদের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ দেখিলেই তাহা থামাইতে যাওয়া উচিত নহে। বাগ্‌যুদ্ধের বিষয় ও ভাষা অশোভন না হইলে, অন্তত কিছুক্ষণ শিশুদের ঝগড়া চলিতে দেওয়া ভালো। শিশুদের মধ্যে ঝগড়া চলিতে দেওয়া ভালো, ইহা শুনিতে অদ্ভুত হইলেও যুক্তিসংগত। তবে এই ঝগড়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিতে নাই; কারণ, অধিক গড়াইতে দিলে বাগ্‌যুদ্ধের বাক্য বা বাক্ বন্ধ হইয়া কেবলমাত্র যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং পীড়ার সৃষ্টি হয়।

৫৭। মনের ভাবকে স্পষ্টরূপে এবং সার্থকভাবে প্রকাশ করা বাক্-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। ভাব-প্রকাশের জন্য হাত-পা নাড়া, মুখের চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্তন ফুটাইয়া তোলা প্রভৃতি শিক্ষার একটি প্রধান দিক। অথচ শিশু-শিক্ষায় এগুলি প্রায়ই শিক্ষাদানের বাহিরে থাকে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে শিশু আপনা-আপনিই এইদিকে কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু বয়স্কদের অনুকরণই শিশুদের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং ব্যক্তি-পরিবেশে সূক্ষ্ম কৌশলে সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ নিতান্ত বিরল হইলে শিশু

উপযুক্ত বয়স আসিলেও সূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়। মাতা-পিতা বা নিকটস্থ ব্যক্তিদের জীবন যদি পরস্পরের মধ্যে শোভন সূক্ষ্মভাবে সমৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐরূপ ভাবকে কিছু না কিছু পরিমাণে সার্থকরূপে প্রকাশ করিবেনই। তাহাদের এই ভাব-প্রকাশ শিশুর বচনভঙ্গীকে অনেক দিকে প্রভাবান্বিত করিবে, ইহা শিশুর মস্ত লাভ। এইজন্য শিশুর বচনভঙ্গীকে প্রকাশের দিক দিয়া সুন্দর ও সার্থক করিতে গেলে মাতা-পিতা শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতির দায়িত্বই প্রধান। কোন্ বয়সে শিশু কতখান ভাব-প্রকাশ বুঝিতে পারে বা নিজে কতটা ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তাহা পরীক্ষার বিষয় হইলেও এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল যে শৈশব হইতেই সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশের মধ্যে থাকা ভালো, তাহাতে শিশুর ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজগত জীবনে কল্যাণ হয়।

৫৮। শিশুর ভাষার উন্নতি-বিধান করিতে হইলে মাতা-পিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(১) শিশুর ভাবপ্রকাশে কোনোরূপ 'গোঁজামিল' থাকিতে দেওয়া ভালো নহে; শিশু অনেক সময় তাহার ভাষার কোনো কোনো অংশ ইচ্ছা করিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, তাহার উদ্দেশ্য থাকে ঐ অস্পষ্ট অংশ যেন অপরে ভালো করিয়া বুঝিতে না পারে। কারণ, সেই অংশটুকু বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে হয়তো তাহার কোনো ভুল ধারণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এমন সন্দেহ তাহার মনে থাকে। শিশুকে তাহার ধারণা নির্ভয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। ভুল করিলে সস্নেহে ভুল সংশোধন করিয়া দিতে হয়; শিশুকে যত ইচ্ছা ভুল করিতে দিতে হয়, তথাপি অস্পষ্ট বা গোঁজামিল-দেওয়া ভাষার আশ্রয় যেন কখনও গ্রহণ করিতে না হয়। বয়স্কদের নিজেদের ভাষাও স্পষ্ট ও সবল হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা ভুলই হউক, আর নির্ভুলই হউক।

(২) অল্প বয়স হইতেই নির্ভুল বর্ণনা করিবার শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন। শিশু যাহা-কিছু দেখিতেছে, শুনিতেছে, অনুভব করিতেছে, বুঝিতেছে, করিতেছে, বা ভাবিতেছে, তাহার বিবরণ দিবার শিক্ষা আবশ্যক। নির্ভুল বিবরণ দিতে অভ্যাস করিলে শিশুর মনের ধারণা ও ভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে, বাক্য অনেকাংশে সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে থাকে, উপযুক্ত শব্দ-নির্বাচন করা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। শিশু

প্রথম-প্রথম যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহাই বর্ণনা করিবে; ক্রমশঃ স্মৃতি হইতে এবং কল্পনা হইতে বর্ণনা করিতে শিখিবে। শিশু নিজে যত খেলাধূলা করিতে পাইবে, যত বিচিত্র-ভাবে নিজে হাতে-নাতে কিছু করিতে পারিবে, ততই তাহার বর্ণনার উপলক্ষ্য অধিক হইবে এবং তাহার ধারণা স্পষ্ট হইবে। ভাব স্পষ্ট হইলে ভাষা স্পষ্ট ও নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং ভাষা যথাযথ ও সার্থক করিতে গেলে ভাবও স্পষ্ট হইতে থাকে। শৈশব হইতেই ভাবপ্রকাশে অতিরঞ্জন বা অসম্পূর্ণতা বর্জন করিতে শেখা আবশ্যক, নহিলে বয়স্ক-জীবনে উহার বহু কুফল ফলিয়া থাকে।

(৩) প্রত্যেক শব্দটি এবং শব্দের প্রত্যেক অক্ষরটি যথাযথভাবে উচ্চারণ করার অভ্যাস অনেকেরই নাই, অধিকাংশেরই নাই। যেমন উচ্চারণ বিহিত আছে তেমন উচ্চারণ করিলেও চলে। কিন্তু গভীর আলস্যবশতঃ আমরা অনেকেই সেরূপ উচ্চারণ করি না—এখন একরূপ বলিলাম, আবার অন্য সময় আর-একরূপ বলিলাম, উচ্চারণের নির্দিষ্ট ধারা থাকে না। ইহা সাধারণতঃ আলস্যেরই পরিচায়ক। বয়স্কদের এই আলস্য শিশুদের অভ্যাসে সংক্রমিত হয় এবং শিশুরাও ভুল অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে থাকে; বয়স্কেরা আলস্য-বশে শিশুর এই প্রকার ত্রুটির প্রতি উদাসীন থাকেন। ইহা অনুচিত। অনেক সময় শিশু উত্তেজনার কারণে অতি দ্রুত অনেক কিছু বলিয়া ফেলিতে চায় এবং ভাষা বিশ্রীভাবে জড়াইয়া ফেলে। শিশুকে উত্তেজনা প্রশমিত করিতে সাহায্য করাই প্রথম কর্তব্য। তাহার পর তাহাকে ধীরে-সুস্থে সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে তাহার বক্তব্য উপস্থিত করিতে দেওয়া যাইতে পারে। মোটের উপর প্রতি অক্ষর প্রতি শব্দ এবং প্রতি বাক্য দেশভাষার প্রথা-অনুসারে স্পষ্ট নির্ভুল ও সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হওয়া চাই। ভাষার ত্রুটির জন্য কেবল ভাষাই অমধুর হয়, তাহা নহে। ভাষার ত্রুটি ক্রমশঃ শিশুর চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই স্থানে উল্লেখ থাকা হয়তো আবশ্যক যে, শিশুর আধো-আধো ভাষা (যে বয়সে উহাই তাহার স্বাভাবিক) এই আলোচনার অন্তর্গত নহে।

(৪) শিশুর মুখে যখন ভাষা ফুটিতেছে, ভাষা-শিক্ষার সেই প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণ বাক্যে ভাব প্রকাশ করিবার অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। শিশুদের এই প্রচেষ্টায় বয়স্কদের সাহায্য ও ধৈর্য একান্ত আবশ্যক। শিশু যখন কোনো বক্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া ভাষা ঘুলাইয়া ফেলে এবং কোনো প্রকার অঙ্গ-

ভঙ্গীর দ্বারা ভাবটুকুর প্রকাশ একরকম সারিয়া লইতে চেষ্টা করে, তখন তাহার ভাষাকেই সাহায্য করা প্রয়োজন, তাহার অঙ্গভঙ্গীর প্রতি একেবারে উদাসীনতা দেখানো ভাল। শিশু একটানা কোনো গল্প বলিতে গিয়া বা কোনো বর্ণনা দিতে গিয়া যদি অনাবশ্যক 'তার পর' 'ইয়ে' 'না' 'গিয়ে' প্রভৃতি ব্যবহার করে, তাহা হইলে এইরূপ অনর্থক শব্দ-ব্যবহার তাহার ভাষার দৈন্যই সূচিত করে।

(৫) শিশুর পরিবেশে ব্যক্তিদের কথাবার্তায় একটু-আধটু উপমা, একটু হাসি-ঠাট্টার স্বর, নানাবিধ সরল রসপ্রকাশ প্রভৃতি গুণ থাকা অভিপ্রেত। শিশু আপনা-আপনি তাহার ভাষায় রসমাধুর্য শোষণ করিতে পারে। রসমাধুর্য ঠিক কোনো পদ্ধতি অনুসারে শিখাইবার বিষয় নহে। শিশুর পরিবেশই শিশুর রসানুভূতির ও রসোপলব্ধির প্রধান ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম রসালাপ শিশু বুঝিতে পারে না, কারণ, তাহার অভিজ্ঞতা অল্প। তাই বলিয়া তাহার রসোপলব্ধির সামর্থ্য আমরা যত তুচ্ছ মনে করি তত তুচ্ছ তাহা নহে। অতএব পরস্পরের মধ্যে বয়স্করা সূক্ষ্ম রসালোচনা করিলে, অনেক সময় শিশু আভাসে অনেকটা রসাস্বাদ লাভ করে। শিশু রসসামর্থ্য অল্প হইলেও স্থূল অশোভন রস-পরিবেশন কখনও উচিত নহে, কারণ, সরল সহজ রস-প্রকাশ এবং স্থূল অশোভন রসসৃষ্টি এক কথা নহে। শিশুর উপভোগ্য রস সরল ও সহজ হইবে, অশোভন হইবে না—ইহা মনে রাখা কর্তব্য। শিশুকে অনেকে গল্প বলেন, পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে অনেক গল্প থাকে, যেগুলির বিষয়বস্তু হইল পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ছল-চাতুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং লক্ষ্য শিশুকে হাস্যরস বা কৌতুকের আস্বাদ দেওয়া। শৈশব হইতেই চাতুরি ও প্রবঞ্চনার 'জ্ঞান' দেওয়ার কোনো কারণ থাকিতে পারে না, রসভোগের জন্যও নহে। অতএব পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যস্থতায় বা গল্পের দ্বারা রসাস্বাদ দিতে গিয়া মিথ্যা চাতুরি ও প্রবঞ্চনার জয় ঘোষণা করা নিতান্ত ভুল ব্যবস্থা। একদিকে শিশুকে নীতি-মূলক গল্প বলাও প্রায়শঃই ব্যর্থ হয়; অন্যদিকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার গল্পও বিশেষ ক্ষতিকর হইতে পারে।

আর একটা কথা, শিশুর শিক্ষার ভার তাঁহাদেরই লওয়া উচিত শিক্ষণ-কার্যে যাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান প্রবণতা ও প্রতিভা আছে, তেমনি শিশুর উপযোগী সাহিত্য আসলে সেইগুলি যাহা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক প্রতিভার সৃষ্টি। শিশু-সাহিত্য বৈ তো নয়, অতএব অল্প সম্বলে ও অল্প প্রতিভায় প্রায় অনায়াসে যে-কেহ রচনা করিতে পারে বা করিলে চলে—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। ফলতঃ দেশে-বিদেশে দেখাই যায়, শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যিক শিশুকে ভালোবাসিয়া বা সহজেই তাহার প্রকৃতি আত্মসাৎ করিয়া যখন লেখেন তখনই উৎকৃষ্ট শিশু-সাহিত্য হয়। প্রতিভা হাত-ধরা নয়; এ ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে বিশেষ যত্ন পরিশ্রম 'ধ্যান' ধারণার প্রয়োজন আছেই।

(৮) শিশুর বাক্‌শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র অল্প, অধিকাংশ শিক্ষা তাহার ব্যক্তি-পরিবেশের উপর নির্ভর করে। পদে পদে ভাষার ভুল সংশোধন করিতে গেলে শিশু নিরুৎসাহ বোধ করিতে পারে, তজ্জন্য সংশোধন অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বহু গুণে নিরাপদ। কেবল নূতন নূতন শব্দ-উচ্চারণের উপলক্ষ্য আসিলে শিশুকে সাহায্য করাই সাধারণ নিয়ম।

## পুষ্টি

৫৯। পরিবেশের প্রভাব পূর্ণভাবে কার্যকর হয় যখন শিশুর দেহ-মন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকে। ইহা কোনো নূতন তত্ত্ব নহে। আবার, দেহ-মন সবল সুস্থ রাখিবার জন্য আলো-বাতাসে অবাধ খেলাধূলা, যথোপযুক্ত খাদ্য-পানীয় এবং শিশুর সম্পর্কে সর্বদাই মাতা-পিতার সজ্ঞান যত্ন অপরিহার্য, ইহাও অতি পুরাতন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতায় ভুল নাই। কিন্তু ইহার সহিত একটি সাধারণ বিশ্বাস জড়িত রহিয়াছে দেখা যায়, সেটি ভুল। অনেকের বিশ্বাস, যত্নের অভাবে বা অর্থের অভাবে শিশুরা জল-কাদায় খেলাধুলা করে; যত্নের অভাবেই অথবা দারিদ্র্যের কারণেই শিশুদিগকে গৃহের বাহিরে শীতাতপ সহ্য করিতে হয়। যদি মাতা-পিতা দারিদ্র্যে পীড়িত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা যথেষ্ট যত্ন করিতেন এবং যত্নের আতিশয্যে শিশুর বালি-কাদা লইয়া খেলা এবং শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো বন্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহাদের মনের ভাবটি সাধারণতঃ যেন এই যে, যত্ন করা অর্থবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এবং ধুলা-বালি মাখিয়া যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন খেলার স্বাধীনতা পিতামাতার অযত্নেরই পরিচায়ক। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি ঠিক সেরূপ নহে। অনেক অভিভাবকেরই জানা নাই যে, যত্ন করিতে চাহিলেই যত্ন করা যায় না, তাহাতেও শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থের অভাবে যত্নের শিক্ষা ব্যর্থ হইতে পারে একথা যেমন সত্য, সামান্য আর্থিক অবস্থারও মধ্যেও শিশুর লালন-পালনে যথেষ্ট যত্ন করা যায় সে কথাও তেমনি খাঁটি। শিশু যখন আপন খুশিতে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শে খেলা-ধূলা করে, তখন উহাতেই শিশুর প্রতি অযত্ন সূচিত হয়

না। বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, শৈশবে নির্মল নীরোগ পরিবেশে শিশু যতই শীতাতপ উপেক্ষা করিতে থাকিবে এবং মুক্ত আলো বাতাস মাটি জল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিবে, ততই তাহার দেহ ও মন সুস্থ সবল ও সর্বংসহ হইয়া উঠিবে। যন্ত্রের চাপে শিশুকে প্রকৃতি হইতে নির্বাসন দেওয়া উচিত নহে।

৬০। খাদ্য সম্বন্ধেও মাতা-পিতার সাধারণ বিশ্বাস অনেক অংশে অতিরঞ্জিত। ভালো খাদ্যের অর্থই মহার্ঘ খাদ্য নহে। অনেক সময়েই অল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। আর বেশি টাকা-পয়সা খরচ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা লোভনীয় মনে হইলেও স্বাস্থ্যকর হয় না। মনে হয়, খাদ্যের ব্যাপারেও অর্থের অভাবের তুলনায় উপযুক্ত অভ্যাস ও জ্ঞানের অভাবই অধিক। যত্ন ও বিলাস এক কথা নহে, তেমনি পুষ্টিকর খাদ্য ও ভোজন-বিলাস এক নহে। শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা অনেকের কণ্ঠস্থ আছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তবে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি নীতি আছে, সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬১। শিশুর খাদ্য-সূচী এমনই হওয়া আবশ্যক যাহাতে অন্ততঃ চারিটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রতিক্ষণেই জীবদেহের কিছু না কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। চঞ্চল শিশুর দৈহিক ক্ষয় যে শিশু বলিয়া অল্প, তাহা নহে। তাহার দেহের ক্ষয়-পূর্তির আবশ্যকতা যথেষ্টই আছে। এই ক্ষয়-পূর্তির জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন। দেহের স্বাভাবিক তেজ ও উত্তাপ বজায় রাখিবার প্রধান উপায় খাদ্য। ইহা ছাড়া শৈশবে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন, কারণ, শৈশব দ্রুত বৃদ্ধির কাল। শিশুর দেহ (এবং মন) যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন সেই বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত শক্তি আহরণ করিতে হয়। শক্তি-আহরণের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র খাদ্য। এতদ্ব্যতীত শিশুর দেহে দৃষ্টির অন্তরালে কত প্রকারের ক্রিয়া চলিতেছে, কত দিকে কত ভাঙা-গড়া চলিতেছে। সেগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে শিশুর দেহের (অতএব মনের) বিকাশ ঠিকমত হইতে পায় না। দেহের বিভিন্ন অংশের ও ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে সামঞ্জস্য-পূর্ণ খাদ্য-ব্যবস্থা অপরিহার্য—কেবল খাদ্য চাই বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না, প্রয়োজনের অনুরূপ পরস্পর পরিপূরক নানাবিধ খাদ্য চাই ইহা বলাই উচিত। শিশুর খাদ্য-সূচী প্রতিদিন এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাহার দ্বারা তাহার প্রতি মুহূর্তের

ক্ষয়-পূরণ হয়, শক্তি ও উত্তাপ স্বাভাবিক থাকে, দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত শক্তির অভাব না ঘটে এবং দৈহিক সর্ববিধ ক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

৬২। শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়া বয়স্কদের খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়া কম কথা নহে। অভ্যাসের দিক দিয়া ইহা এক আমূল পরিবর্তন। মনে হয়, শিশুর মনের দিকেও ইহা বৃহৎ ব্যাপার। শৈশবের খাদ্য-অভ্যাসের এই পরিবর্তনে মায়ের সহযোগিতা কাম্য। মা শিশুর এই আহার-শিক্ষাটি সহজ করিয়া দিতে পারেন। শিশু যখন মাতৃস্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া বয়স্কদের ভোজ্য বস্তু তুলিয়া মুখে পুরিতে যায়, তখন তাহার মনে ক্ষুধা-নিবৃত্তির কোনো ঝোঁক থাকে না; তখন থাকে কৌতূহল, অনুকরণ ও খেলা। খাওয়াটা তাহার নিকট কোনো ব্যাপারই নহে, খেলার রসই তখন প্রধান। তাহার পর যদি ভোজ্য বস্তুর স্বাদ একটু ভালো লাগে, তাহা হইলে সুস্বাদের আকর্ষণও দেখা দেয়। মা শিশুকে আহারের নূতন অভ্যাস দিতে গিয়া এই কথাগুলি যেন ভুলিয়া না যান; তাঁহার সকল চেষ্টায় খেলার ও অনুকরণের বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া ওঠা আবশ্যক। জোর করিয়া খাওয়াইতে গেলে শিশুর মনের খাওয়া-খাওয়া খেলা অন্তর্হিত হয় এবং শিশু খাদ্য-বিমুখ হইয়া মাতৃস্তনকে আরো বিশেষ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। শিশুর খাদ্য-ব্যবহার যাহাতে বেশ সুখজনক হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিশুকে নানাভাবে উৎসাহ দিতে হয়, কখনও জোর করিতে নাই। শিশু যখন ক্ষুধার্ত তখনই একটু একটু করিয়া খাদ্য দিতে হয়। শিশুরা ক্ষুধা না থাকিলে আহারের সময় হইয়াছে বলিয়া খাওয়াইতে গেলে ফল হয় না। যখন-তখন ভোজ্য বস্তু দিয়া শিশুর আহারের অভ্যাস গঠন করিতে যাওয়া, তাহাও ঠিক নহে। অনেকে শিশুর কান্না থামাইবার জন্য শিশুকে খাদ্য দিয়া সন্তুষ্ট করেন, এ ব্যবস্থা আদৌ মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না। আহারের সময় হয় নাই দেখিয়া ক্ষুধার্ত শিশুকে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করাও অনুচিত, ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশি হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় মাতা-পিতা শিশুর আহারের নিয়মের প্রতি অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করেন, শিশু অতিরিক্ত ক্ষুধা বোধ করিলেও তাঁহারা নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহেন না। তাঁহাদের এই নীতি স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। শিশুর আহারের নিয়ম থাকা আবশ্যক; প্রতি দিনের কখন কি কতখানি খাওয়াইতে হইবে, তাহার খাদ্য-সূচী প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য-সূচীর কখনও পরিবর্তন হইবে না, এমন কথা কিছু

নাই। শিশুর ক্ষুধা অনুসারে আহারের সময় পরিবর্তিত হওয়া ভালো। অতিরিক্ত ক্ষুধার পূর্বেই শিশুকে খাওয়ানো দরকার। অনেক শিশু অনেক সময় ক্ষুধা পাইলেও খাইতে চাহে না, খেলিতে চাহে। তাহাদের ক্ষুধার পীড়াও থাকে এবং তজ্জন্য মেজাজও খারাপ হয়, অথচ খেলার উত্তেজনা অত্যন্ত বেশি থাকায় খাদ্যের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। এ-সকল ক্ষেত্রে খাওয়াইবার জন্য জোর করিলে হিতে বিপরীত হয়। আদর করিব, লাল জামা দিব, ইহা করিব, উহা দিব প্রভৃতি প্রলোভন দেখাইয়া খাওয়ানোর অভ্যাসও আদর্শ নহে। বরং শিশুর আহারের সময় আসন্ন অনুভব করিয়া একটু আগে হইতেই তাহার খেলার সহচর-সাথীদের সরাইয়া দিয়া খেলার উত্তেজনা প্রশমিত করা শ্রেয়ঃ। তাহার পর সস্নেহ বচনে তাহার ক্ষুধার প্রতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে এবং আহারে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ ও সূচী নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ, সকল শিশুর আহারের রুচি ও পরিমাণ এক নহে। শিশুর আহার লইয়া মাতা-পিতারা যেন হৈচৈ না করেন বা তাহার সম্মুখে আহার লইয়া ঘন ঘন দুশ্চিন্তা প্রকাশ না করেন। শিশু যত শীঘ্র নিজে আহার করিতে শেখে ততই ভালো; এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত, বাধা দেওয়া ভুল। শিশুর বয়স যখন চার-পাঁচ মাস, তখন হইতেই একটু একটু আহারের অভ্যাস ধরানো চলিতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সামান্য বয়স হইতে কঠিন দ্রব্য (তাই বলিয়া অতি-কঠিন নহে) মুখে লইতে শিখিলে শিশুর মুখযন্ত্রের নৈপুণ্য বাড়ে এবং শিশু অল্প বয়স হইতেই আহারের কাজটুকু নিজে করিতে থাকিলে তাহার স্বাস্থ্য ভালো হয় ও আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে। শিশুর পরিবেশ শান্ত সংযত হইলে এবং পরিবেশের লোকেরা আহার সম্বন্ধে সুরুচি ও সুনিয়ম রক্ষা করিলে শিশু সহজেই আহার গ্রহণ করিবে এবং খাদ্য হইতে সমুচিত পরিমাণে শক্তি শোষণ করিতে পারিবে।

৬৩। শিশু কখনও কখনও অ-ক্ষুধার লক্ষণ প্রকাশ করে। এমন হয় যে, অতি দরিদ্রের ঘরে অতি উদাসীন পিতা-মাতাও শিশু কিছুই খাইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হন। শিশুর এইপ্রকার ক্ষুধা-হীনতা তাহার অস্বাভাবিক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। ইহার সাধারণ কারণ দৈহিক পীড়া, মাতা-পিতার কর্তব্য শিশু-চিকিৎসকের বা সাধারণ চিকিৎসকের শরণ

লওয়া। দেহের পীড়া ব্যতীত শিশুর মনেও অনেক পীড়া সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব শিশু কখনও কখনও আভাসে টের পায়, আবার অধিকাংশ সময় তাহার মনের গোপন পীড়ার কথা সে নিজে কিছুই জানিতে পারে না। মানসিক পীড়ার কারণেও ক্ষুধা নিস্তেজ হইয়া আসিতে পারে। ঈর্ষা, নিরাপত্তা-বোধের অভাব, ক্রোধ, ভয়, বেদনা, মাতা-পিতার মধ্যে বা নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কলহ-চীৎকার প্রভৃতি ঘটিলে শিশু ক্ষুধা হারাইয়া ফেলে। বিশেষ করিয়া শিশুর আহারের সময় পীড়াদায়ক জোর-জুলুম ভীতি-প্রদর্শন বিদ্রূপ ইত্যাদি সর্বপ্রকারে বর্জনীয়; নহিলে ক্ষুধার বোধ থাকিবে না। শিশুর রুচি-অনুসারে খাদ্য পরিবেশন করা উচিত। কৌশলে শিশুকে সুখাদ্যের রুচি দান করা দুঃসাধ্য নহে এবং একটু-আধটু এটা-ওটা খাইলে শিশুর ক্ষতিও হয় না। অতএব শিশুর রুচি-অনুযায়ী খাদ্য দিলে দোষ নাই; না দিলেই বরং শিশুর অ-ক্ষুধা দেখা দিতে পারে।

৬৪। অ-ক্ষুধা যেমন অস্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ, অতি-ক্ষুধাও তেমনি দেহের ও মনের অ-স্বাস্থ্যের পরিচয়। খাদ্য দেখিলেই খাইবার জন্য কাতর বা উগ্র হইয়া ওঠা এবং আহার করিতে বসিয়া অশোভনভাবে অতি-দ্রুত আকণ্ঠ ভোজন করা, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরও এরূপ অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একপ্রকার অস্বাভাবিক অতি-ক্ষুধা। কোনো কোনো শিশুরও অনেকটা এই ধরনের অতি-ক্ষুধা। শৈশবে এই শ্রেণীর অতি-ক্ষুধার কারণ সাধারণতঃ ঈর্ষা, মায়ের স্নেহ-বঞ্চনা, বিপন্ন অনিশ্চিত ভাব ও অন্যান্য অন্তঃপীড়া। ইহার সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক পীড়া সৃষ্ট হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ক্ষুধার জন্য শিশুকে ভর্ৎসনা না করিয়া বা তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য হইতে বঞ্চিত না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

৬৫। অল্প পরিমাণ আহার করিতেছে দেখিলেই শিশুর অ-ক্ষুধা আরম্ভ হইয়াছে বা অধিক আহার দেখিয়াই অতি-ক্ষুধার ব্যাধি হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না। কারণ, অনেক শিশু অল্প আহারের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ স্বাভাবিকভাবেই অধিক আহার করে। কেন অধিক আহার স্বাভাবিক বা কেন অল্প আহারই শিশুর পক্ষে স্বভাবগত ঠিক বলা যায় না—হয়তো ইহা জন্মগত বৈশিষ্ট্য। অ-ক্ষুধা বা অতিক্ষুধার পীড়া দিনকতক লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়—কি পীড়া ঘটিয়াছে ও কেন, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে, অবশ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন।

তবে সাধারণ দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে শিশুর অ-ক্ষুধা বা অতি-ক্ষুধা ঘটিয়াছে কিনা।

## ক্ষীণ দেহ : মেদবৃদ্ধি

৬৬। দেহের ক্ষীণতার সহিত খাদ্যের সম্পর্ক আছে, এ কথা সুবিদিত। অ-ক্ষুধা আরম্ভ হইলে শিশু যে কেবল অত্যন্ত অল্প আহার করে তাহা নহে; সে যতটুকু খায়, তাহার পুষ্টিও ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। এক দিকে অত্যল্প আহার এবং তদপেক্ষা অল্প পুষ্টি, অপর দিকে শৈশবের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অধিক শক্তির ব্যবহার—শিশুর দেহ বেশ শোভন ও পুষ্ট হইবে কী করিয়া। শিশুর দেহের সাধারণ ক্ষয়-পূর্তির জন্য যতটুকু আহার ও পুষ্টির প্রয়োজন, অ-ক্ষুধার কারণে শিশু সেটুকুও পায় না। ইহার উপর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত পুষ্টি আবশ্যক, তাহার সঞ্চয় নাই। বাধ্য হইয়া শিশু কোন এক দিকে ক্ষীণ হইয়া অপর দিকে বৃদ্ধি লাভ করে। শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকায় আরো শক্তির আবশ্যক, অন্তরের দ্বন্দ্বের জন্যই বেশ কিছু শক্তি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দ্রুত বৃদ্ধি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে যে অতিরিক্ত শক্তি ও পুষ্টির প্রয়োজন, তাহা অ-ক্ষুধাগ্রস্ত শিশু খাদ্য হইতে শোষণ করিতে পারে না। বাধ্য হইয়া শিশু ক্ষীণ-দেহ হইয়া পড়িতে থাকে। কোনো কোনো শিশু ক্ষীণতার বৈশিষ্ট্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে বলিয়া মনে হয়; তাহাকে বহু যত্নে ও যথেষ্ট পুষ্টির মধ্যে বড় হইবার সুযোগ দিলেও তাহার ক্ষীণতা দূর করা যায় না। চিকিৎসাতেও কোনো ব্যাধি বুঝিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্যই ক্ষীণতার জন্য দায়ী বলিয়া ধরা হয়।

৬৭। ক্ষীণতার বিপরীত মেদবহুলতা, ইহাও শিশুর পক্ষে (এবং বয়স্কদের পক্ষেও) অস্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক। জন্ম হইতেই মেদবহুলতার বিশেষত্ব হয়তো কোনো কোনো শিশুর থাকে, ইহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। সাধারণতঃ মেদবহুল শিশুর গোপন মনঃপীড়া থাকে, এই মনঃপীড়ার কারণেই ক্রমশঃ অতিরিক্ত মেদ শিশুর দেহে সঞ্চিত হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতির সহিত মিলিয়া-মিশিয়া মনোমত জীবন যাপন করিতে না পারিলে, অর্থাৎ গৃহের নিকটতম ব্যক্তি-পরিবেশে শিশু ঠিকমত উপযোজন করিতে অসমর্থ হইলে, কোনো কোনো শিশু আত্মকেন্দ্রিক

হইয়া পড়ে এবং মনের গোপনে পীড়া বোধ করিতে থাকে। আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ায় শিশু অপরের সহিত উপযোজন-সাধনে আরো ব্যর্থ হয়, তাহার মনঃপীড়া আরো বর্ধিত হয়। ক্রমশঃ সে সঙ্গী-সাথীদের সহিত খেলাধূলা মেলা-মেশা বন্ধ করিয়া আনে, নিজেকে যথাসাধ্য একাকী আত্মমনা করিয়া রাখে। অথচ নিঃসঙ্গতাও পীড়া দিতে থাকে। খেলাধূলা ছুটাছুটি প্রভৃতি শিশুসুলভ চঞ্চলতা বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া খাদ্য হইতে আহৃত পুষ্টি ব্যয়িত হয় না এবং উহাই মেদরূপে শিশু-দেহে সঞ্চিত হইতে পারে। ফলে শিশু অনাবশ্যক মোটা হইয়া পড়ে। শিশু যত মোটা হয় তাহার নিষ্ক্রিয়তা ততই বাড়ে এবং নিষ্ক্রিয়তা যতই বাড়ে তাহার অ-ব্যয়িত পুষ্টি মেদরূপে ততই জমা হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, সকল শিশুরই এই প্রকার পরিণতি ঘটে না; তবে কোনো কোনো শিশু এইভাবে মেদ-বহুল হইয়া পড়ে। শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুসারে তাহার পরিণতি ঘটে, ইহা স্মরণ রাখা দরকার।

৬৮। মেদবহুলতা কমাইবার জন্য অনেকে শিশুর আহার কমাইয়া দেন। শিশুর অনিচ্ছা সত্বে আহারের পরিমাণ কম করিলে শিশুর মানসিক পীড়া বৃদ্ধি পাইতে পারে, অপরের তুলনায় অন্তরে নিজেকে আরো বঞ্চিত মনে হইতে পারে এবং ফলে তাহার ঈর্ষা ও নিরাপত্তা-ভাবের অভাব তীব্রতর হওয়া সম্ভব। অতএব, এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতানুসারে চলাই উচিত।

## আলোচনা-সূত্র

১। 'বিশেষিত পরিবেশ' বলিতে কি বুঝায়? বিশেষিত পরিবেশের প্রয়োজন আছে কি?

২। সাধারণ গৃহে পরিবেশ বিশেষিত করা সম্ভব কি? সম্ভব হইলে কতখানি সম্ভব?

৩। বয়স্কদের ঈর্ষা ও শিশুদের ঈর্ষার প্রকৃতি কি মূলতঃ এক? কী ভাবে মত সমর্থন করা যায়।

৪। শিশুদের 'কাম-ঈর্ষা' বলিলে ঠিক বলা হইল কি?

৫। বয়স্কদের জীবনে ঈর্ষার একটি বড় কারণ 'অর্থ'। শিশুদের জীবনে অর্থ-জনিত ঈর্ষা কী ভাবে সম্ভব?

৬। শিশুদের মধ্যে উপহারের বস্তু লইয়া ঈর্ষা দেখা দেয়। ইহার কারণ কি?

৭। খেলনা, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি উপহারের আদর আর্থিক মূল্যের উপর নির্ভর করে না—ইহা শিশু-জীবনের সাধারণ সত্য, বয়স্ক-জীবনেও সত্য হওয়া উচিত কী?

৮। উপহার-সামগ্রী হইতে শিশুরা একাধিক উপায়ে তৃপ্তি ও সুখ লাভ করিতে পারে। কারণ কী?

৯। স্নেহ-দানের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের মনে অসাম্য থাকিলে শিশুদের মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্ট হইবে। ইহার তাৎপর্য কী?

১০। দৈনন্দিন জীবনে স্নেহের প্রকাশে কী ভাবে অসাম্য প্রকাশ পায়?

১১। ঈর্ষা-পীড়িত শিশুর আচরণে যে-সকল অসামাজিক ত্রুটি ঘটিতে পারে তাহার বিবরণ।

১২। নিম্নলিখিত অবস্থায় পিতা-মাতা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, কিরূপ আচরণ করিবেন?

(ক) অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মুখে গৃহের শিশু অতিরিক্ত অশোভন লাফালাফি চীৎকার বা অন্য শিশুদের সহিত কলহ করিতেছে।

(খ) অতিথিদের আগমনে বিরক্ত শিশু দূরে চলিয়া গিয়া একাকী থাকিতেছে।

(গ) পিতার সহিত মাতার বিশ্রম্ভালাপে বাধা দিবার জন্য শিশু অবিরত অকারণে ডাকাডাকি করিতেছে।

(ঘ) শিশু সুযোগ পাইলেই অপর কোনো শিশুর খেলনা, পোশাক, পুস্তক ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করে।

(ঙ) শৈশবে অকারণ স্বার্থপরতার অভ্যাস দেখা যায়।

১৩। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আচরণ যথোপযুক্ত হইয়াছে, না, হয় নাই?

(ক) অতিথিদের সহিত আগত কোনো শিশুর উপর গৃহের শিশুটি অকস্মাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মারধোর আরম্ভ করিল। মা উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনিও অকস্মাৎ তাঁহার শিশুকে ধরিয়া প্রহার করিলেন এবং শিশুকে এই উপায়ে 'সংযত' করিলেন।

(খ) মা ও তাঁহার শিশু-সন্তান উপস্থিত। অতিথিদের আগমন হইল,

তাঁহাদের সঙ্গেও শিশু রহিয়াছে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর নবাগত শিশুটির গুণে মুগ্ধ হইয়া মা আপন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'শেখো, দেখে শেখো। ঐটুকু ছেলে কেমন ইংরিজি বলতে পারে, কেমন সভ্য! আর তুমি!—যেমন রূপ তেমনি গুণ। কোথায় পরের পুতুল ভেঙে দিয়ে আসবে, পরের খাতায় কালি উল্টে ফেলে দিয়ে আসবে, এই সব! আমার পোড়া কপাল।' ইত্যাদি।

(গ) পিতা তাঁর ৬।৭ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে একটি নূতন 'স্যুটকেস' দিয়া বলিলেন, 'খোকা, তোমার ক্লাসের নরেশের বাক্স দেখে কান্নাকাটি করছিলে। তার বাক্সটা টিনের, দাম তো দেড় টাকা। তোমারটা ছ'টাকা। আর কান্নাকাটি কোরো না; যাও পড়তে বোসো।' মা তখন খুশি হইয়া কহিলেন, 'যা না খোকা, তোর বাক্সটা নরেশের মাকে দেখিয়ে আন্-গে না।'

১৪। শিশু বীরও নহে, ভীরুও নহে। ইহার অর্থ কী?

১৫। শিশু কী কী কারণে ভয় পায় তাহার সর্বদেশ-প্রযোজ্য তালিকা প্রণয়ন করা কতদূর সম্ভব?

১৬। ভয়কে জয় করিবার জন্য শিশুকে কী ভাবে সাহায্য করা যাইতে পারে?

১৭। ঢাক-ঢোল-জগঝম্পের বিকট শব্দে শিশু ভয় পায়; শিশুর ভয় ভাঙাইবার জন্য জোর করিয়া শিশুকে ঐ সকল স্থানে পরিচারিকার সহিত প্রেরণ করা কতখানি লাভজনক বা ক্ষতিকর?

১৮। শিশুকে বীভৎস বা ভীতিপ্রদ গল্প শোনানো ঠিক নহে। কেন?

১৯। মায়ের কোলে শুইয়া একটু-আধটু ভয়ের গল্প শুনিতে পাইলে শিশুর ভালোই হয়।

২০। শিশু অনেক সময় 'অকারণে' ভয় পায়। ইহার গূঢ় কোনো কারণ থাকিতে পারে কি?

২১। শিশুকে ক্রমশঃ ভয়মুক্ত করিতে হইলে এবং যাহাতে সে ভয়মুক্ত থাকে তাহারও জন্য মাতা-পিতা সাধারণভাবে কতদূর কী করিতে পারেন?

২২। লক্ষ্য করিলে অনেক সময়ই শিশুর ক্রোধের কারণ ধরিতে পারা যায়; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্রোধের মূল কোথায় জানা অত্যন্ত কঠিন। কেন?

২৩। শাস্তির দ্বারা শিশুর ক্রোধ 'শান্ত' করা যায় কি এবং উচিত হয় কি?

২৪। শিশুর ক্রোধের উন্মেষ ও বৈচিত্র্য লইয়া প্রবন্ধ রচনা।

২৫। শিশু সাধারণতঃ কী কী কারণে ক্রুদ্ধ হয়? বয়সের সহিত ক্রোধের কারণের স্বাভাবিকতা অনুমেয়।

২৬। শিশুকে ক্রোধের পীড়া হইতে ও ক্রোধের অভ্যাস হইতে মুক্তি দিতে হইলে কতখানি কী করা সম্ভব? আবশ্যক-মতো বয়সের উল্লেখ।

২৭। আমরা মিথ্যার শিক্ষা না দিলে শিশু মিথ্যাচরণ করে না। কতখানি কী?

২৮। মাতা-পিতা বা সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে আভাসে-ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলা শিশুর মিথ্যাচরণের কারণ হইতে পারে।

২৯। শিশুর মিথ্যাচরণের ক্ষেত্র চতুর্দিকে। ইহার সত্যাসত্য বিচার করা যায় কী ভাবে?

৩০। শিশুর মিথ্যাচরণের মূল কারণগুলি কী?

৩১। শিশুর সব 'মিথ্যা-ভাষণ' বা 'মিথ্যাচরণ' মিথ্যা নহে। ইহা আলোচ্য।

৩২। অতৃপ্ত মাতা-পিতার সংসারে শিশুর মিথ্যা-আচরণ স্বাভাবিক। কেন?

৩৩। দিবাস্বপ্ন ও স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩৪। শিশুর দিবাস্বপ্নের প্রকারভেদ লইয়া আলোচনা করা যায়। নিজে কিছু লক্ষ্য করিয়া থাকিলে তাহা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভাবিয়া দেখা।

৩৫। দিবাস্বপ্নের মূল কারণ কি?

৩৬। দিবাস্বপ্নের কোনো মূল্য আছে?

৩৭। কোনো কিছুরই অতিরিক্ত ভালো নহে, দিবাস্বপ্নের বেলাতেও ইহা সত্য।

৩৮। উপযুক্ত চিত্ত-প্রস্তুতিই হয় নাই, এরূপ মাতা বা পিতার সন্তান ক্রমশঃ তোৎলা হইতে পারে।

৩৯। তোৎলা শিশু সম্বন্ধে মাতা-পিতার কর্তব্য কী?

৪০। কী কী অবস্থায় শিশুর তোৎলামি বাড়িতে পারে?

৪১। শিশু সন্তানের বামপটুতা দেখিয়া অস্থির না হইয়া বরং অন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

৪২। গূঢ় কারণে কোনো কোনো শিশু অনভিপ্রেত অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে।

এই-সকল ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কর্তব্য কী?

৪৩। শিশুর সদভ্যাস-গঠনে সাহায্য করিতে হইলে, পরিবেশের কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক?

৪৪। অভ্যাস-গঠনের মূলনীতিগুলি কী?

৪৫। 'নিশ্চেষ্ট' পরিবেশ অপেক্ষা 'সচেষ্ট' পরিবেশ শিশুকে অধিক উৎসাহ দান করে। অর্থ কী?

৪৬। শিশুর অভ্যাস-গঠন ও অনুকরণ, এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা।

৪৭। উৎসাহ দিবার জন্য শিশুকে জিনিস-পত্র দেওয়া ঠিক কি? ভালই বা কী, মন্দই বা কী?

৪৮। শাস্তিদান অবাঞ্ছিত অভ্যাস-বর্জনে কতখানি সার্থক হয় বলিয়া অনুমান?

৪৯। শাস্তি নহে, প্রায়শ্চিত্ত—ইহার তাৎপর্য কী এবং কোন্ বয়সে কিরূপ পরিবেশে ইহা সম্ভব?

৫০। শাস্তি নহে, অন্য দিকে মনোযোগ-আকর্ষণ—কোন্‌টি ভাল? কেন?

৫১। কোনো সময়ে শাস্তিদান নিতান্তই আবশ্যক হয় কি? আবশ্যক কখন হয়?

৫২। শাস্তিদানের নীতি কী?

৫৩। অবাঞ্ছিত অভ্যাস-গঠন যাহাতে না হয় তাহার জন্য মাতা-পিতা কতখানি করিতে পারেন?

এ বিষয়ে প্রতিবেশীদের দায়িত্ব কম নহে। কেন?

৫৪। শিশুর রুচি যাহাতে সুন্দর ও মধুর হয়, তাহার জন্য গৃহে কতদূর কী করা যাইতে পারে?

এ সম্বন্ধে প্রতিবেশী ও বৃহত্তর সমাজের ভূমিকা কী?

৫৫। গৃহে সুন্দর জিনিসপত্র জড়ো করিলে বা গৃহের বাহিরে সুন্দর জিনিস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলে শিশুর সুরুচি-গঠন আশানুরূপ হইবে, তাহা নহে। আরো কিছু আবশ্যক। এই 'আরো কিছু' কী?

৫৬। রুচি বলিতে কী বুঝানো উচিত, রুচির উদ্‌গতি বলিলেই বা কী বুঝায়?

৫৭। রুচি-গঠনে শিশুকে সাহায্য করিবার প্রধান নীতিগুলি কী? চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ভ্রমণ, এগুলির মূল্য কতখানি?

৫৮। জীবনে বাক্-শিক্ষার প্রায়োজন আছে। কেন?

৫৯। বাক্-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কাল কোন্‌টি?

৬০। বৃহত্তর সমাজ, প্রতিবেশী, গৃহ, বিদ্যালয়—এইগুলির কোন্‌টি শিশুর বাক্-শিক্ষার পক্ষে কতখানি সহায়ক?

৬১। আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা বাক্-শিক্ষার বিশেষ সাহায্য সম্ভব হয় কেন?

৬২। শিশুর কথাবার্তায় সবলতা ও মাধুর্য দান করিতে গেলে প্রধানতঃ কী কী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য?

৬৩। শিশুর শিক্ষায় রস-আলাপ, উপমা প্রভৃতির স্থান কী?

৬৪। খাদ্য সম্বন্ধে অভিভাবকের অজ্ঞতা ও কু-অভ্যাস অনেক সময়েই শিশুকে পুষ্টি হইতে বঞ্চিত করে। কেন?

মহার্ঘ খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য কি এক?

৬৫। অতি-ভোজন বা অত্যল্প ভোজন কি সকল সময়েই খারাপ? কখন উহা শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়?

৬৬। অতি-ভোজন বা অত্যল্প ভোজনের গূঢ় কারণ আছে কি? থাকিলে সেগুলি কী? এ-সকল ক্ষেত্রে মাতা-পিতা কতদূর কী করিতে পারেন?

৬৭। শিশুকে খাদ্য-দানের মূল লক্ষ্য ও উপায়গুলি কী?

৬৮। ক্ষীণ-দেহ যেমন ভাল নয়, মেদ-বৃদ্ধিও তেমনি ভাল নয়। ইহা ঠিক কি?

৬৯। অতিরিক্ত মেদ-বৃদ্ধির কারণগুলি কী কী? শিশুর অতিরিক্ত মেদ-বৃদ্ধি হইলে মাতা-পিতার কর্তব্য কী? কোন্ কোন্ দিকে সাবধানতা আবশ্যক?

৭০। বিশেষিত পরিবেশের সমস্ত আলোচনার মধ্যে দু'-একটি বিষয় অতিশয় মৌলিক। নিজের ধারণা অনুযায়ী ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে।

# শিক্ষক-শিক্ষিকা

## উপযুক্ততা

১। সন্তানকে 'মানুষ' করিয়া তুলিতে হইলে গৃহে মাতা-পিতার আন্তরিক চেষ্টা ও সাধনা একান্ত আবশ্যক। গৃহের বাহিরে শিশুকে সার্থক করিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাধনা সমভাবে প্রয়োজনীয়। অনেকে আছেন জাত-শিক্ষক ('শিক্ষক' বলিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকা দু'ই বুঝাইতেছে)। তাঁহারা জন্মাবধি শিক্ষাদানের উপযুক্ত গুণের সম্ভাবনা লইয়া আসেন। যাঁহারা জাত-শিক্ষক তাঁহারা শিক্ষাদানের যে-কোনো পদ্ধতি অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট শিশু-শিক্ষার মূলবিষয়গুলি যেন পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প এবং ইঁহাদের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। ইঁহারা বিরল গুণের অধিকারী হইলেও শিক্ষাব্রতের জন্য সাধনা করেন, শিক্ষাব্রতের উদ্দেশে সাধনা করাটাও তাঁহাদের বহু গুণের অন্যতম। ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুশীলন না করিলে জাত-শিক্ষকরাও তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান দিতে সমর্থ হন না। সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রচেষ্টা যে কতখানি আবশ্যক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

২। শিক্ষক-শিক্ষিকার গুণের তালিকা-প্রণয়ন দুঃসাধ্য কার্য এবং সম্পূর্ণ তালিকা রচনার কোনো প্রয়োজনও নাই। মূল কয়েকটি বিষয় আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকার অভ্যাসে ও অন্তরে সেগুলি বর্তমান থাকিলে অন্যান্য গুণ অনেকটাই সহজ হইয়া আসে। সেই মৌলিক গুণগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকিতে পারে—

(১) শিশুকে 'মানুষ' করিয়া তুলিতে আনন্দ আছে কিনা এবং শিক্ষা-ব্রতের প্রতি আকর্ষণ আছে কিনা, ইহাই সর্ব প্রথম প্রশ্ন। অন্য কোনো ক্ষেত্রে স্থান করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া শিক্ষকতা করিতে আসিলে, শিক্ষাদানকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা বড়ো-একটা সম্ভব হয় না এবং শিশুকে মানুষ করিয়া গড়িবার সামর্থ্যও থাকে না। কারণ, ইহাতে আনন্দ পাওয়া যায় না। হৃদয়ে আনন্দের প্রেরণা থাকা শিশু-শিক্ষকের প্রধান গুণ।

(২) শিশুর প্রতি স্নেহ শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বিতীয় গুণ অথবা প্রথম গুণ ঠিক করিয়া বলা যায় না। শিশুর শিক্ষণে কর্তব্যবুদ্ধি বেশি দূর সাফল্য লাভ

করিতে পারে না। শিশুর আত্ম-বিকাশে হৃদয়ের ক্রিয়াই প্রধান, হৃদয়কে স্পর্শ করিতে গেলে হৃদয়ের প্রভাবই প্রধানতঃ আবশ্যক। সেই কারণে শিশুর দেহচিত্ত-গঠনে শিক্ষক ও শিক্ষিকার হৃদয় স্নেহে পূর্ণ থাকা চাই। শিশু মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, দাদু-দিদিমার মধ্যে হাসি-কান্নার নিবিড় পরিবেশ হইতে আসিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুষ্ক পদ্ধতি ও কর্তব্যবুদ্ধির ব্যূহের ভিতর হাঁপাইয়া উঠে। স্নেহ-হীন পদ্ধতি ও কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা শিশুর বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বাহিরের অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু অন্তরকে গঠিত করিতে হইলে অন্তরের স্নেহতাপ আবশ্যক। কোনো একটি-দুইটি শিশুর প্রতি স্নেহ থাকিলে যথেষ্ট হয় না, কোনো বিশেষ শ্রেণীর শিশুর প্রতি স্নেহ পোষণ করিলেও শিক্ষক-গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। সকল শিশুর প্রতি স্নেহ-সাম্যের সাধনা প্রয়োজন; এই সাম্য সাধনা ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব। কেবল শিশুদের জন্যই যে স্নেহ ও স্নেহ-সাম্য প্রয়োজন, তাহা নহে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের জন্যও ইহা অপরিহার্য। প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে থাকিলে দেহে ও মনে ক্লান্তি আসে। শিশু-শিক্ষায় তাহার ব্যতিক্রম থাকিবার অন্য কারণ নাই। বিশুদ্ধ কর্তব্য-বুদ্ধি, নীতি-বিচার, পদ্ধতি-জ্ঞান প্রতিদিনের ক্লান্তি দূর করিতে পারে না। স্নেহ হইতে আনন্দ, আনন্দ হইতে শিক্ষাদান—ইহা যদি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবনে সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রমকে ততটা শ্রম বলিয়া বোধ হইবে না এবং ক্লান্তি আসিয়া তাঁহাদের কর্তব্য-বুদ্ধি ও শিক্ষণ-পদ্ধতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না। স্নেহের আনন্দ না থাকিলে কোনো পদ্ধতি বা কোনো শ্রম-স্বীকার শুষ্কতা হইতে বা কৃত্রিমতা হইতে রক্ষা পায় না। শিশুর প্রতি অপক্ষপাত স্নেহ স্বাভাবিক হইলে শিশুর মঙ্গল হয়, শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্লান্তি যথেষ্ট অল্প হইয়া আসে এবং তাঁহাদের জ্ঞানের প্রয়োগ সহজ ও সার্থক হয়। এই কারণে স্নেহের সাধনা করিতে হয়। কেবল জ্ঞানের সাধনায় শিশুকে 'মানুষ' করা যায় না।

(৩) কেবলমাত্র জ্ঞানের সাধনায় শিশুর আত্মবিকাশ অল্পই হয়, এ কথা সত্য হইলেও জ্ঞানের চেষ্টা শিক্ষকরা বর্জন করিতে পারেন না। শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষককে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয়। যে শিক্ষক নিজে জ্ঞানের শক্তি বর্ধিত করিতে চেষ্টা না করেন, নিজে আরো ভালো হইতে না চাহেন, তিনি শিশুর ভার গ্রহণ করিবার অধিকারী নহেন।

(৪) শিক্ষকদের মন কোনো বিশেষ তত্ত্বে বা পদ্ধতিতে আবদ্ধ থাকিলে চলে না। প্রতিদিনই জগতের বিভিন্ন অংশে তত্ত্বের ও পদ্ধতির পরিবর্তন-সম্ভাবনা ঘটিতেছে, শিক্ষক মুক্ত মনে নব নব জ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন, ইহাই কাম্য। অভ্যাসকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার ও শিশুর মূলতত্ত্বগুলি জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলেও বৈজ্ঞানিক বিচার আবশ্যক।

(৫) শিশু-পালনের ন্যায় কঠিন কার্যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের মূল্য অত্যধিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় ও উপযুক্ত নৈপুণ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

(৬) প্রভাবশীল ব্যক্তিত্বের উপর সকল নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার সার্থকতা নির্ভর করে। শিশুর বাহ্ অভ্যাস সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ; অন্তরের বিকাশে সাহায্য করিতে গেলে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রধান বিষয় ব্যক্তিত্বই। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার্থ-নিরূপণ দুঃসাধ্য; তবে সমগ্র ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্রকে, বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিত্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হয়তো এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্যক্তিত্বের কল্যাণকর প্রভাব ব্যক্তির জীবন-সাধনার গভীরতার উপর বহু অংশে নির্ভর করে।

## আলোচনা-সূত্র

১। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় গুণের তালিকা প্রণয়ন করা দুঃসাধ্য কেন?

২। শিক্ষকের কোন্ গুণটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে হয়? যুক্তি কী?

৩। শিক্ষকের সাধনা প্রয়োজনীয় কেন?

# শিশুর খেলা

## খেলা ঃ কাজ ঃ ক্লান্তি ঃ খেলা-তত্ত্ব

১। শিশুর জীবনের প্রথম দিকে 'কাজ' বলিয়া কিছু থাকে না। কাজের ধারণা পরিবেশের যোগে সৃষ্ট হয়, বয়স্কদের সংস্পর্শে ও শিক্ষার ফলে শিশুর জীবনে কাজ ও কাজের ধারণা আসিয়া পড়ে। জন্ম হইতেই শিশু খেলার প্রবণতা প্রদর্শন করে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। খেলার প্রবণতা ও ঝোঁক শিশুর জন্ম-মাত্রই দেখা যায় কিনা স্থির করিয়া বলা চলে না ; তবে শিশু আপন মনে যখনই কিছু করিতে আরম্ভ করে ( হাত-পা ছোঁড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার সক্রিয়তা ), তখনই তাহার খেলার সুখ-বোধ হইতে থাকে। শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ত যাহা-কিছু আচরণ দেখা যায় তাহাই তাহার খেলা। শিশুর জীবনকে কাজে ও খেলায় ভাগ করা ঠিক যায় না। কারণ, অতি শৈশবে সকল কাজই খেলার রসে সুখদায়ক এবং সকল খেলাই শিশুর নিকট কাজ। শিশু তাহার জীবনের যে অংশে স্বাধীনভাবে চলিতে পায় এবং যে অংশটুকু নিজের বলিয়া মনে করে, সেইটুকুই তাহার খেলা। যতটুকু তাহার স্বায়ত্ত নহে, যাহার উপর মাতা-পিতা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ, অথবা যে-সকল বিষয়ের ভার মাতা-পিতার উপর ন্যস্ত, সেইটুকুকে এবং সেই বিষয়গুলিকে শিশু ক্রমশঃ কাজ বলিয়া ধারণা করে। বয়স্ক জীবনের অনুকরণ করিয়া শিশু তাহার অনেক খেলাকে কাজ বলিয়া মনে করে, বয়স্করা অবশ্য শিশুর এই সকল কাজকে খেলা বলিয়াই ধরেন। অর্থাৎ কাজ ও খেলার পার্থক্য শিশু-জীবনে প্রথম প্রথম কিছুই থাকে না। কাজ এবং খেলার মধ্যে যে কিছু একটা প্রভেদ আছে, শিশু ক্রমশঃ তাহা বোধ করিতে থাকে। তথাপি কোন্‌টি কাজ এবং কোন্‌টি খেলা এ ধারণা তাহার অস্পষ্ট রহিয়া যায়। এমন-কি বয়স্ক জীবনেও কাজ ও খেলার সম্পূর্ণ সংজ্ঞার্থ দেওয়া সম্ভব হয় না—নানাভাবে কাজ ও খেলার পার্থক্যটি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে, এখনও নির্দিষ্ট একটি কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় নাই। কাজ ও খেলার ভেদ-সীমা কিছুই নির্দিষ্ট নাই, বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের বিষয় ঠিক বলা যায় না। তথাপি এইটুকু হয়তো বলা চলে যে, জীবনের যেটুকু একান্ত নিজের মনে করিয়া, নিজের খুশি-অনুসারে স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায়, সেইটুকু খেলা। শিশুর ক্ষুধা পাইলে

তাহার কিছু করিবার নাই ; তাহার মা আসিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন, এ দায়িত্ব তাঁহারই। শিশুর কি! অতএব শিশু খাওয়াটাকে আদৌ খেলা বলিয়া গ্রহণ করে না, খাইতে চাহে না, খাওয়া ফেলিয়া অন্যত্র খেলিতে যায়। যদি নেহাত খাইতেই হয়, তবে উহা তাহার কাজ, খেলা নহে। অবশ্য, মা যদি শিশুর খাওয়াটাকে 'পাখির' খাওয়া বলিয়া শিশুর মনে একবার ধরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে কল্পনায় নিজে পাখি হইয়া গিয়া শিশু খাইতে থাকে; তখন তাহার খাওয়াটা আর কাজ থাকে না, তাহাও খেলা হইয়া পড়ে। শিশু-শিক্ষার ইহাই সমস্যা; শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে কেমন করিয়া শিশুর মনে খেলার রূপে ধরাইয়া দেওয়া যায়, ইহাই সমস্যা। যাহা শিক্ষার বিষয় তাহাতে শিশু খুশি বোধ করিবে, তাহা স্বাধীন চিত্তে গ্রহণ করিবে এবং নিজেরই জিনিস বলিয়া লইবে,—ইহাই তো সকল পদ্ধতির আন্তরিক লক্ষ্য।

২। কাজে ক্লান্তি আসে, খেলায় ক্লান্তি সহজে আসে না। কাজে বোধ হয় একটু গোপন দ্বন্দ্ব থাকে। কাজ করা আবশ্যক। যাহা আবশ্যক-বোধে করণীয় তাহাকে খেলা বলা যায় না, কাজ বলিতে হয়। আবার, যাহা আবশ্যক তাহা যেন নিজের কিছু নহে, যেন অপরের কর্তব্য, এইরূপ একটি ভাব গোপনে থাকে। এক দিকে আবশ্যক-বোধ, আর তাহারই বিপরীত দিকে অপরের চাপানো বলিয়া ধারণা ও বিরক্তি—এই দ্বিমুখ দ্বন্দ্ব হয়তো কাজের মধ্যে থাকিয়াই যায়। যাহা আবশ্যক তাহা করিতেই হয়; অথচ যাহা আবশ্যক তাহা করিতে স্বাভাবিক অনিচ্ছা থাকে। বোধ হয় কাজের মধ্যে এই 'করিতেই হয়' এবং 'করিতে চাই না' এই দ্বন্দ্বের জন্যই অনেকটুকু শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনো কাজের জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন হওয়া উচিত, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক শক্তি নিযুক্ত হয়। অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হওয়ার কারণ বোধ হয় কাজের অন্তর্নিহিত ঐ দ্বন্দ্বের বোধ। খেলায় দ্বন্দ্ব নাই, সেইজন্য অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিতেই অনেক খেলা সম্ভব হয়। কাজ যে খেলা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্লান্তিকর, তাহার কারণ হয়তো ইহাই। শিশুর জীবনে 'আবশ্যকবোধ' বয়স্ক জীবনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। তজ্জন্য শিশুর কাজে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রও অল্প, শিশুর কাজ খেলার রসে সহজ। দ্বন্দ্ব অত্যল্প হওয়ায় শিশু তাহার অল্প শক্তি লইয়াই অনেক কিছু করিতে পারে; অথচ বয়স্ক ব্যক্তির দেহ-শক্তি যে অনুপাতে অধিক, কাজ সেই অনুপাতে সহজসাধ্য হয় না।

৩। অনেকেই শিশুর অতটুকু দেহে বয়স্কের অধিক প্রাণ-শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন এবং শিশুর খেলিবার আশ্চর্য শক্তি কোথা হইতে আসে তাহার উৎস অনুসন্ধান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শিশু খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু হইতে যতখানি শক্তি শোষণ করে তাহার সবটুকু দেহের ক্ষয়পূর্তি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় না। ফলে অনেকটুকু শক্তি শিশুর নিকট অতিরিক্ত হইয়া থাকে, সে এই অতিরিক্ত শক্তি নানাপ্রকার খেলায় ব্যয় করে। এই কারণেই নাকি শিশুর খেলায় অফুরন্ত শক্তির পরিচয় থাকে। কিন্তু শিশু-কর্তৃক অতিরিক্ত শক্তি-সঞ্চয়ের এই অনুমানটি ঠিক না হইতে পারে। শিশুর জীবন খেলারই জীবন। তাহার কাজের জীবন কতটুকু? কাজের ভার তো থাকে শিশুর মাতা-পিতার উপর। খেলায় ব্যবহৃত শক্তিকে অতিরিক্ত শক্তি বলিয়া বিবেচনা করিলে শিশুর জীবনের বৃহৎ অংশটিই তো অতিরিক্তের হিসাবে পড়িয়া যায়। শিশু ক্ষয়-পূর্তি বা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু হইতে যে শক্তি শোষণ করে, তাহারই জন্য খেলা আবশ্যক। খেলা না থাকিলে শিশুর পক্ষে শক্তি শোষণ করা সম্ভব হইত না; শক্তিশোষণের সামর্থ্য অনেক পরিমাণে শিশুর খেলার উপর নির্ভর করে। শিশুর খেলা সম্পূর্ণ বাদ দিলে স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। মনে রাখিতে হইবে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাহা করে, তাহাই তাহার খেলা। খেলার এই ব্যাপক অর্থটিই যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে শিশুর অতিরিক্ত শক্তি-সঞ্চয়ন বলিয়া কিছু থাকে না। তবে কাজের দিকে শিশুর শক্তির অভাব প্রায়ই দেখা যায়। খেলার জন্য, বা কাজকে খেলার রসে সিক্ত করিলে তাহাতেও, শক্তির অভাব যেন কিছুই থাকে না। এই পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে কাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং খেলায় শক্তির মুক্তি, শক্তির স্বতঃস্ফূর্তি।

## প্রস্তুতি-তত্ত্ব

৪। মানুষের বিশ্বাস, জীব-জগতে প্রকৃতির যত-কিছু ব্যবস্থা আছে তাহার প্রত্যেকটির কোনো-না-কোনো প্রয়োজন আছে। প্রকৃতি কোনো-কিছু আয়োজন অকারণে করিয়াছে, ইহা মানব-মন মানিতেই চাহে না। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন খেলা করে? তাহার খেলায় তো বাহ্যতঃ কোনো 'কাজ' সম্পন্ন হয় না। কাজ না হইলেও শিশু অকারণ খেলিতে থাকিবে,

প্রকৃতি শিশু-জীবনের জন্য অকারণ স্বতঃস্ফূর্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে, ইহা মানুষের 'পরিণত' বুদ্ধি কেমন করিয়া সহ্য করিবে! অতএব শিশু খেলা করে কেন তাহার অনুসন্ধান চলিল এবং অনুমান করা হইল যে, খেলার মধ্যে শিশু তাহার জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লয়। শিশুর জীবনে খেলাকে প্রধান এবং স্বাভাবিক করিয়া দিয়া প্রকৃতি শিশুকে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে। খেলার গূঢ় উদ্দেশ্য ইহাই। শিশু যে এই গূঢ় উদ্দেশ্য-সম্পর্কে কিছু অবগত আছে, তাহা নহে। সে স্বভাব-বশে প্রকৃতির অলক্ষ্য প্রভাবে খেলিয়া যাইতে থাকে; তাহার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি তাহাকে জীবনের মূল-প্রয়োজনে শিক্ষিত করিয়া তোলে। এই অনুমানটি সত্য হউক আর নাই হউক, অন্ততঃ মানুষের মন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঁচিয়াছে, তাহা না হইলে প্রকৃতির কাছে তাহাকে হার মানিতে হইত।

৫। খেলার অন্তর্নিহিত প্রস্তুতি-তত্ত্বটি গ্রহণ করায় একাধিক আলোচনার দিক খুলিয়া গিয়াছে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানব-শিশুর দীর্ঘতর শৈশবের ব্যাখ্যাও এই সকল আলোচনার অন্তর্গত। মানুষের জীবন জটিল এবং বিচিত্র; মানুষের শৈশব-জীবনও দীর্ঘ। মানুষের সমাজে সাবালক হইতে কুড়ি-একুশ বৎসর লাগে; একটি মৃগ-শাবক মাত্র কয়েক বৎসরেই রীতিমত মৃগ হইয়া দাঁড়ায়। মৃগ অপেক্ষা (এবং অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা) মানুষের জীবন অনেক জটিল, অনেক বিচিত্র। এইজন্য প্রস্তুত হইতেও মানব-শিশুর অধিক সময় আবশ্যক। ফলে মানবের শৈশব দীর্ঘতর হইয়াছে। ইহার সহিত মানব-শিশুর খেলার বৈচিত্র্যও অনেক। বহু-প্রকার খেলা আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং এখনও বহুপ্রকার খেলার সম্ভাবনা আছে। দীর্ঘ শৈশব এবং বিচিত্র খেলা, এই দুইটি মিলিয়া মানব-শিশুকে তাহার ভাবী জটিল ও বহুমুখী জীবনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

৬। এই প্রসঙ্গে, খেলার মধ্যস্থতায় শিশু যে-সকল দিকে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহারও অনুমানসিদ্ধ একটি তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অবশ্য সম্ভব নহে; তথাপি প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া চলে।—

(১) খেলার মধ্যে শিশুর দেহের বিভিন্ন মাংসপেশী নানাভাবে সঞ্চালিত হইবার সুযোগ পায়। পুনঃ পুনঃ পেশী-সঞ্চালনে পেশীসমূহ পুষ্ট ও সবল হয়। পেশীসমূহের কর্মশক্তি-বৃদ্ধিই একমাত্র লাভ নহে; বিভিন্ন পেশীর

মধ্যে একযোগে কাজ করিবার অভ্যাসও গঠিত হয়। একাধিক পেশীর (বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) একযোগে কাজ করার অভ্যাসকে 'স্বাঙ্গীকরণ' বলা যাইতে পারে। খেলার মধ্যস্থতায় পেশীর সবলতা যেমন লাভ হয়, তেমনি বিভিন্ন পেশী বিভিন্নভাবে অন্বিত ও অঙ্গীভূত হওয়ায় শিশু বহুপ্রকার কাজ করিবার শিক্ষাও সহজেই লাভ করে।

(২) মানব-শিশুর খেলা একটি-আধটি নহে, তাহার খেলা বহুবিধ। বহুবিধ খেলায় বহুপ্রকার বস্তু নাড়াচাড়া করায় আকার, আয়তন, রঙ, কাঠিন্য, কোমলতা, শুষ্কতা, আর্দ্রতা, গন্ধ, স্বাদ, ভার, ভারসাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও অভিজ্ঞতা জন্মে। ইহার সহিত ছড়ানো, ছোঁড়া, উঠানো, নামানো, পাড়া, ফেলা, ভাঙা, জোড়া দেওয়া, স্তূপ করা, গর্ত করা, উঠা, নামা, বসা, দৌড়ানো, লাফানো ইত্যাদি শতাধিক ক্রিয়া-সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটে। এই উপায়ে খেলার মধ্যস্থতায় শিশু কাহারও সাহায্য না লইয়াই প্রাকৃতিক জগতের কার্য-করণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। খেলার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে শিশুর পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের অধিকাংশই দুর্বোধ্য হইয়া থাকিত।

(৩) বিচিত্র খেলায় ইন্দ্রিয়-শক্তির চর্চা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্রমেই প্রখর হইতে থাকে। সকলেরই জানা আছে যে, অভ্যাসের দ্বারা চোখের, কানের, নাকের জিহ্বার ও স্পর্শের অনুভূতি সূক্ষ্ম হয়। এতটুকু পার্থক্য ঘটিলেই ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে, যদি ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন থাকে। অবশ্য ব্যক্তিগত সামর্থ্যের একটা সীমা অতিক্রম করিয়া কেহই তাহার ইন্দ্রিয়-শক্তিকে আরও প্রখর বা সূক্ষ্ম করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু যতখানি সূক্ষ্মতা সম্ভব ততখানি লাভ করিতে হইলে শৈশব হইতে ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন আবশ্যক। শিশু ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা বা সূক্ষ্মতা লাভের জন্য মোটেই অস্থির নহে, সে খেলিবার জন্যই অস্থির। তাহার খেলার মধ্যেই ইন্দ্রিয়-শক্তির সূক্ষ্মতা লাভ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বাঙ্গী-করণের সুযোগ মিলে খেলায়। খেলায় ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা ও স্বাঙ্গীকরণ উভয়ই হয়। মাংসপেশীর বেলায় অনুশীলনের দ্বারা সূক্ষ্মতা লাভ হয় বলা চলে না; বলা চলে যে, চর্চার দ্বারা পেশীগুলির স্বাঙ্গীকরণের শক্তি শিশুর পক্ষে উত্তরোত্তর অভ্রান্ত, দ্রুত ও প্রখর হইয়া উঠে।

(৪) খেলার মধ্যে শিশুর অভিজ্ঞতা যত বিচিত্র হইবে তাহার কল্পনা-

শক্তিও তত প্রসারিত হইবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তি না থাকিলে কল্পনার সৌধ গঠিত হয় না। বাস্তবই কল্পনার মাল-মশলা। এই কারণে শিশুর খেলায় বৈচিত্র্যের সুযোগ থাকা চাই।

(৫) বুদ্ধির তীক্ষ্মতা অনুশীলনের দ্বারা বর্ধিত হয় কিনা সন্দেহ। বুদ্ধি-শক্তি তাহার আপন সীমা পর্যন্ত বয়সের সহিত বর্ধিত হয় এবং নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিয়া আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, অনুশীলনের দ্বারা ইহার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা যায় না—ইহাই বর্তমান বিশ্বাসের গতি। অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধির নির্বিশেষ বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও বুদ্ধি-শক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি ব্যবহার করিতে না পাইলে অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে, বুদ্ধি-প্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও বুদ্ধি-শক্তি সক্রিয় হয় না। বুদ্ধির ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইলে, ব্যবহারিক জীবনে বুদ্ধির প্রয়োগ সহজ করিতে গেলে, অভিজ্ঞতার আবশ্যক। অভিজ্ঞতার সুযোগ না দিয়া কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর ভরসা করা ভুল। অভিজ্ঞতাহীন শিশু যথেষ্ট বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও কার্যক্ষেত্রে নির্বোধের ন্যায় আচরণ করে। এইজন্য যথাসাধ্য বুদ্ধি-প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া চাই। শিশুর খেলাই শিশুর বুদ্ধি-বিকাশের শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

(৬) উপযুক্ত খেলার পরিবেশে শিশুর চারিত্রিক লাভ কম হয় না। খেলার মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কাজের মধ্যে তাহা শিশু অনুভব করে না। কিন্তু যে দিকে আকর্ষণ নাই, অথবা যে দিকে আকর্ষণ অল্প, শিশুকে সে দিকেও যাইতে হয়। বাস্তব জীবনের ইহা দাবি, শিশুকে ক্রমশঃ সেই দাবি স্বীকার করিতে হয়। এই অভ্যাসের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহা খেলার মধ্যে বহু পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে। খেলার দ্বারাই কাজের প্রধান গুণগুলি শিশু আয়ত্ত করে। একটি উদ্দেশ্য লইয়া অনেক ক্ষণ নিযুক্ত থাকা, অনেক ক্ষণ একটি বিষয়ে মনকে আটকাইয়া রাখা, কোনো একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া তাহার উপযুক্ত পরিকল্পনা ভাবিয়া বাহির করা, কোনো ফল পাইবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল ধরিয়া তদভিমুখে পরিশ্রম করিয়া যাওয়া, ইত্যাদি কাজেরই গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। অপর দিকে, শিশু খেলার উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে এই গুণগুলি আপনা-আপনিই লাভ করে—অল্প-বয়সী শিশুর খেলায় এগুলি অব্যক্ত ও অস্পষ্ট থাকে বটে, একটু বয়স হইলেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। উপযুক্ত

খেলার স্বযোগ পাইলে শিশুর খেলা কাজের প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, তখন শিশুকে কোনো কাজের আহ্বান জানাইলে শিশু সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ঠিকমত খেলায় পরিচালিত হইলে শিশু নিজের চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সাহস, মনঃসংযোগ, লক্ষ্য-অভিমুখে চলা, আত্ম-নির্ভরতা, যুক্তি-ব্যবহার, গঠন-ধর্মী অভ্যাস প্রভৃতি গুণ অল্পাধিক লাভ করে।

(৭) সামাজিক জীবনের প্রস্তুতিতে খেলার দান অনেকখানি। উপযুক্ত খেলার ব্যবস্থায় একা-একা খেলিবার অয়োজন যেমন থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া খেলিবার স্বযোগও তেমনি থাকে। শিশুদের ইচ্ছানুসারে খেলা সম্ভব হয় বলিয়া দলগত-ভাবে কিছু করার অভ্যাস গঠিত হইতে পায়। শিশু দলের মধ্যে খেলিয়া বুঝিয়া লয় যে, কেবল ক্রন্দনে কোন লাভ হয় না, আব্দার করাও স্ববিধাজনক নহে, এবং ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকিলেও ফল স্বখদায়ক হয় না। পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ প্রথম প্রথম যথেষ্টই হয়; কিন্তু অধিক কাল যাইতে না যাইতে শিশুদের মধ্যে একপ্রকার বোঝাবুঝি হইয়া যায় এবং তাহার পর মাঝে মাঝে 'খণ্ডযুদ্ধ' হইলেও খেলুড়েদের মধ্যে একটি সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। একটু-আধটু আত্ম-সংযম, হিংসা-ভাবের তীব্রতা-হ্রাস, ঈর্ষার উপশম ইত্যাদি সমাজ-জীবনের অভিপ্রেত গুণাবলী শিশু ক্রমশঃ লাভ করে। খেলা ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে শিশুকে এত সহজে এতখানি অগ্রসর করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

(৮) বয়স্কদের তুলনায় শিশুর মনে দ্বন্দ্বের পীড়া সাধারণতঃ অল্প, অন্ততঃ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। এই জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়া কোনো উপায়ে মোচন করার সমস্যাটি বয়স্ক-জীবন অপেক্ষা অনেকখানি লঘু। শিশু-মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলেও অন্তরের পীড়া-মোচনের সমস্যাটি উপেক্ষা করা চলে না। প্রায় সকল শিশুরই অল্পাধিক অন্তঃপীড়া আছে, দুই-এক জন শিশুর গূঢ় পীড়া অত্যন্ত তীব্র থাকে। মনের কোনো কোনো পীড়া শিশু অনুভব করিতে পারে, তবে অধিকাংশ পীড়া শিশু জানিতেই পারে না। এইসকল পীড়া, গূঢ়ই হউক আর অল্পাধিক অনুভূতই হউক, বিরোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুর পীড়া-বিরোচনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক উপায় খেলা। অন্তঃপীড়ায় অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার প্রধান কৌশল শিশুকে উপযুক্ত খেলায় নিয়োগ করা। শিশুর খেলায় তাহার অন্তঃপীড়া অনেক

পরিমাণে প্রকাশ পায়, বিচক্ষণ চক্ষু তাহা বুঝিতে পারে। সংক্ষেপে বলা চলে, শিশুর খেলা শিশুর মনের পীড়া-মোচনের প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, ইহাও হয়তো প্রকৃতির অলক্ষ্য প্রভাবের পরিচয়।

(৯) খেলার দ্বারা শিশুর একাধিক সহজ-প্রবৃত্তির ব্যবহার সম্ভব হয়, অতৃপ্ত সহজ-প্রবৃত্তি অল্পাধিক তৃপ্তি লাভ করে—ইহা অনেকের মত। গঠন-প্রবৃত্তি, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি, যোধন-প্রবণতা, কৌতূহল, প্রভৃতি, এমন-কি কাম-প্রবৃত্তি পর্যন্ত, খেলার মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে। খেলার দ্বারা সহজ-প্রবৃত্তির তৃপ্তি না হইলে অসামাজিক পথে তাহাদের প্রকাশ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। খেলায় সহজ-প্রবৃত্তির নির্দোষ ব্যবহার হয় বলিয়া শিশুকে খেলিবার বহুপ্রকার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস, খেলার মধ্যস্থতায় শিশুর সহজ-প্রবৃত্তিসমূহের উন্নতি ঘটে। দুষ্ট অসামাজিক শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খেলার পরিবেশ অত্যাবশ্যক বলিয়া অনেকের ধারণা।

৭। শিশুর জীবনকে পূর্ণ সামাজিক জীবনে এবং তাহার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত করিবার জন্য খেলার মূল্য অত্যধিক। মানুষের মন শিশুর খেলার এতগুলি দিক্ বিশ্লেষণ করিয়া এবং নানাপ্রকার অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তবে কিছুটা শান্ত হইয়াছে। খেলার উপকার আছে বলিয়াই প্রকৃতির নিয়মে শৈশবে খেলা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, নহিলে শিশুর জীবনে খেলা থাকিত না, ইহাই যেন 'সুবিবেচক' মানব-মনের সিদ্ধান্ত।

## খেলার স্তর-বিকাশ

৮। শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ লক্ষ্য করিলে খেলার একাধিক স্তর আছে বলিয়া মনে হয়। এক-এক বয়সে এক-এক স্তরের খেলা যেন স্বাভাবিক। অল্প বয়সের শিশু যে খেলা অতি সহজে স্বাভাবিকভাবে খেলিতে চাহে, একটু বড় বয়সে তাহা আর ভালো লাগে না, বড় বয়সের কোনো শিশুই সাধারণতঃ সে খেলা অধিক কাল প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক বয়সের শিশু অল্প বয়সের খেলা পরিত্যাগ করিতে পারে না, অন্ততঃ অতি বিলম্ব করে। এই-সকল শিশু মনের স্বাভাবিক অবস্থায় নাই সিদ্ধান্ত করা যায়। 'হামাগুড়ি' দিয়া যাওয়া শিশুর নিকট খেলা; এই খেলার একটি সাধারণ বয়স আছে। সে বয়স পার হইলে শিশু আর কিছুতেই হামাগুড়ি দিতে চাহিবে না। হামাগুড়ি-খেলাটি বেশ সহজে

খেলিতে শিখিলেই শিশু ইহা হইতে আর খেলার আনন্দ লাভ করে না। হামাগুড়ি দেওয়া পূর্ণভাবে আয়ত্ত হইয়া আসিলেই শিশু অপর কোনো খেলায় যাইতে চাহে, হয়তো সে তাহার মাকে ধরিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, মাকে ধরিতে যাওয়াটাই তাহার খেলার প্রধান রস হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মাকে ধরিতে গেলেও তাহাকে হামাগুড়ি দিতে হয়; সে হয়তো এখনো চলিতে শিখে নাই। এই খেলায় হামাগুড়ি দেওয়াটা প্রধান নহে, প্রধান লক্ষ্য মাকে ধরিতে যাওয়া। মাকে ধরিবার একটি উপায় হামাগুড়ি টানা। হামাগুড়ি-খেলা অতিক্রম করায় শিশু ইহাকে খেলা হিসাবে আর তেমন আমল দেয় না, উন্নত খেলার কৌশল-স্বরূপ ইহা ব্যবহার করিতে পারে। যদি কোনো শিশু হামাগুড়ির সাধারণ বয়স পার হইলেও হামাগুড়িকেই তাহার খেলা হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, তাহার দেহে বা মনে কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা রহিয়াছে, চিকিৎসার প্রয়োজন। হামাগুড়ি দেওয়া একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। শৈশবের বহু প্রকার খেলার ভিতরে এই ব্যাপারটুকু আছে—বিশেষ বয়সের বিশেষ খেলা আছে এবং একটি খেলার সুখ পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদ করার পর উহাকে শিশু আর খেলা হিসাবে বিশেষ আমল দিতে চাহে না। শিশু যখন দৌড়াইতে শিখিতেছে, তখন তাহার অধিকাংশ খেলায় দৌড়ানোটাই প্রধান থাকে। অনেক সময় শিশু নিতান্ত অকারণেই দৌড়াইতে থাকে। কিন্তু দৌড়ানোর খেলাটি চিরকাল চলে না, ইহার প্রাধান্য থাকে না, ক্রমশঃ শিশু অন্যান্য খেলায় আকৃষ্ট হয় এবং দৌড়ানোর নৈপুণ্যকে জটিলতর খেলার অঙ্গ বা কৌশলরূপে ব্যবহার করে। শিশুর খেলার এই দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, শৈশবের খেলায় কতকগুলি স্তর আছে এবং ক্রম-বিকাশ আছে। বয়স্কদের খেলায় বৈচিত্র্য আছে, ক্রম-বিকাশ নাই। শৈশবের খেলায় ক্রম-বিকাশ আছে, বৈচিত্র্যও আছে।

৯। খেলার ক্রম-বিকাশ ও বৈচিত্র্য এক কথা নহে। শিশুর ক্রম-বিকাশের যে-কোনো স্তরে বহু প্রকার খেলা থাকিতে পারে। শিশু যখন খেলার ছলে হাত-পা ছোঁড়া আরম্ভ করে, তখন নানাভাবে হাত-পা ছোঁড়া সম্ভব হইতে পারে। যে-কোনো স্তরে খেলার একাধিক রূপ থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশু খেলার যত রূপ আবিষ্কার করিতে পারে করিবে—বয়স্ক ব্যক্তিরা তাহার আবিষ্কারে সাহায্য করিতে পারিলে ভালো হয়। মা কোনো তত্ত্বের সংবাদ

না রাখিয়াই কেবলমাত্র স্নেহের প্রেরণায় শিশুকে বিচিত্র খেলার সুখ দান করেন। শিশু অনুকরণ-প্রভাবেও ক্রমশঃ অনেক প্রকার খেলার পরিচয় লাভ করে। খেলার স্তর-বিভাগ মাত্র কয়েকটি, কিন্তু খেলার প্রকার-ভেদ বহু।

১০। ক্রম-বিকাশের আসল বিষয় হইতেছে সামর্থ্য-বিকাশ। শিশুর বয়স-অনুসারে তাহার সামর্থ্য বিকশিত হয়। পরিবেশের যোগে এই সামর্থ্য-বিকাশ সহজ হয় অথবা বাধা পায়। খেলাও শিশুর পরিবেশ, সেইজন্য সামর্থ্যের প্রকাশ পায় তাহার খেলার যোগে। যে খেলা শিশুর সামর্থ্যের অতিরিক্ত তাহা শিশুর পক্ষে সুখকর নহে, হয়তো সম্ভবই নহে। সামর্থ্য-বিকাশ বয়স-অনুসারে ঘটে; যে বয়সে যে সামর্থ্য বা সামর্থ্যের যে স্তর বিকশিত হওয়া স্বাভাবিক, চেষ্টার দ্বারা তাহার পরিবর্তন সাধারণতঃ সম্ভব নহে। বয়সের দিক্ বিবেচনা না করিয়া সামর্থ্য-বিকাশের জন্য শিশুর উপর চাপ দেওয়া যাইতে পারে, নানা প্রকার কৌশল অবলম্বনও করা যায়, তাহাতে একটু-আধটু ফলও যে না পাওয়া যাইবে এমন কোনো কথা নাই। তথাপি শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না, বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই কারণেই বয়সের সামর্থ্য অনুসারে যে-সকল খেলা স্বাভাবিক (অর্থাৎ যে-সকল খেলা সহজ, সম্ভব এবং আপনা-আপনিই শিশু যে-সকল খেলা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে), সেইসকল খেলার আয়োজন করাই ঠিক।

১১। মোটের উপর দাঁড়ায় এই যে, শৈশবের খেলায় একাধিক স্তর আছে বা ক্রম-বিকাশ আছে। শিশুর বয়স ও সামর্থ্য অনুসারে এই স্তর-বিভাগ ঘটে। পূর্ব হইতেই শিশুকে জটিলতর খেলায় অভ্যস্ত করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এবং কোনো ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নহে। খেলার পর্যায়গুলি উল্টা-পাল্টা করিতে যাওয়া ভুল। খেলার যে-কোনো পর্যায়ে পূর্বপর্যায়ের খেলা থাকিতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ের খেলাও আসিতে পারে, কিন্তু পর্যায়োচিত শ্রেণীর খেলাই প্রধান হইয়া থাকে। বয়স্ক জীবনের খেলায় এই শ্রেণী-বিভাগ নাই, শৈশবের শেষের দিকেও পর্যায়-ভাগ অনাবশ্যক। যে-কোনো পর্যায়ে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে এবং থাকা উচিত।

### খেলার পর্যায়

১২। শৈশবের খেলাকে মোটামুটি আটটি পর্যায়ে ভাগ করিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হইবে। কোনো পর্যায়েরই সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে, প্রতি পর্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেওয়াই যথেষ্ট।

(১) শিশুর খেলায় প্রথম প্রথম অঙ্গ-সঞ্চালনই প্রধান হইয়া থাকে, খেলার বস্তু তাহার ধারণার বাহিরে থাকে। অথচ কোনো বস্তুর অবলম্বন না পাইলে দেহ-সঞ্চালনের খেলা সম্ভব হয় না। সেই জন্য বস্তুরও প্রয়োজন। শিশু অন্য বস্তু নাগালে না পাইলে তাহার নিজের হাত পা ও আঙ্গুল, মাথার চুল প্রভৃতি বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে। অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রথম রূপ মুঠা করিয়া ধরা। শিশুর নিকট মুঠা করিয়া ধরাটাই খেলা; সে কি ধরিতেছে, তাহা তাহার মনোযোগের ও ধারণার বাহিরে। সে প্রথম অবস্থায় নিজের দেহ এবং দেহের বাহিরের অন্যান্য বস্তু সম্পর্কে পার্থক্য বোধ করে না। বস্তু তাহার মুঠির অবলম্বন মাত্র, বস্তু তাহাকে খেলার কোনো আনন্দ দেয় না। মুঠি করিয়া ধরা, মুঠি খুলিয়া ফেলা, হাত-পা ছোঁড়া, পাশ ফেরা, উপুড় হওয়া, উঠিয়া বসা, হামাগুড়ি দেওয়া প্রভৃতি দেহের খেলাই শিশুর প্রথম পর্যায়ের খেলা। দেহ-সঞ্চালনই খেলার লক্ষ্য, কোনো বস্তু বা ব্যক্তি নহে।

(২) দেহের খেলার সহিত বস্তুর যোগ ঘটিলে শিশুর অগ্রগতি অনেকটা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বস্তু এখন শিশুর পক্ষে আনন্দ-দায়ক, বস্তুর প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয়, সে এখন বস্তুকে তাহার খেলার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। দেহ-সঞ্চালনের খেলা ক্রমশঃই জটিল হইতে থাকে এবং তৎসহ বস্তুকে লইয়া খেলাও বিচিত্র হইয়া উঠে। এখন বস্তু দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া শিশুর স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বস্তু লইয়া খেলাই প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। অপর দিকে শিশু দেহ-সঞ্চালনেও অগ্রসর হয়, সে ক্রমশঃ কথা-বার্তা বলিতে, দাঁড়াইতে, হাঁটিতে, দৌড়াইতে, লাফাইতে নৈপুণ্য অর্জন করে। ইহার সহিত আরোহণ-অবরোহণ, ঠেলা-ঠেলি, টানা-টানি প্রভৃতির খেলা যুক্ত হয়। শৈশবে খেলার দ্বিতীয় পর্যায়ে হাঁটিতে পারা একটি বিশেষ উন্নতি। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের স্বাধীনতা খেলার আনন্দের শ্রেষ্ঠ সহায় এবং যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে দাঁড়ানো-হাঁটা-দৌড়ানোর উপর নির্ভর করে। তাহার উপর দুইটি হাতের ব্যবহার স্বাধীনভাবে হইতে থাকে—যাতায়াতের জন্য হাত-দুইটি আটকাইয়া থাকে না। একই কালে হাতের ও পায়ের স্বাধীনভাবে সঞ্চালন সম্ভব হওয়ায় শিশু বহু জটিল খেলা আয়ত্ত করিতে পারে। সেই জন্য দেহ-সঞ্চালনের দিক দিয়া হাঁটার পূর্ব পর্যন্ত একটি স্তরের সীমা ধরা অযৌক্তিক নহে। খেলার দ্বিতীয় প্রধান উন্নতি খেলায় বস্তু বা ব্যক্তির

প্রাধান্য। 'খেলনা'র মূল্য শিশু যখন বুঝিতে পারে, তখন হইতেই তাহার খেলায় বৈচিত্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখনও শিশু বস্তুকে লইয়া আপনার খুশি-মতো ব্যবহার করিতে পারে না, খেলার অনেকটাই বস্তুর বশে চলে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভালো। শিশুর খেলায় হাঁটিতে শেখা এবং বস্তু বা ব্যক্তি লইয়া খেলা করা যে ঠিক একই কালে ঘটিবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। কোনোটি আগে এবং কোনোটি পরে দেখা দিতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে খেলার ক্রম-বিকাশে দুইটিই দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য।

(৩) শিশুর খেলায় ব্যক্তির অনুকরণ, একটু পরিকল্পনার পরিচয় এবং কল্পনার প্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিলে তৃতীয় স্তরের সূচনা হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। ডাক্তার হইয়া খেলা করা, পুতুলের সংসার পাতিয়া ব্যক্তি-পরিবেশের দীর্ঘ-জটিল আচরণ অনুকরণ করা, খেলার ছলে চাপা ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করা, এ-গুলি তৃতীয় পর্যায়ের পরিচয়। খেলার তৃতীয় স্তরে অন্যান্য খেলার সহিত এই শ্রেণীর খেলা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। খেলায় ক্রমশঃ উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, দীর্ঘ মনোনিবেশ প্রভৃতি গুণ দেখা দিতে থাকে। দেহ-সঞ্চালনের খেলা বা বস্তু লইয়া খেলা পুরাদমেই চলিতে থাকে ; তবে, কল্পনার সাহায্যে ব্যক্তির অনুকরণ ও পরিকল্পনা অনুসারে খেলা করা এই পর্যায়ে বিশেষত্ব দান করে।

(৪) চতুর্থ স্তরে শিশু বস্তুর বশে না গিয়া নিজের খুশি-মতো বস্তুকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই সময়ে তাহার খেলা অতি স্পষ্টভাবেই সৃষ্টিশীল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা-টুকরা খেলা একত্র করিয়া, সমন্বিত করিয়া দীর্ঘতর পরিকল্পনা অনুসারে খেলা আরম্ভ হয়। কল্পনার প্রভাব একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে এবং শিশুর খেলায় কাজের গুণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

(৫) খেলার মধ্যে কাজের প্রভাব আরো প্রধান হইয়া উঠে, শিশু যেন বলিতে চাহে, 'আমি বড় হইয়াছি, আমার কাজ আছে, ছোটদের মতো খেলিবার সময় নাই'। দেহের নৈপুণ্য-লাভের জন্য শিশুর চেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, দ্রুত হাঁটা দৌড়ান প্রভৃতির ইচ্ছা হয় এবং সকলপ্রকার দেহ-সঞ্চালনে দ্রুত গতি পাইবার জন্য চেষ্টা দেখা দেয়। গঠন-মূলক খেলা আরো উন্নত হয়।

(৬) প্রতিযোগিতার ভাব এখন দেখা দেয়, খেলা আরো একটু কাজ-ঘেঁষা হইয়া পড়ে।

(৭) শিশুর মনের গভীর কামনা খেলার মধ্যে এবং খেলার কল্পনার মধ্যে নানারূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

(৮) ছন্দ-প্রীতি জন্মগত গুণ। সকল শিশুই অল্পাধিক ছন্দ-প্রীতির অধিকারী। কিন্তু ছন্দ অনুসরণ করা এবং ছন্দ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করা একটু বয়সের অপেক্ষা রাখে। দেহের উপর অনেকটুকু কর্তৃত্ব না আসিলে এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে শিশুর পক্ষে জটিল ছন্দে কিছু করা কঠিন। অথচ দেহ-নৈপুণ্য যথোচিত মাত্রায় অর্জন করিতে পারিলেই শিশু ছন্দ-অনুসরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায় এবং সুযোগ পাইলেই নিজে ছন্দ অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। এই বয়সে শিশুর পরিবেশে ছন্দ-প্রকাশের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাদ্য, নৃত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি শিশুর নিকট ছন্দ-প্রকাশের খেলা—ইহারা হয়তো বয়স্কদের পক্ষে কাজ।

১৩। শৈশবের খেলার স্তর-বিশ্লেষণ করিয়া ইহার আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে পুনরায় স্মরণ করা আবশ্যক যে, যে-কোনো স্তরে একাধিক স্তরের খেলা চলিতে পারে এবং সাধারণতঃ চলে; তবে এক শ্রেণীর খেলাই প্রাধান্য বিস্তার করে। খেলা বলিতে আমাদের মনে পড়ে পুতুল-খেলা, মার্বেল-খেলা, কপাটি, ফুটবল ইত্যাদি খেলা। ইহা হইতে আরো একটি ব্যাপক অর্থে 'খেলা' কথাটি ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া শিশু বারে বারে যে আচরণ করিতে চাহে, তাহাই শিশুর খেলা। খেলার এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াই খেলার স্তর-বিন্যাসের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

## খেলা দেওয়ার সাধারণ নীতি

১৪। খেলার পরিবেশ সম্পর্কে দুই-একটি সাধারণ নীতি আছে। শিশুর পরিবেশে সর্ব স্তরের খেলার আয়োজন থাকা আবশ্যক। ইহাতে তাহার উৎসাহ-লাভ ঘটে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং যখনই তাহার দেহের ও মনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়, তখনই সে উপযুক্ত খেলার সুযোগ পাইতে পারে। পরিবেশে বহুপ্রকার খেলার সুবিধা থাকা আবশ্যক; বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং নূতনের আনন্দ শিশু লাভ করে। খেলার মধ্যস্থতায় শিশুর সকল দিকের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ খেলার প্রতি শিশুকে আকৃষ্ট করা আবশ্যক। খেলা-নির্বাচনের ভার সম্পূর্ণরূপে শিশুর উপর ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নহে। শিশুর খেলায় অংশ গ্রহণ করা ভালো, কিন্তু খেলায়

সাহায্য করা সাধারণতঃ ভালো হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুকে খেলায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। তথাপি অতি-সাহায্য কোনো অবস্থাতেই উচিত নহে। কোনো খেলা শিশু গ্রহণ করিতে না চাহিলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিশুর খেলা তাহার সামর্থ্যের উপযুক্ত হয় নাই। খেলার পর্যায় পরিবর্তন করা যাইতে পারে। খেলার সরঞ্জাম চিত্তাকর্ষক হওয়া আবশ্যক। চিত্তাকর্ষক খেলনা যে বহুমূল্য হইবে, এমন কোনো কথা নাই। খেলার ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও দলগত খেলার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

## খেলার সরঞ্জাম

১৫। খেলার সরঞ্জামের তালিকা অতি দীর্ঘ, ইচ্ছা করিলে দীর্ঘতর করাও যায়। অতএব সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। সংক্ষেপে সরঞ্জামাদির ধরণটুকু জানাইয়া দিলেই চলিবে।

১৬। দুই-তিন বৎসরের শিশু। ছোট্ট মই-জাতীয় ব্যবস্থা, মাটি হইতে সামান্য উঁচু মাচা। মই বাহিয়া ওঠা-নামা, মাচার উপরে চলা-ফেরা করা, মাচা হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়া। গাড়ি-গাড়ি খেলিবার জন্য চাকা-দেওয়া বা চাকা-না-দেওয়া বাক্স। ঠেলা-ঠেলি করা বা দড়ি দিয়া টানা-টানি করা। হাল্কা বড় বল সুতা দিয়া ঝুলানো, শিশু মাটিতে চিত হইয়া শুইয়া পা উঁচু করিয়া পা দিয়া বলটিকে দোলাইবে। ঘোড়া-ঘোড়া খেলিবার জন্য মাটিতে পা ঠেকে এরূপ উঁচু ব্যবস্থা। বন্ধ করা যায়, খোলা যায়, এরূপ ছোট বড় বাক্স। বাক্সগুলি হাল্কা হওয়া আবশ্যক এবং বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন কৌশলের হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটার পর একটা সাজাইয়া, খুলিয়া, জোড়া দিয়া নানা আকৃতি গঠন করা যায়, এইরূপ রঙিন হাল্কা বিচিত্র উপকরণ। জলে ভাসে, জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না, এই ধরণের পুতুল। এগুলি বড় ও কোল-জোড়া হইলে ভাল হয়। সাধারণ জল বা রঙিন জল। নানাবিধ শক্ত অথচ হাল্কা পাত্র। কাঁচের শক্ত বোতল, ছাঁকা-ছাঁকি করিবার জন্য কাপড়ের টুকরা, ফানেল ইত্যাদি। প্রশস্ত অগভীর চৌবাচ্চা, শিশু তাহার মধ্যে নামিয়া হুড়াহুড়ি করিবে, পুতুলকে স্নান করাইবে। বালি, মাটি এবং নানাজাতীয় হাল্কা পাত্র। মাটি তুলিবার

রঙিন-হাতল-যুক্ত সরঞ্জাম। স্পষ্ট বড় রঙিন ছবি; শিশুর পরিবেশের ছবি হইলে ভালো হয়। রঙ ও মোটা তুলি হাতের কাছে রাখা ভাল।

১৭। চার হইতে ছয় বৎসরের শিশু। অপেক্ষাকৃত খাড়া ও উচ্চ মই ও মাচা। মাচা শক্ত হওয়া চাই, শিশু মাচা হইতে ঝুলিয়া দোল খাইয়া লাফাইয়া পড়িতে পারে। গড়াইয়া লইবার উপযুক্ত ছোট পিপা বা অনুরূপ অন্য জিনিস। ঝুলিয়া আঁকড়াইয়া ওঠার জন্য ঝুলানো দড়ি ও দড়ির মই। অপেক্ষাকৃত বড় বাক্সের গাড়ি, ইহাতে দুই-একজন সঙ্গী বসিতে পারিবে। ঠেলিয়া বা টানিয়া লইবার জন্য চাকা-দেওয়া ব্যবস্থা। পায়ে-চালানো গাড়ি। লাফাইবার দড়ি। ব্যাট-বল ইত্যাদি। বিভিন্ন আকৃতির ও রঙের উপকরণ, নানারূপ গঠন-চর্চার আয়োজন। মাপের ও ওজনের সাজ-সরঞ্জাম। বড় বড় ব্যবহার-উপযোগী যন্ত্রের ছোট ছোট অনুকৃতি। গঠন-কার্যের জন্য যন্ত্র-সরঞ্জাম। পুতুলের সংসার। 'পুটিং' ( Putty ), কাদা প্রভৃতি। জল, সাধারণ ও রঙিন। বিভিন্ন আকৃতির শিশি-বোতল। কাঁচের ফানেল, কাঁচের নল। মাপ করিবার শিশি। প্রশস্ত অগভীর চৌবাচ্চা, ভাসমান ছোট ছোট নৌকা। বালি, মাটি এবং স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা। দোলনা।

১৮। এই সংক্ষিপ্ত তালিকার দ্বারা শৈশবোচিত খেলার সম্পূর্ণ আয়োজন করা যায় না। ইহা হইতে খেলার ধরণটা জানা যাইতে পারে। দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি প্রভৃতি খেলা দুই-তিন বৎসরের শিশুও পছন্দ করে, পাঁচ-ছয় বৎসরেও বেশ চলে। আরো বড় বয়স পর্যন্ত কল্পনার ও ছন্দের খেলা চিত্তাকর্ষক হয়, শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী। অন্যান্য অনেক খেলা শিশুদের প্রিয়, সেগুলি অধিকাংশ ব্যক্তির কাছেই সুপরিচিত। সেই সকল 'চল্‌তি' খেলা লইয়া অন্য দেশে নানাদিকে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের দেশে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বহু সুযোগ থাকা উচিত।

## ডাঃ মণ্টেসরি

১৯। এই স্থানে ডাঃ এম্ মণ্টেসরির উল্লেখ স্বাভাবিক। ১৯১২ খৃস্টাব্দে, অথবা তাহার পূর্বেই, রোম নগরে এই মহতী প্রতিভা শিশুর শিক্ষা ও খেলা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার গবেষণার প্রতি শিক্ষা-

জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ তাঁহার উদ্‌ভাবিত শিক্ষা-পদ্ধতি বহু স্থানে গৃহীত হয়। ডাঃ এম্ মণ্টেসরি 'ফ্রয়েবেল'-এর চিন্তার মূল বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্ধতি শিশুর পক্ষে স্বয়ং-শিক্ষার নামান্তর বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, উপযুক্ত পরিবেশে শিশু নিজেই নিজেকে অনেক দিকে শিক্ষা দিতে পারে এবং ঠিক খেলার পরিবেশে থাকিতে পাইলে শিশু বহু দিকে দ্রুত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তাঁহার উদ্‌ভাবিত পদ্ধতি ও খেলার সরঞ্জামাদি তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ খৃস্টাব্দে ইটালীতে ও জার্মানীতে রাজনৈতিক কারণে তাঁহার স্বয়ং-শিক্ষার প্রচেষ্টা নিগৃহীত হয়; অবশ্য সে আঘাত তাঁহার তত্ত্বকে পঙ্গু করিয়া দিতে পারে নাই।

২০। মণ্টেসরি-পদ্ধতি সর্বত্র খ্যাতি-লাভ করিলেও ইহার কোনো কোনো দিক্ সমালোচনার যোগ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেকের ধারণা, তাঁহার পদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়-শক্তির অনুশীলনের উপর অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করা হইয়াছে এবং মণ্টেসরি-প্রবর্তিত খেলার মধ্যে যান্ত্রিকতার ত্রুটি ঘটিতে দেওয়ায় উহা শিশুর ধী-শক্তির উন্নতির পরিপন্থী হইয়াছে। শিশুর উন্নতির জন্য ইহাতে অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখা যায়। এবং যাহাতে শিশু-শক্তির কোনো অংশই বিনা শিক্ষায় ব্যয়িত না হয়, তৎপ্রতি অতি-সতর্কতা রহিয়াছে। এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, যেন শিশুকে তাহার নিজের মতে, নিজের অভিপ্রায় অনুসারে খেলিতে বা কিছু করিতে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, যেন তাঁহার ধারণা ছিল ইহাতে শিশুর শক্তির অপচয় ঘটে। শিশু ভুল করিয়া, সংশোধন করিয়া, নিজে উপলব্ধি করিয়া শিখিবে—ইহা অনেকটা অপচয়ের পথ বলিয়া এই পদ্ধতির বিশ্বাস। ফলে এই পদ্ধতিতে শিশুর ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। মণ্টেসরির পদ্ধতি এই কারণেই সমালোচনার যোগ্য। অতি-সতর্কতার সহিত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রিত খেলার মধ্যে শিশু থাকিলে শিশুর ভুল করিবার সম্ভাবনা কম হয় বটে, কিন্তু তাহার স্বয়ং-শিক্ষার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ভুল ও সংশোধনের দ্বারা শিশুর যে আনন্দ উপলব্ধি ও আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত হয়, মণ্টেসরি-পদ্ধতিতে তাহার সম্ভাবনা আশানুরূপ নহে। মণ্টেসরির খেলায় খেলার গুণ অপেক্ষা

নানা দিকে নৈপুণ্য-অর্জনের দিক্‌টি বিশেষ জোর পাইয়াছে। ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য ও ধী-শক্তি ব্যবহারিক জীবনে অনেক দিকেই ব্যবহৃত হইতে পারে সন্দেহ নাই; তথাপি নিজের খেলায় শিশু নিজ হইতে যে সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করে, তাহার সুযোগ মণ্টেসরি-পদ্ধতিতে নাই। মণ্টেসরি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের উপর অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করায় তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি যান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইয়া পড়ে; বাহ্য আচরণে অনেকটা উন্নতি সাধিত হয় বটে, কিন্তু শিশু ব্যক্তিত্বের দিক্ দিয়া তেমন অগ্রসর হয় না। মণ্টেসরির পদ্ধতি অত্যন্ত মূল্যবান্ হইলেও এইরূপ সমালোচনার কারণ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন।

২১। একটি বড় সত্য সাধারণতঃ অবজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শিশুর খেলার উপকরণ চতুর্দিকে। অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে তাহাকে বিচরণ করিতে দিলে তাহার খেলার অভাব হয় না। কিছু কিছু সরঞ্জাম, কিছু কিছু আয়োজন অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা বদ্ধ ঘরে নহে। শিশুকে সীমাহীন আকাশের তলে জল, মাটি, তৃণ, পুষ্প প্রভৃতির অবাধ স্পর্শে খেলিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানে বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও উন্মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শ শিশুর আত্ম-গঠনের পক্ষে আবশ্যক মনে করেন। প্রকৃতির বিস্তৃত ভূমিকায় শিশুর খেলার এবং সর্বপ্রকার শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্ট হউক, ইহা কবির কামনা মাত্র নহে, ইহার পশ্চাতে বিজ্ঞানের সম্মতি আছে।

## পাঠাভ্যাস : পুস্তক

২২। শিশুর পড়াশুনা লইয়া অভিভাবকদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাবনার অন্ত নাই। শিশুরা চাহে খেলিতে, বয়স্করা চাহেন পড়াইতে। বয়স্করা মনে করেন শিশুর খেলাটা নেহাত খেলাই, সময়ের অপচয় মাত্র। শিশুরা ভাবে লেখাপড়া বয়স্কদের দেওয়া কাজ, জগতে লেখাপড়ার ব্যাপারটা উঠিয়া গেলেই ভালো হয়। যদি লেখাপড়াকে খেলার মতো করিয়া ফেলা যাইত, তাহা হইলে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাপড়া আরম্ভ করিত এবং মাতা-পিতা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দুশ্চিন্তা দূর হইত। কিন্তু লেখাপড়াকে খেলারই বৈশিষ্ট্যে সরস করিয়া তোলা কঠিন। একাধিক কারণে পড়াশুনাটা শিশু ও বয়স্ক উভয়ের মধ্যে এক সমস্যা-রূপে রহিয়া গিয়াছে।

২৩। লেখাপড়া শিশুর নিকট অতি নূতন অভিজ্ঞতা, একেবারে নূতন পথ। নূতন বিষয় শিশুকে আকর্ষণ করে, আবার অতি নূতনকে গ্রহণ করাও কঠিন। এইজন্য লেখাপড়ার প্রতি শিশু আকৃষ্ট হইলেও সহজে সে লেখাপড়ার অভ্যাস গঠন করিতে চাহে না। লেখাপড়া আরম্ভ করিবার পূর্বেই লেখাপড়া সম্বন্ধে শিশুর কিছু অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়; কিছু অভিজ্ঞতা থাকিলে শিশুর পক্ষে লেখাপড়ার নূতন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা কষ্টকর হয় না। কারণ, লেখাপড়া-ব্যাপারটির সহিত একটু পরিচয় পূর্ব হইতে থাকিলে উহা একেবারে দুঃসাধ্য ও নূতন বলিয়া ঠেকে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে কিছু পরিচয় লাভ করার একমাত্র উপায় তাহার পরিবেশে ইহার অনুশীলন প্রত্যক্ষ করা—শিশুর আশে-পাশে চেনা-শুনা স্বজন-বন্ধুরা লেখাপড়ার চর্চা করিলে বা আলোচনা করিলে সে লেখাপড়ার বিষয়ে একটু-আধটু করিয়া ধারণা গ্রহণ করে। পরিবেশে একাধিক ব্যক্তি লেখাপড়ার চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে থাকিলে শিশু ইহার পরিচয় ভালোভাবেই লাভ করে। এই দেখা ও শোনার মধ্যস্থতায় লেখাপড়া সম্পর্কে যে-টুকু জ্ঞান জন্মে, তাহাতেই তাহার পড়ার ও লেখার অভ্যাস-গঠন অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া আসে। শিশু কিন্তু সচরাচর ব্যক্তি-পরিবেশে লেখাপড়ার সাধনা তেমন দেখিতে পায় না। শিশু তাহার পরিবেশে যে-টুকু লেখাপড়ার চর্চা সাধারণতঃ দেখিতে পায়, তাহার ভিতর স্বতঃস্ফূর্তি নাই।

২৪। পরিবেশে লেখাপড়ার স্বতঃস্ফূর্তি না থাকিলে শিশু এই দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মুখ হইয়া উঠিতে বাধা পায়। পরিবেশে নিকটস্থ ব্যক্তিরা যখন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন, তাহা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়াই করেন। বয়স্কদের নিকট লেখাপড়া ব্যাপারটিই যেন একটি চাপের ব্যাপার—নিজেরা সমাজের ও অর্থের চাপে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া করেন এবং সমাজের ও অর্থের দিকে চাহিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। শিশু তাহার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়াই ইহা ধরিতে পারে। সে অনুভব করে যে, লেখাপড়া ব্যাপারটিতে প্রয়োজনের চাপ আছে, স্বতঃস্ফূর্তি নাই। শিশুরা বিশ্লেষণ করিতে নিপুণ নহে, কার্য-কারণ-সম্বন্ধও তাহাদের মনে স্পষ্ট নহে; তথাপি স্বতঃস্ফূর্তির অভাব যে রহিয়াছে, সেটুকু সে অনুভবে বুঝিয়া লয়। এই কারণে সে লেখাপড়াকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের যোগ্য ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখে না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, খেলা নহে, তাহা শিশু-চিত্তকে বহুক্ষণ

আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। ফলে শিশু লেখাপড়া সম্পর্কে যেটুকু পরিচয় পরিবেশ হইতে পাইতে পারিত, ততটুকুও লাভ করে না—লেখাপড়া অত্যন্ত নূতন ব্যাপার রহিয়া যায় এবং ইহাতে প্রয়োজনের চাপের ভীতি এবং খেলার রসের অভাব থাকায় শিশু লিখন-পঠন-বিমুখ হইয়া পড়ে। যে পরিবেশে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 'অকারণ' এবং স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের ন্যায় স্বাভাবিক, সেই স্থানে শিশু লেখাপড়াকে অনেকটা খেলার শ্রেণীভুক্ত মনে করে।

২৫। লেখাপড়ার সর্বজন-পরিচিত পন্থা হইল পুস্তক। পুস্তক-পাঠ আরম্ভ করিয়াই শিশু লেখাপড়া আরম্ভ করে। পুস্তক পাঠ করে শিশু, কিন্তু উহার লেখক অপর ব্যক্তি। শিশু নিজের পুস্তক নিজে রচনা করে না, রচনা করেন বয়স্ক কোনো ব্যক্তি। বয়স্ক লেখকরা, অবশ্য, শিশুর উপযুক্ত ভাব ও ভাষা ব্যবহার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতেও শিশুর পাঠ চেষ্টা খেলার ন্যায় চিত্তাকর্ষক হয় না। প্রথমতঃ, বয়স্ক হইয়া শিশুর ভাব ও ভাষা অনুভব করিতে ও সার্থকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, এমন লেখক অল্পই আছেন। যদি কোনো বিরল প্রতিভাবান্ লেখক শিশুর ভাব ও ভাষা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে শিশুর পঠন-অভ্যাস অনেকাংশে সহজ হয়। তথাপি শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য শিশুর পক্ষে খেলার মতো স্বাভাবিক হইতে পারে না। শিশু-পাঠ্যের ভাব শিশু-সুলভ হইলেও শিশুর মনের ভাবের সহিত পাঠ্য পুস্তকের অংশ সকল সময় মিলিয়া যায় না। শিশুর মনের ভাব কখন কি অবস্থায় থাকিবে, কেহ অনুমান করিতে পারে না; অনুমান করিতে পারিলেও শিশুর বহু রঙিন ভাবের সহিত খাপ খাওয়াইয়া পুস্তক রচনা করা সম্ভব নহে। শিশুর মনে যখন যে ভাব উদিত হয়, ঠিক সেই ভাব লইয়া সেই সময় যদি পাঠ্য অংশ রচিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, শিশুর ভাবের সহিত পুস্তকের ভাবের মিল হইয়াছে। মনের ভাব যখন যেমন থাকে, তখন তেমন পাঠ্য অংশ চাহিলে পূর্ব হইতেই পুস্তক রচনা করিয়া রাখা চলে না; শিশুর মনের গতির সহিত তখন-তখনই পুস্তক রচনা করিতে হয়। মনের ভাবের বিবর্তনের সহিত সৃজিত পুস্তকের মিল হয় বলিয়া প্রাথমিক পঠন-পাঠনার পক্ষে ইহা খুব উপযোগী। কিন্তু শিশুর মনের উদ্দীপনা যখন যেমন থাকে, তদনুসারে পাঠ্য-অংশ রচনা করিয়া শিশুর পাঠ আরম্ভ করার ব্যবস্থা নাই; পূর্ব হইতে লিখিত পুস্তকের দ্বারাই পঠন আরম্ভ করিতে

হয়। পূর্ব হইতে প্রস্তুত পাঠ্য শিশুকে সকল মানসিক অবস্থায় তৃপ্তি দিতে পারে না ; বয়স্ক ব্যক্তিরাও তো সকল সময় এক ভাবের কাব্য পছন্দ করেন না, কখনও ভালো লাগে প্রেমের কাব্য, কখনও ভালো লাগে ভগবদ্-ভক্তির গান, কখনও আবার অন্য কিছু ! প্রেম-কাব্যের সহিত যে-সময়ে মনের ভাবের মিল হয়, সেই সময়ে প্রেম-কাব্য ভালো লাগে ; ভক্তিতে, পূজা-নিবেদনের ভাবে যখন মন পূর্ণ থাকে, তখন অনুরূপ সঙ্গীতেই শান্তি-লাভ হয়। ইহা শৈশবের প্রতিধ্বনি। শিশুর নিকটও পাঠ্য পুস্তকের সকল অংশ সকল সময়ে ভালো লাগিতে পারে না। এইজন্য শিশুর পঠনের আরম্ভ-কালে, যখন পঠনের কৌশল সে সবে মাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, পুস্তক সৃজন করাই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। পাঠ-আরম্ভের জন্য পাঠ্য অংশ রচনা করিতে হইলে শিশুদের কোনো খেলায় বা কাজে নিযুক্ত করা সুবিধাজনক। কোনো বিশেষ খেলা বা কাজের মধ্যে নিযুক্ত হওয়ায় তাহাদের মন একটি বিশেষ দিকে উদ্দীপিত হয়। তখন সেই উদ্দীপনা অনুসারে পাঠ্য অংশ রচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সার্থক হইতে পারে, অর্থাৎ শিশু-মনের আগ্রহ অনুযায়ী পঠন আরম্ভ সম্ভব হয়। এই কারণে পড়াশুনা আরম্ভের পূর্বে শিশুদের কিছু-না-কিছু খেলা বা কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা উচিত।

২৬। শিশুর প্রথম বয়সে ঝোঁক একটু প্রবল থাকে। সে যাহা করে, তাহার ফল হাতে হাতে পাইতে চায়। শিশুর ক্রিয়া ও তাহার ফলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিলে তাহা ছোট শিশুর পক্ষে পীড়াদায়ক হয়—এইজন্য ছোট শিশুর খেলায় কোনো পরিকল্পনা, কোনোরূপ দীর্ঘ মনোনিবেশ, কোনো জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশু একটু বড় হইলে খেলার উপযুক্ত পরিবেশে এই গুণগুলি ক্রমশঃ আসিতে থাকে। শিশু যখন ক্রীড়া-উপলক্ষ্যে একটু দীর্ঘ সময় একই দিকে মনঃসংযোগ করিতে শেখে, যখন সে খেলার মধ্যে আপনা-আপনি ছোট-খাটো পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন তাহার পাঠ-আরম্ভের সময় হইয়াছে বুঝিতে হয়। পুস্তক-পাঠে হাতে হাতে ফল পাইতে গেলে পঠনের অভ্যাস ভালোভাবে আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন। কোনো অংশ পড়া কষ্টকর হইলে পঠনের সংগে সংগে অর্থবোধ ও রস-সম্ভোগ দুঃসাধ্য হয়। শিশু যখন পাঠ আরম্ভ করে, তখন কেবল পাঠের অভ্যাসের জন্যই অনেকখানি শক্তি ব্যয়িত হয়, অনেকটুকু সময় আবশ্যক হয়। একবার পঠনের অভ্যাস ঠিক-মতো হইয়া গেলে পঠন ও অর্থ-উপলব্ধি একই সঙ্গে

হইতে থাকে। কিন্তু নিতান্ত আরম্ভ-কালে পাঠের সুখ শিশু হাতে হাতে পায় না। অতএব যে বয়সে খেলা বা কাজ ও ফলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান পীড়াদায়ক হয় না, সেই বয়সের পূর্বে পাঠ আরম্ভ করা ঠিক নহে। শিশুকে পাঠ শিক্ষা দিবার যে পদ্ধতি পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শিশুকে পাঠের অর্থ-উপলব্ধির জন্য সময়ের অনেকখানি ব্যবধান সহ্য করিতে হইত। প্রথমে তাহাকে অর্থহীন ক, খ ইত্যাদি বর্ণগুলি আয়ত্ত করিতে হইত, তাহার পর আসিত এমন কতকগুলি শব্দ, যাহার সহিত শিশুর জীবনের কোনো যোগ নাই,—অবশেষে কতকাল পরে অর্থপূর্ণ বাক্য তাহার সম্মুখে পরিবেশন করা হইত। ক, খ হইতে সুরু করিয়া অর্থপূর্ণ বাক্য-পাঠের মধ্যে শিশুদের যতখানি সময় অতিবাহিত করিতে হইত, কাজ ও ফলের মধ্যে ততখানি সময়ের ব্যবধান যে-কোনো বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও পীড়াদায়ক। বর্তমান পদ্ধতিতে অর্থপূর্ণ বাক্য দিয়াই শিশুর পাঠ আরম্ভ হয়, এইজন্য শিশুর পাঠ ও পাঠের অর্থ-বোধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অল্প হইয়া থাকে।

২৭। সকলপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও পঠন ও লিখনকে খেলার মতো চিত্তাকর্ষক করা সম্ভবপর হয় না। তাহার একটি বড় কারণ রহিয়াছে। খেলার মধ্যে দেহ-সঞ্চালনের সুযোগ আছে এবং দেহ-সঞ্চালনের মধ্যে ছন্দের সুখ আছে, কিন্তু পড়া ও লেখার মধ্যে ইহার ব্যবহার অতি অল্পই হইয়া থাকে।

২৮। পড়া ও লেখার আরম্ভ-পর্বটি সুখদায়ক হইলে শিশুর পরবর্তী পঠন-লিখন সহজ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। যে পথে একবার সুখ পাওয়া গিয়াছে, সেই পথে বার বার আকৃষ্ট হওয়াই জীবের ধর্ম। শিশু যখন একবার পড়া ও লেখার ভিতর সুখ পায়, তখন সে বার বার পড়িতে ও লিখিতে চায়। বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা, পুস্তকের আয়তন, পুস্তকের মুদ্রণ প্রভৃতি অন্তরায় না হইলে শিশু অল্প আয়াসেই পড়া ও লেখার অভ্যাস গঠন করিতে পারে।

২৯। উপরে লিখিত আলোচনা হইতে কয়েকটি ব্যবহারিক সূত্র পাওয়া যাইতে পারে।

(১) পড়া ও লেখা আরম্ভ করিবার সময়ে খেলার আবহাওয়া সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং যতদিন না শিশু কাজের আনন্দ লাভ করে, ততদিন খেলার ভাবটুকু রক্ষা করা আবশ্যক। পড়াশুনার জন্য চাপ দেওয়া ভালো নহে, ব্যস্ত হইয়া পড়াও ঠিক নহে।

(২) শিশুর পরিবেশে পড়াশুনার চর্চা থাকা চাই। পড়াশুনার এই চর্চা কোনো কিছুর চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) পড়া-লেখার সহিত শিশুর বয়সোপযোগী খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং শিশু যাহাতে তাহার খেলার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে পড়াশুনার সাহায্য হয়; বিশেষ করিয়া লেখা-পড়া আরম্ভ করিবার সময়ে ইহার সুফল স্পষ্টই দেখা যায়।

(৪) পড়াশুনার আরম্ভ-কালে এবং প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর ঝোঁক ও উদ্দীপনা অনুসারে পাঠ্য অংশ রচনা করা উচিত। অপরের প্রস্তুত পুস্তক অপেক্ষা ইহা কার্যকর।

(৫) পাঠ্য অংশে ক্রমশঃ গল্পের, কল্পনার, পরিচিত ঘটনার বা শিশুর প্রাত্যহিক জীবনের বিষয় ও ভাব সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

(৬) সরল শোভন হাস্যরস বা বীররস শিশুর অনুপযোগী নহে। অতি-সূক্ষ্ম জটিল রস শিশুর উপলব্ধির বাহিরে থাকিয়া যায়। শিশুর ব্যক্তি-পরিবেশের উপর শিশুর রস-উপলব্ধির শক্তির বিকাশ নির্ভর করে। সহানুভূতি ও সমব্যথা শিশু-মনে আদৌ অস্বাভাবিক নহে। মৌখিক গল্প ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিশুর রসজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মৌখিক চর্চার পর পাঠ্য অংশে রসের অবতারণা করা বাঞ্ছনীয়।

(৭) হাস্যরসের নামে ছল-চাতুরীর বিবরণ বা গল্প শিশুর পাঠে পরিবেশন করা অনাবশ্যক, এমন-কি ক্ষতিকর।

(৮) পাঠ্য অংশ অর্থপূর্ণ বাক্যে প্রকাশিত হওয়া চাই। কোনো বাক্য ব্যাকরণবিধির দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ না হইলেও প্রথম প্রথম চলিতে পারে, কিন্তু বোধগম্য অর্থের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

(৯) পাঠ্য অংশের বাক্য দীর্ঘ হওয়া ভালো নহে, অক্ষর ক্ষুদ্র হওয়া উচিত নহে। শিশুর পঠন-কৌশল যতই আয়ত্ত হইয়া আসিবে, ততই বাক্যের ও অক্ষরের ব্যবহারে স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণতঃ এক হইতে দেড় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের বাক্য পনেরো-ষোলো ইঞ্চি দূর হইতে চোখ এক-একবারে দেখিতে পায়। ইহাতেও বাক্যের সকল অংশ সমানভাবে স্পষ্ট দেখা যায় না; পঠনের যথেষ্ট অভ্যাস হইলে তবে চক্ষু আভাসে বাক্য-অংশ চিনিতে পারে।

(১০) পাঠ্য বাক্যাবলী চিত্তাকর্ষক অথচ সংযত রঙে হইলে ভালো

হয়। পাঠ সচিত্র শোভন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত রঙের প্রয়োগ অল্প হইয়া আসিবে। অবশ্য, অসুন্দর অঙ্কন ও অসংযত বর্ণের ব্যবহার হওয়া অপেক্ষা অনলংকৃত সুমুদ্রিত পুস্তকও শ্রেয়ঃ।

(১১) শিশুর পাঠ যাহাতে নির্ভুল হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এইজন্য প্রথম প্রথম উচ্চারণ করিয়া পাঠ করানো নিরাপদ্। দ্রুত পঠনের প্রয়োজন হইলে উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ সরবে পাঠ উপযোগী হয় না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সরব পাঠ সুবিধাজনক।

(১২) নূতন নূতন শব্দ বাক্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া শব্দের অর্থ বুঝাইতে হয়, শুধু প্রতিশব্দের দ্বারা অপরিচিত শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়া ঠিক নহে।

(১৩) অপরিচিত শব্দ একাধিক বাক্যে ব্যবহার করিলে শব্দের সার্থক ব্যবহার শিশু স্থায়িভাবে শিখিতে পারে।

(১৪) জটিল বাক্য বা জটিল ভাব বুঝিতে গেলে অপেক্ষাকৃত পরিণত বুদ্ধির প্রয়োজন। শিশু যে বয়সে সাধারণতঃ পুস্তকপাঠ আরম্ভ করে, সে বয়সে জটিল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিশ্রম একটু বেশি হয়। পাঠ্য অংশে শব্দের সহিত পরিচয়লাভ করিতে শিশুর মানসিক শ্রম ঘটে, তাহার উপর বহু বাক্য একত্র করিয়া একটি সামগ্রিক ভাব বা বিষয়ের উপলব্ধি করা আরো শ্রমসাধ্য। শিশুর পক্ষে এই দুই প্রকার শ্রম সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য শিশুর পাঠের প্রথম অবস্থায় অনুচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া দীর্ঘ ভাব বা বিষয় পরিবেশন করা উচিত নহে। অবশ্য, যে-সকল শব্দের সহিত উত্তমরূপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে এবং অর্থের উপলব্ধি যথোচিত হইয়াছে, সেই-সকল শব্দের দ্বারা গঠিত দীর্ঘতর ভাব বা বিষয় শিশুর পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। শিশুর পাঠ্য বিষয়ের সন্নিবেশ-কালে ইহা স্মরণ রাখা ভালো।

(১৫) শিশু যতটুকু ভাব প্রকাশ করিতে পারে, বুঝিতে পারে তাহার অনেক বেশী। সরল বাক্য কথাবার্তায় অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলেও, জটিল বাক্য তাহার বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অতএব প্রথম অবস্থা অতিক্রম করিলেই শিশুকে জটিল বাক্য ও ভাব পাঠ করিতে দেওয়া যাইতে পারে, এবং তখনই উহা পাঠ করিতে দেওয়া ভালো।

(১৬) শিশুকে দিনের পর দিন কঠিন পাঠের মধ্যে না রাখিয়া, মাঝে মাঝে তাহার পক্ষে সহজপাঠ্য পুস্তক দিলে শিশু অত্যন্ত খুশী হয়; উহা

সহজেই আয়ত্ত করিতে পারায়, তাহার মনে একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয়।

(১৭) শিশুর পুস্তকের আয়তন যেন অধিক না হয়; সে যেন দীর্ঘ সময়ের পূর্বেই এক-একখানি পুস্তক শেষ করিতে পারে। এক-একখানি পুস্তক শেষ করিতে পারিলেই শিশু মনে ভাবে যে, সে অনেকখানি শিখিয়া ফেলিয়াছে; ইহাতে তাহার উৎসাহ অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(১৮) ছয় বৎসর বয়সে পড়া-লেখা আরম্ভ করার সাধারণ সময়। সুস্থ ও শক্তিসম্পন্ন শিশুরা পাঁচ বৎসরেও আরম্ভ করিতে পারে, তবে লেখাপড়ার ও খেলার পরিবেশে শৈশবের দিনগুলি আনন্দে অতিবাহিত না হইলে, ছয় বৎসর বয়সে না-পড়ার এক অদ্ভুত অভ্যাস গঠিত হইয়া যাইতে পারে। সুপরিচালিত খেলা-ধূলার ভিতর দিয়া শিশুর দেহ-মন গড়িয়া উঠিলে, আপনিই শিশু পাঁচ বৎসরের মধ্যে পঠন-লিখনে কিছু কিছু পরিচয় লাভ করে।

## লিখন-গণন

৩০। উপযুক্ত খেলার পরিবেশ রচনা করিতে পারিলে শিশুকে লেখা-পড়ার সকল দিকেই সাহায্য করা হয়। লিখনের জন্য হাতের ও হাতের অংশ-বিশেষের তরঙ্গায়িত ভঙ্গী আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন। এই ভঙ্গী অভ্যাস করিবার জন্য পৃথক্ কোনো অনুশীলনের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না, প্রীতিপ্রদও হয় না। কোনো কোনো খেলার মধ্যে তরঙ্গায়িত অঙ্গভঙ্গীর অবকাশ থাকিলেই শিশু তাহার হাতের কব্জির, আঙুলের বা নানাশ্রেণীর পেশী-সমূহের উপযুক্ত অভ্যাস লাভ করে, তখন তাহাকে এই লিখনের কৌশল আয়ত্ত করিতে ক্লেশ পাইতে হয় না। অনেকের ধারণা লিখনের আদর্শ ভঙ্গী শিশুর সম্মুখে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করা ভালো এবং আদর্শ লিপি থাকাও ভালো। কোনো কোনো শিশুর স্পর্শ-স্মৃতি প্রখর থাকায় তাহাকে লিখিত শব্দের উপর আঙুল বুলাইতে দিলে লিখন-অভ্যাস সহজ হয়—পূর্বে আমাদের গ্রামাঞ্চলে 'দাগা বুলানো'র যে পদ্ধতি ছিল, তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য নহে।

৩১। গণিতে শিশুর শিক্ষা সহজ হইবার প্রথম শর্ত শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা। শিশুরা বাস্তব পরিবেশে বস্তু লইয়া গণনা করিবে, একত্র জড়ো করিবে, বস্তুর স্তূপ হইতে কিছু কিছু ফেলিয়া দিবে, আবার গণনা করিবে, আবার কিছু কিছু কুড়াইয়া আনিবে, পুনরায় গণনা করিবে, তুলনা

করিবে। শিশু খেলার ছলে গণিতের মূল অভিজ্ঞতা লাভ করে। বয়স্ক ব্যক্তিদের দিক্ হইতে একটু সাহায্য ও একটু উৎসাহ পাইলে শিশু গণিত-শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া লয়, শিশুর গণিত-শিক্ষার অনেকটাই সহজ হয় এবং সার্থক হয়। শিশুকে খেলাধূলার মধ্যেই গণনার ও তুলনার বিচিত্র সুযোগ দেওয়া কর্তব্য।

## অলোচনা-সূত্র

১। খেলা ও কাজের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি? রসের দিক্ দিয়া যে পার্থক্য বর্তমান তাহার গুরুত্ব কতখানি?

২। কাজে ক্লান্তি আসে, অথচ খেলায় মানসিক ক্লান্তি নাই, দেহক্লান্তিও অত্যল্প। ইহার কী কারণ ভাবা যাইতে পারে?

৩। শৈশবে শিশুর শক্তি 'অতিরিক্ত' থাকে। ইহার অর্থ কী এবং সে অর্থ কতখানি গ্রহণযোগ্য?

৪। খেলার মধ্যে শিশু-জীবনের প্রস্তুতি সাধিত হয়। কী ভাবে হয় এবং কতদূর হয়?

৫। বুদ্ধি ও চরিত্র উভয়েরই প্রাথমিক বিকাশ প্রধানতঃ খেলার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা কতখানি সত্য?

৬। শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও খেলা—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত-যোগে একটি প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে পারে।

৭। শিশুর খেলার বিভিন্ন স্তর আছে। কেন এইরূপ স্তর থাকে এবং ইহার তাৎপর্য কী?

৮। খেলার স্তর ও খেলার বৈচিত্র্য কি একই কথা?

৯। শৈশবের খেলায় আটটি স্তর আছে মনে হয়। সেগুলির বর্ণনা দাও।

১০। খেলার 'আটটি স্তর আছে' স্বীকার না করিয়া অন্যভাবে স্তর-বিভাগ করা যায় না কি? অন্য কেহ শিশুর খেলায় স্তর-বিভাগ কী ভাবে করিতে পারে?

১১। কোন্ বয়সে শিশুর পক্ষে খেলায় ছন্দ অনুসরণ করা সহজ মনে হয়? পরিবেশের অনুকরণ ইহার উপর কী ভাবে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে?

১২। শিশুর মন যখন বলিতে চাহে 'কাজ করছি, গোল কোরো না

মেলা', তখন তাহার 'কাজ' কি সত্যই কাজ, না, রসের দিক দিয়া অন্য কিছু ? আলোচনা করা যাইতে পারে।

১৩। শিশুর খেলায় সাহায্য করার সাধারণ নীতিগুলির আলোচনা।

১৪। খেলার সরঞ্জাম সম্পর্কে কতদূর পর্যন্ত গৃহেই ব্যবস্থা করা সম্ভব ? ( বলা বাহুল্য, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহের কথাই আলোচ্য )।

১৫। পল্লীগ্রামে শিশুর খেলার উপকরণ সহজলভ্য, না, শহরে ? শিশুর খেলার মনোরম পরিবেশ শহরে, না গ্রামে ?

১৬। অর্থসামর্থ্য থাকিলেই খেলার ব্যবস্থা যে আদর্শানুরূপ হইবে তাহার কোনো কারণ নাই। ইহা কতদূর সত্য ?

১৭। অনেক সময় ধনী-গৃহের শিশু খেলার অনেক প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত থাকে। কী কারণ ?

১৮। ডাঃ মণ্টেসরি শিশু-শিক্ষায় নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। কতদূর ঠিক ?

১৯। মণ্টেসরি-পদ্ধতির যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত গঠন।

২০। পাঠ্য পুস্তক শিশুর নিকট সাধারণতঃ চিত্তাকর্ষক হয় না কেন ? পাঠ্য বিষয় চিত্তাকর্ষক করিবার কী উপায় ?

২১। শিশুর খেলা ও শিশুর পাঠাভ্যাস—ইহাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কী ? থাকিলে তাহার প্রকৃতি কী ?

২২। বিদ্যালয়ে এমন একটি ঘর থাকা আবশ্যক যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরা নিয়মিত পড়াশুনা করিতে পারেন। কেন ?

২৩। পঠনারম্ভের সময় ছাপা পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার করা অপেক্ষা সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তক রচনা ভালো কিনা আলোচনা। বর্তমান ক্ষেত্রে ইহার সুবিধা-অসুবিধার দিকটাও ভাবা দরকার।

২৪। শিশুর পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবহারিক সূত্র থাকিতে পারে। সেগুলি সংক্ষেপে কী ?

২৫। অভিজ্ঞতার মূল্য ও মর্যাদা সর্বাধিক, পাঠাভ্যাসের প্রয়োজন ও উপযোগিতা তাহার পরে—ইহার যাথার্থ্য বিচার। এবং শিশুর জীবনে এই নীতি কার্যকরী করিতে কী কী উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর ?

# গৃহ ও শিশু-নিকেতন

## গৃহ-পরিবেশের অসম্পূর্ণতা

১। জীবনের ভিত্তি রচিত হয় শৈশবে। শৈশবের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে গৃহে। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, দাদু-দিদিমা প্রভৃতি ব্যক্তির পরিবেশে শৈশবের প্রাথমিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। আদর্শ গৃহে, আদর্শ মাতা-পিতার স্নেহে, আদর্শ শিশু গড়িয়া উঠে। কিন্তু আদর্শ গৃহ ও আদর্শ ব্যক্তি-পরিবেশ দুষ্প্রাপ্য। ইহা এমনই দুষ্প্রাপ্য যে ইহা হিসাবের মধ্যে ধরা যায় না। বড় জোর বলা যায় 'বেশ ভালো পরিবেশ'। সাধারণ গৃহের অবস্থা বিবেচনা করিলে 'বেশ ভালো পরিবেশ' এ কথা বলাও কঠিন। ইহার অর্থ এমন নহে যে, মাতা-পিতা বা অপরাপর ব্যক্তির পরিবেশ শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। কতকগুলি বিশেষ কারণে মাতা-পিতার সাধারণ স্বাভাবিক চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর উপযোগী পরিবেশ রচনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

২। সাধারণ গৃহের মাতা-পিতা সাধারণ মানুষ। তাঁহাদের মন নানাপ্রকার সংস্কারে, প্রথায়, অন্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ। বিজ্ঞানীর মন যতটা মুক্ত থাকে, তাঁহাদের ততটা মুক্তমনা হওয়া সাধ্যাতীত। তাঁহাদের যে বিশ্বাস ও যে অভ্যাস আছে, তাহার বশেই শিশুদের 'মানুষ' করেন। কিন্তু 'মানুষ' করিতে গেলে মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন; সেই মুক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া শিশু গোড়া হইতেই অন্ধ সংস্কার ও সংকীর্ণ প্রথার ছাঁচে মানুষ হইতে থাকে। সমাজে বিজ্ঞানের আবহাওয়া থাকিলে, বিজ্ঞানের কথা বার বার শুনিতে পাইলে, মাতা-পিতা ও গৃহের অন্যান্য ব্যক্তির মনের ভ্রান্ত সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাব শিশুর মন হইতে ক্রমে ক্রমে অনেকটা মুছিয়া যায় এবং কিছুটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা সহজ হইতে পারে। কিন্তু সকল দেশেই বিজ্ঞানের মোহমুক্ত দৃষ্টি জনসংখ্যার অতি অল্প অংশেরই থাকে, অধিকাংশের চিন্তা বহু দিক্ দিয়াই অযৌক্তিক, অন্ধ। আমাদের দেশের কথা তো সুবিদিত। নূতন বিশ্বাসে উন্নত হওয়া, নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করা এতদ্দেশীয় সমাজের বহুলাংশে এক প্রকার অসম্ভব। আমাদের মধ্যে যেটুকু জ্ঞান আছে, তাহাও অর্থাভাবে ঠিকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। বিস্তৃত স্থান, উপযুক্ত আলো-বাতাস-যুক্ত গৃহ, স্বাস্থ্যকর অন্নপান, খেলার

সরঞ্জাম—এ-সকল মাতা-পিতার আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে ( উপযুক্ত জ্ঞানের ও সদভ্যাসের অপেক্ষা রাখে না, অবশ্য, এমনও নয় )। এ-সকলের অভাব কিছু-কিছু সমবেত চেষ্টার দ্বারা মিটানো যায়—বিস্তৃত স্থান, খেলার সরঞ্জাম, এমন-কি পুষ্টিকর খাদ্য পর্যন্ত সমবেত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আশানুরূপ আয়োজন করা সম্ভব নয় জানেন বলিয়া যে সমবেতভাবে কার্য করিবার উদ্যোগ করিবেন তাহাও দেখা যায় না। সবার উপর আছে সময়ের টানাটানি। বর্তমান অর্থশাসিত সভ্যতায় অর্থোপার্জনের জন্যই মাতাপিতাকে সমস্ত সময় ব্যয় করিতে হয়। এমন অবসর থাকে না যাহা শিশুর মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। তাঁহাদিগের দেহের ও মনের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেই শোষিত হইয়া যায়, শিশু-পালনের উপযোগী ধৈর্য ও মনঃসংযোগের শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট থাকে না। ইহার ফলে স্নেহ-প্রকাশে দৈন্য ঘটে, আবার স্নেহের দৈন্য ঢাকিতে গিয়া অতি-স্নেহ আরম্ভ হয়। সন্তান-সন্ততির সংখ্যা একটু অধিক হইলে বা বৃহৎ পরিবারের মধ্যে বহু শিশুর ভিড় জমিলে, মাতা-পিতার পক্ষে স্নেহ-সাম্য বজায় রাখা কঠিন। শক্তির প্রাচুর্য যখন থাকে তখন স্থৈর্য, ধৈর্য, একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের প্রকাশ সম্ভব। যেখানে শক্তি অপ্রচুর, সেখানে এগুলির অভাব ঘটে এবং এই-সকল গুণের অভাব ঘটিলে কোনো দিকে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। সাধারণ অ-জ্ঞান অভাব-ক্লিষ্ট ক্ষীণ-শক্তি গৃহে এই কারণে শিশু-পালনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ঘটে না। শিশুকে যেমন-তেমন ভাবে 'মানুষ' করাটাই সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কখনো কখনো এমনও ঘটে যে, গৃহে কোনো একজন ব্যক্তি সকল দিক্ দিয়া শিশু-পালনের ভার লইতে সক্ষম; তাঁহার স্বভাবে ধৈর্য, স্নেহ, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ বর্তমান আছে—অথচ সকল গুণের অধিকারী হইয়াও তিনি শিশুকে আশানুরূপ গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না। কারণ, শিশুকে কেহ তো ঠিক মৃৎ-পাত্রের ন্যায় গড়িয়া তোলে না; শিশু আপনাকে আপনি গড়ে, অপরে কেবল শিশুর পরিবেশ রচনা করিতে পারে। গৃহে একজন গুণী ব্যক্তি লইয়াই পরিবেশ সৃষ্ট হয় না। গুণী ব্যক্তিটি গৃহে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইলেও, অন্যান্য যাঁহারা আছেন তাঁহারাও পরিবেশের অংশ বা উপাদান। তাঁহাদের যোগেও শিশু আত্মগঠন করিতে থাকে। জন্য গৃহে অসামান্য শিশু-শিক্ষক থাকিলেও, শিশু সম্ভবমত শ্রেষ্ঠ

বিকাশ লাভ করে না। অপর পক্ষে গৃহ-পরিবেশে বিশেষ একটি গুণ যদি থাকে, অনৈক্যের প্রভাব না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অসামান্য ব্যক্তির প্রভাবে শিশু আপন সামর্থ্যের শেষ-সীমা পর্যন্ত উন্নতিলাভ করিতে পারে। কিন্তু বাস্তব সংসারে কোথাও নিখুঁত একটি ছন্দে জীবন প্রকাশ পায় না। অসাধারণ ব্যক্তির গৃহেও না। তাহার ফলে, কোনো শিশুর সুসমঞ্জস চরিত্র-বিকাশের শেষ সীমা কী হইতে পারে, তাহার অনেকটাই অনুভবগম্য বা অনুমানযোগ্যই থাকিয়া যায়—বাস্তবরূপ পায় না।

## শিশু-নিকেতনের বিশেষ উপযোগিতা

৩। গৃহ-পরিবেশ যে সকল দিক্ দিয়া শিশু-শিক্ষার জন্য অনুপযুক্ত, শিশু-নিকেতন ( শিশুদের শিক্ষালয় বা বিদ্যালয় ) সেই-সকল বিষয়ে শ্রেয়ঃ। শিশু-নিকেতনে যাঁহারা থাকেন, আশা করা যায়, তাঁহারা শিশু সম্বন্ধে জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও নিপুণ। অতি-স্নেহের আশঙ্কা সাধারণতঃ থাকে না। স্নেহের অভাব বা স্নেহের পক্ষপাত শিশু-নিকেতনের অমার্জনীয় ত্রুটি, সুতরাং ইহাও শিশু-নিকেতনে নাই ধরিয়া লইতে হয়। শিশুর শিক্ষাই শিশু-নিকেতনের প্রধান লক্ষ্য, প্রধান কর্ম এবং প্রধান চিন্তা। এইজন্য শিশুরা যথেষ্ট মনোযোগ লাভ করিতে পারে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সতর্ক দৃষ্টিতে তাহারা বড় হইতে থাকে। শিশুরা দিবসের অধিকাংশ সময় গৃহের বাহিরে থাকিতে পায় বলিয়া গৃহের ত্রুটি হইতে রক্ষা পায়। বহু শিশু একত্র থাকিলেও ক্ষতির সম্ভাবনা অল্প; কারণ তাহাদের এক দিকে স্নেহশীল সুনিপুণ শিক্ষক-শিক্ষিকা-গোষ্ঠির সতর্কতা, অপরদিকে যথোপযুক্ত খেলার ব্যবস্থা। শিশুরা সংখ্যায় অনেক হইলে ক্ষতি নাই, বরং সামাজিক শিক্ষার দিক্ দিয়া লাভই হয়। বিজ্ঞানের পথ শিশু-নিকেতনে প্রায় উন্মুক্ত, সেইজন্য আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিশুর পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। ব্যক্তিগত ভাবে মাতা-পিতা যাহা করিতে পারেন না, ভালো শিশু-নিকেতন প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহা করিতে সমর্থ। ইহার অর্থ-সামর্থ্য ব্যক্তিগত নহে বলিয়াই তাহা কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ নহে।

৪। শিশু-নিকেতন বহু বিষয়ে গৃহ-পরিবেশের তুলনায় শ্রেয় হইলেও, ইহা কোনোদিনই পুরাপুরি গৃহের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। মাতা-পিতার স্বাভাবিক স্নেহামৃত-প্রবাহ শিশু-নিকেতনের কাহারও ভিতরেই

কল্পনা করা যায় না। ইহা ছাড়া, শিশুর মনের গভীর বিকাশের অবলম্বন তাহার মাতা ও পিতা। সেই অবলম্বন অন্য কোথাও নাই। এই কারণে মাতা-পিতা ও তাঁহাদের সহিত জড়িত সমগ্র গৃহই শিশুর নিকট মূল পরিবেশ। শিশু-নিকেতন অত্যন্ত মূল্যবান্ পরিবেশ সন্দেহ নাই, তথাপি ইহা প্রাথমিক বা মৌলিক নহে। গৃহের কাজ শিশু-নিকেতন করিতে পারে না, শিশু-নিকেতনের কাজ গৃহে সম্পন্ন হয় না—অতএব উভয় পরিবেশই প্রয়োজন। শিশু-নিকেতনের দিক্ হইতে গৃহের সকল তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন, যতবার সম্ভব অভিভাবকদের সহিত মেলামেশা করা আবশ্যক। অভিভাবকরাও যে, শিশুকে শিক্ষা-নিকেতনে পাঠাইয়া কর্তব্য শেষ করিবেন তাহা নয়। তাঁহারা শিশুদের সম্পর্কে যতটুকু জানেন—তাহাদের অভ্যাস, আচরণ, দোষ, গুণ—সকল বিষয় খুলিয়া বলিবেন। অর্থাৎ, গৃহ ক্রমশ শিশু-নিকেতনের গুণ গ্রহণ করিবে এবং শিশু-নিকেতন ক্রমশ গৃহের রূপ লইবে—তবেই শিশুর পক্ষে আদর্শ পরিবেশের সৃষ্টি হইবে।

৫। শিশু গার্হস্থ্য জীবনে আশীর্বাদ-স্বরূপ এবং গৃহের শোভা। শিশু-পালন মাতা-পিতার সুখ ও সাধনা। আর, শিশু-নিকেতনের মধ্যস্থতায় সমগ্র সমাজের সাধনা এবং সার্থকতাও উহার সহিত অভিন্ন। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে ইহা বিস্মৃত না হইলে গৃহ ধন্য আর সমাজও ধন্য। শিশু-পালন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইতে পারে না। কারণ, শিশু যে প্রাণ দিয়া প্রাণের, হৃদয় দিয়া হৃদয়েরই সৃষ্টি-রূপ।

## আলোচনা-সূত্র

১। সাধারণ সংসারে শিশুর আত্মবিকাশ আদর্শানুরূপ হইবার কথা নয়। কেন?

২। গৃহ যতই আদর্শানুরূপ হউক-না কেন, শিশু-নিকেতনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কেন?

৩। কোনো শিশু-নিকেতন গৃহের সমান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কি? মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির পরিবেশ হইতে দূরে কোনো প্রতিষ্ঠানে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ ও আশানুরূপ হইতে পারে কি?

৪। আমাদের দেশে শিশু-নিকেতন স্থাপনের ও পরিচালনের সুযোগ-সুবিধা কতটুকু?

# পরিশিষ্ট

স্তনপর্ব মাতৃপর্ব প্রভৃতি শব্দ মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে যে দিক্ প্রাধান্য লাভ করে, সেই দিকগুলি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য এরূপ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের পুস্তকে স্তনপর্বের বা মাতৃপর্বের বয়স দেওয়া এই কারণে সম্ভব নহে। কিন্তু মূল গ্রন্থে মনোবিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্তরূপে স্তনপর্ব ও মাতৃপর্বের আনুমানিক বয়স দেওয়া যাইতে পারে। 'আনুমানিক' শব্দটির জন্য 'বয়স' সম্পর্কে তথ্য-সকল অনির্দিষ্টই রহিয়া গেল এবং বিজ্ঞান-বিধির হানি হইল। অথচ নিরুপায়। মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান-শ্রেণী-ভুক্ত হইলেও জড়-বিজ্ঞানের ন্যায় নহে, জড়-বিজ্ঞানের ন্যায় একেবারে সুনির্দিষ্ট সূত্রাবলীর নির্দেশ মনো-বিজ্ঞানে এখনো সম্ভব নহে। সেই কারণে 'বয়স' সম্পর্কে অধিকাংশ স্থলে 'প্রায়' 'সাধারণতঃ' 'আনুমানিক' প্রভৃতি সতর্কতাসূচক শব্দ ব্যবহার করা ভালো। বিশেষতঃ নূতন পাঠক-পাঠিকাদের জন্য যে-সকল গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাতে এইপ্রকার বাক্য থাকাই উচিত। অতএব স্তনপর্ব ও মাতৃপর্ব সম্পর্কে 'আনুমানিক' বয়স দেওয়ায় দোষ নাই, ইহার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলেই ত্রুটি ঘটিতে পারে। কেবল স্তনপর্ব ও মাতৃপর্ব সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য, তাহা নহে। শিশুর বিকাশের নানা পর্যায়ে নানা দিকে মনোবিজ্ঞানের বিচারেই মতান্তর থাকিতে পারে, সকল স্থানের সকল জাতির তথ্য সকল দিকে এক নহে ; কখনো কখনো একই জাতির তথ্য বিভিন্ন স্থানের পরীক্ষায় পৃথক্ হইতে দেখা যায়। এই কারণে এই গ্রন্থে বয়স লইয়া বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করা হইল না। তবু কোনো কোনো দিকে অন্যান্য জাতির পরীক্ষিত তথ্য-দৃষ্টে এবং যে সকল বিষয়ে আমাদের দেশে পৃথক্ ভাবে কিছু কাজও হইয়াছে বা আমাদের অভিজ্ঞতায় মোটামুটি তথ্য পাওয়া সম্ভব মনে হইতেছে, সেই সকল বিষয়ে বয়স দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তদনুসারে নিম্নে সামান্য তথ্য দেওয়া হইল।—

১। স্তনপর্ব—শিশুর ৩-৪ মাস পর্যন্ত ইহার জীবনে স্তন-প্রাধান্য ধরা যাইতে পারে। মাতৃস্তনকে কেন্দ্র করিয়াই শিশুর 'মনোভাব' 'আবেগ' প্রভৃতির প্রথম সৃষ্টি মনে করা যাইতে পারে।

২। মাতৃপর্ব—সাধারণতঃ ১২-১৩ মাস পর্যন্ত শিশুর চিত্তে মা—সমগ্র

মা, কেবল মাতৃস্তন নহে– একাধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়ে শিশু-মনে 'নিরাপত্তা'র ধারণা সৃষ্ট হইতে থাকে। ইহাই অনুমান ও বিশ্বাস।

৩। মাতা বা পিতার সহিত একাত্মতা—ইহা ১২-১৩ মাস হইতে আরম্ভ হয়; কন্যা মাতার সহিত ও পুত্র পিতার সহিত একাত্ম হইয়া নারী-চরিত্রের এবং পুরুষ-চরিত্রের মূল প্রকৃতি আপনাতে গ্রহণ করিতে থাকে। এই একাত্মতা ২ বৎসর ২½ বৎসর পর্যন্ত চলে মনে হয়। এই বয়সে শিশু-পুত্র মাতৃ-নির্ভরতা ত্যাগ করিতে শেখে। শিশু-কন্যাও মায়ের উপর নির্ভর করিতে চাহে না, তথাপি মায়ের সহিত একাত্ম হইয়া যাওয়াই তাহার স্বাভাবিক গতি।

৪। শিশু ২-৩ বৎসর বয়সেই নিজের কামাঙ্গের প্রতি মনোযোগ দিতে থাকে। পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে ইহা স্পষ্টতর। নারী-শিশু নিজের সমগ্র দেহের প্রতি একপ্রকার অস্পষ্ট 'আসক্তি' বোধ করে এবং পুরুষ-শিশুর কামাঙ্গের প্রতি তাহার কৌতূহল দেখা দেয়।

শিশুর অঙ্গ-বিশেষ স্পর্শ করিয়া বা উপলক্ষ্য করিয়া আদর করা সম্পর্কে যে সতর্কতার কথা গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তাহা এই অল্প বয়স হইতেই প্রযোজ্য। ভ্রাতা-ভগিনীদের পরস্পরের সান্নিধ্যে কাম-বিকাশের যে আলোচনা গ্রন্থে আছে, তাহাও শিশুর এই বয়স হইতেই বিবেচনার বিষয়।

৫। শিশুরা ২½ বৎসর ৩ বৎসর হইতে কাম কৌতূহল প্রদর্শন করে এবং নানাপ্রকার 'অসুবিধা'জনক প্রশ্ন করিতে থাকে। এই বয়সে নারী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের বিষয়ে সাধারণতঃ তাহারা বুঝিতে পারিবে না।

৬। শিশু-কন্যা ৩-৪ বৎসর বয়সে পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শিশু-পুত্র প্রায় এই বয়সেই মাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই বয়স হইতেই সাধারণতঃ নারী-পুরুষের সম্বন্ধটি নূতনভাবে অনুভূত হইয়া থাকে।

৭। সাধারণতঃ ৬ বৎসর হইতে শিশুরা নিজেদের 'স্বাধীন' 'সাবালক' বোধ করিতে থাকে, মাতাপিতা অপেক্ষা বাহিরের সঙ্গীসাথী এবং বাহিরের বয়স্ক লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাতা-পিতার প্রতি শিশুর মনোভাব মনের তলদেশে আপাততঃ 'চাপা' থাকে (শেষ হইয়া যায় না, পরে আবার দেখা দেয়)। সাধারণতঃ ৬ হইতে ১১-১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুরা এইরূপে 'স্বাধীন' 'সাবালক' 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ' হইয়া উঠিতে থাকে।

৮। পুত্রকন্যার বয়স যখন ১১—১৪ তখনই তাহাদের দেহের নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তন ঘটাটাই যে স্বাভাবিক, তাহা উহাদের বেশ সহজভাবে বলার বয়স ১১—১৩ বৎসর।

৯। দেহ ক্ষীণ বা মেদবহুল বুঝিবার জন্য ওজন প্রভৃতির তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, মাতাপিতার সস্নেহ দৃষ্টিতেই ( তথ্যের সাহায্য না পাইলেও ) ধরা পড়িবে। তবে, সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা সূচিত করিবার জন্য, অবশ্য, একটি তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রেও সকল স্থানের গৃহীত তথ্য একরূপ নহে।

## ভারতীয় গড়

| বয়স ১ বৎসর | উচ্চতা ২৬ ইঞ্চি | ওজন ২০ পাউণ্ড |
|---|---|---|
| ২ „ | ৩০'৫ „ | ২৬ „ |
| ৩ „ | ৩৩ „ | ৩১ „ |
| ৪ „ | ৩৬'৫ „ | ৩৪'৫ „ |
| ৫ „ | ৩৯ „ | ৩৮ „ |
| ৬ „ | ৪৩'৮ „ | ৪৫'২ „ |
| ৭ „ | ৪৫'৭ „ | ৪৯'১ „ |
| ৮ „ | ৪৭'৮ „ | ৪৩'৯ „ |
| ৯ „ | ৪৯'৭ „ | ৫৯'২ „ |
| ১০ „ | ৫১'৭ „ | ৬৫'৩ „ |
| ১১ „ | ৫৩'১ „ | ৭০'২ „ |
| ১২ „ | ৫৫'১ „ | ৭৬'৯ „ |
| ১৩ „ | ৫৭'২ „ | ৮৪'৮ „ |
| ১৪ „ | ৫৯'৯ „ | ৯৪'৯ „ |

———

# গ্রন্থবিবরণী

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিশদ বা বিস্তৃত অধ্যয়ন ও চিন্তনের অনুকূলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—


1. Psycho-analysis—Edward Clover, M. D.
2. Heredity in Mental Traits—N. N. Sen Gupta, M. A., Ph. D,
3. Mental Growth and Decay— „ „ „
4. The Psycho-analytic Study of the Family —J. B. Flugel, B. A., D. Sc.
5. Man, Morals and Society—„ „ „
6. The Integration of the Personality —Carl. G. Jung, M. D.
7. The Discovery of the Child—Maria Montessori
8. The Secret of Childhood— „ „
9. The Emotional Problems of Childhood —Zoi Benjamin
10. Teaching the Child to Read—Guy L. Bond
11. On the Bringing up of Children —Susan Isaac and others
12. The Children We Teach—Susan Isaac
13. Democracy and Education—John Dewey
14. The Child—His Nature and Nurture —W. B. Drummond
15. Psycho-analysis in the Class-room—G. H. Green
16. Educational Psychology —Arthur I. Gates and others
17. Remedial Teaching in Basic School Subject —Grace M. Fernald
18. Practice in Pre-School Education —Ruth Updegraff, Ph. D. and others
19. The Language and Mental Development of Children —A. F. Walp, M. A.
20. Personality : A Psychological interpretation —G. W. Allport
21. The Pocket-Book of Baby and Child Care —Benjamin Spock, M. D.

22. Life in the Nursery School—Lillian De Lissa
23. Child Psychology—Fowler De Lissa
24. Language and Thought of the Children—Jean Piaget
25. The Problem of Stuttering—Fletcher
26. How shall I tell my Child—Belli S. Mooney
27. Psycho-analysis—Ernest Jones
28. Montessori Method—W. Heinemann
29. Advanced Montessori Method—M. Montessori
30. Encyclopedia of Psychology—Harriman, Philip Lawrence
31. The Psychological Aspects of Child Development —Susan Isaac

---

## নির্ঘণ্ট

[ নির্ঘণ্ট সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইল। বিষয়গুলিকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, কিন্তু এখন সেভাবে ভাগ করা হয় নাই। ]

---